আল্লামা গোলাম আহমাদ মোর্তজা

এ এক অন্য ইতিহাস

মুনশী মোহাম্মদ মেহেরুল্লাহ রিসার্চ একাডেমী

"সৃষ্টিজগতে মানুষের আগমন, উত্থান-পতন ইত্যাদির ক্রিয়াশীল উদ্দেশ্য উদ্ঘাটন করাই ইতিহাসের অন্যতম বিষয়। তাই ইতিহাস পাঠ ও চর্চার মাধ্যমে এভাবেই মানুষ অতীতের ঘটনাবলীর পরিচয় পেতে পারে। তাই বর্তমান প্রজন্মের জন্য ইতিহাস জাতীয় চেতনা উন্মেষের ক্ষেত্রে অতীত বর্তমানের সেতু বন্ধনের এক গুরুত্বপূর্ণ অবদান।"

এ এক অন্য ইতিহাস

আল্লামা গোলাম আহমাদ মোর্তজা

(খ্যাতনামা গবেষক এবং বর্তমানকালের অন্যতম সংস্কারবাদী ঐতিহাসিক)

মুন্‌শী মোহাম্মদ মেহেরুল্লাহ রিসার্চ একাডেমী

মাতুয়াইল, যাত্রাবাড়ী, ঢাকা-১২০৪

প্রকাশনায় ঃ
মোহাম্মদ শামসুজজামান
প্রতিষ্ঠাতা ও প্রকাশনা পরিচালক
মুন্‌শী মোহাম্মদ মেহেরুল্লাহ রিসার্চ একাডেমী
মাতুয়াইল, যাত্রাবাড়ী, ঢাকা-১২০৪

Estd. in the Year—March. 1997

প্রকাশকাল ঃ
জুন-২০০৮ ইং

(লেখক কর্তৃক স্বত্ব সংরক্ষিত)

বর্ণবিন্যাস ঃ
জবা কম্পিউটার
৪৫, বাংলাবাজার
ঢাকা-১১০০

মুদ্রণে
আল ফয়সল প্রিন্টার্স
৩৪, শিরিশ দাস লেন
ঢাকা-১১০০

মূল্য ঃ ২৫০.০০ টাকা মাত্র

ISBN : 984-605-004-9

লেখকের বিভিন্ন বই সম্পর্কে প্রখ্যাত বুদ্ধিজীবী এবং সংবাদপত্রের মন্তব্যের অংশবিশেষ

দৈনিক আজকাল পত্রিকা ঃ "গবেষণাধর্মী বা বিভিন্ন বই থেকে উদ্ধৃতির প্রাচুর্য থাকলেও তাঁর পরিবেশনের স্টাইলটা বেশ সহজ-সরল, ভাষাও টানটান, ফলে বৃহৎ বইটি অনায়াসে শেষ করে ফেলা যায়। ... মোর্তজা সাহেবের এই বইটিও একই সঙ্গে তেমন পরিচিত ও বহুল পঠিত হলে আখেরে শিক্ষক, গবেষক ও ছাত্রছাত্রীরা উপকৃতই হবেন, বিশেষ করে ইতিহাস ও রাষ্ট্রবিজ্ঞান যাঁদের অন্যতম বিষয়। ... আর এ জন্য লেখক প্রচলিত ইতিহাসের পথে হাঁটেন নি। বরং সেই ইতিহাসের যাবতীয় বিকৃতি ও ভুলকে চিনিয়ে দেওয়ার জন্যই তাঁর এই 'বজ্রকলম'।"

— *অনীশ ঘোষ*

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক গোলকনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ঃ "সেদিক থেকে বইটি সর্বজনপঠিত হোলে সমাজজীবন আরও উন্নততর হবে নিশ্চিত আশা করা যায়। বইটি বহুল প্রচারিত হোক এই কামনা করি।"

রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক শোভনলাল মুখোপাধ্যায় ঃ "আলোচ্য বইখানি বাংলার, তথা ভারতের হিন্দু-মুসলমান সম্প্রীতি বৃদ্ধি করতে খুবই সহায়ক হবে। ... তাঁর প্রদত্ত তথ্য প্রমাণগুলি ভবিষ্যতেও অন্যান্য গবেষকদের কাছে মৌলিক উপাদানরূপে খুব কাজে লাগবে।"

আনন্দবাজার পত্রিকা ঃ "লেখক যে সব গ্রন্থ থেকে উদ্ধৃতি দিয়েছেন তা সবই প্রকাশিত গ্রন্থ; কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীরা এইসব গ্রন্থের সঙ্গে সুপরিচিত।"

— *ডঃ অমলেন্দু দে*

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক জনাব আনোয়ার জাহিদ সাহেব ঃ "ইতিহাস গবেষণার উদ্দেশ্য হচ্ছে সত্য আবিষ্কার ও জাতির ভবিষ্যত পথ নির্দেশ। ... তাঁর লেখনি বিকৃত ইতিহাসের স্থলে প্রকৃত ইতিহাস তুলে ধরে ইতিহাসের প্রতি ন্যায় বিচার করেছে। আমি তাঁর পুস্তকের বহুল প্রচার ও প্রসার কামনা করি।"

সূচিপত্র

ছবি	পৃষ্ঠা
স্যার আশুতোষ মুখার্জি	১২
স্যার জগদীশ চন্দ্র বসু	১২
স্যার প্রফুল্লচন্দ্র রায়	১২
স্যার সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জি	১২
স্যার উমেশচন্দ্র ব্যানার্জি	১২
স্যার ব্রজেন্দ্রনাথ শীল	১২
স্যার হরপ্রসাদ শাস্ত্রী	১২
স্যার সৈয়দ আহমাদ	১৩
স্যার আব্দুল লতিফ	১৩
স্যার আবু আহমাদ	১৩
স্যার আজিজুল হক	১৩
স্যার ফজলে হোসেন	১৩
স্যার আকবর হায়দারী	১৩
রামাক্ষয় চট্টোপাধ্যায়	৪৭
যোগেশচন্দ্র রায়	৪৯
বিজয়চন্দ্র মজুমদার	৫১
প্রমথনাথ বসু	৫৩
নীলমণি চক্রবর্তী	৫৫
গোবিন্দচন্দ্র সেনমুন্সী	৫৭
বিপিনকৃষ্ণ বসু	৫৯
ভূতনাথ দে	৬১
হরিদাস চট্টোপাধ্যায়	৬৩
মধুসূদন চট্টোপাধ্যায়	৬৫
ডা. অঘোরনাথ চট্টোপাধ্যায়	৬৭
ডা. নিশিকান্ত চট্টোপাধ্যায়	৬৯
জ্ঞানশরণ চক্রবর্তী	৭১
এলবিয়ন বন্দ্যোপাধ্যায়	৭৩
প্রমোদকুমার চট্টোপাধ্যায়	৭৫
ডা. গুডিভ চক্রবর্তী	৭৭
তানসেন	১০০
হাফিজ আলি খাঁ	১০০
এনায়েত খাঁ	১০১
বিলায়েত খাঁ	১০১
বড়ে গুলাম আলি খাঁ	১০২

ছবি	পৃষ্ঠা
স্যার জিয়াউদ্দিন আহমাদ	১৩
স্যার নাজিমুদ্দিন	১৪
স্যার সেকেন্দার হায়াত	১৪
স্যার সুলতান আহমাদ	১৪
স্যার সৈয়দ রেজা আলী	১৪
স্যার আগা খাঁ	১৪
বিজ্ঞানী সৈয়দ মীর মহসিন	১৪
বিজ্ঞানী ড. মুহাম্মাদ কুদরতে খুদা	১৪
প্রধান বিচারপতি আশুতোষ মুখার্জি	১৫
প্রধান বিচারপতি সৈয়দ নাসিম আলি	১৫
জেলখাটা কবি কাজী নজরুল ইসলাম	১৫
জেলখাটা বুদ্ধিজীবী মাওঃ আকরাম খাঁ	১৫
দুর্গার বিভিন্ন অবস্থা	৩৩
হরপ্রসাদ শাস্ত্রী	১১০
রামমোহন রায়	১২৪
দ্বারকানাথ ঠাকুর	১৩৫
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর	১৪২
মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর	১৪৫
জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর	১৪৯
বাবার মৃত্যুর পর মাথামুন্ডিত রবীন্দ্রনাথ	১৫১
জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়ি	১৫৭
অনন্য ব্যক্তিত্ব রবীন্দ্রনাথ	১৫৯
বিশেষ ভঙ্গিমায় রবীন্দ্রনাথ	১৮৬
স্যার মুহাম্মাদ ইউসুফ ইসমাঈল	১৯২
স্যার ইউসুফকে লেখা রবীন্দ্রনাথের চিঠি	১৯৩
রবীন্দ্রনাথকে লেখা স্যার ইউসুফের চিঠি	১৯৪
গান্ধীজী	২০৩
শৈশবে গান্ধীজী	২০৫
কৈশোরে গান্ধীজী	২০৭
বিদেশে ছাত্রাবস্থায় গান্ধীজী	২০৯
দক্ষিণ আফ্রিকায় গান্ধীজী	২১১
এন্ড্রুজ ও পিয়ারসনের সঙ্গে গান্ধীজী	২১৫
গান্ধীজীর পিতা করমচাঁদ গান্ধী	২২১
গান্ধীজীর জ্যেষ্ঠপুত্র হরিলাল	২২৫

উস্তাদ আব্দুল করিম খাঁ	১০২
কেয়াজ খাঁ	১০২
বেগম আখতার	১০২
রবিশঙ্কর, আলাউদ্দিন ও আলি আকবর	১০৩
কাজী নজরুল ইসলাম	১০৪
সুর সম্রাট আব্বাসউদ্দিন	১০৪
কবি গোলাম মুস্তাফা	১০৪
পদ্মভূষণ উস্তাদ মুস্তাক হুসেন খাঁ	১০৪
রবিশঙ্কর ও আলি আকবর	১০৫
রবিশঙ্কর, কমলাদেবী এবং তাঁর বন্ধুবান্ধব	১০৫
রবিশঙ্করের শাশুড়ি মদিনা বেগম	১০৬
রবিশঙ্কর ও রওশনআরা	১০৬
রবিশঙ্করের শশুরবাড়ি	১০৭
আবু আলি সিনা	২৬৬
বিবেদোসা	২৬৭
আবিদ চিপারফিল্ড	২৬৮
আলেকজাণ্ডার রাসেলওয়েব	২৬৯
এডওয়ার্ড আলকক	২৬৯
জেরেক হাওয়ার্ড স্মিথ এবং তাঁর স্ত্রী	২৬৯
লিউইস এরভিস হাসান ইভান্স	২৬৯
সাইয়েদ আবুল হাসান আলি নদভী(র)	২৭০
লে. কর্নেল আব্দুল্লাহ হিউইট	২৭১
জেনিসন ওরিংটন ফ্রাই	২৭১
ডেভিড কাওয়ান	২৭২
আহমদ সেইগ	২৭৩
আলমা সেইগ	২৭৩
লিলিভিয়া সালমা কোহেন	২৭৪
জেরেন আব্দুল্লাহ বেটারস্‌বে	২৭৪
এলিজাবেথ সাফারন	২৭৪
জয়েস ইয়াসমিন স্কট	২৭৪
ইসমাঈল ডি. ইয়র্ক	২৭৪
জামিল প্রান্ট	২৭৫

গান্ধীজীর দ্বিতীয় পুত্র মণিলাল	২২৭
গান্ধীজীর তৃতীয় পুত্র রামদাস	২২৯
গান্ধীজীর কনিষ্ঠ পুত্র দেবদাস	২৩১
মহাত্মা গান্ধী ও নেতৃবৃন্দ	২৩৩
গান্ধীজী এবং রাজকুমারী অমৃত কাউর	২৩৫
আভা ও মনুর সঙ্গে গান্ধীজী	২৩৭
চলার পথে গান্ধীজী	২৩৯
কিরণশঙ্কর রায়	২৬০
হাসান সোহরাবর্দী	২৬১
শের-এ বাংলা ফজলুল হক	২৬২
আশরাফ আলি থানভী (র)	২৬৩
জালালুদ্দিন রুমী	২৬৪
শাইখ সা'দী	২৬৫
ব্রিডা কনভয়	২৭৫
নেপোলিয়ন বোনাপার্ট	২৭৬
প্রোফেসর হারগ্রোঞ্জ	২৭৬
আব্দুর রহমান রসলার	২৭৭
ডক্টর হামিদ মার্কাস	২৭৭
জালালুদ্দিন হো	২৭৮
ফাইসাল ওয়াগনার	২৭৮
ফারুক চিয়াহ	২৭৯
এন.এম.বি. রিযওয়ান	২৭৯
মিস মিনিরা চো	২৭৯
লুকমান ইয়াংটক	২৭৯
আদনান সেং	২৭৯
রাফিয়ান চাও	২৭৯
গানার এরিকসন	২৮০
যায়নাব ডি. বোয়েরকি	২৮০
প্যাট্রিসিয়া প্যারী	২৮১
উইসল জেজরস্কি	২৮১
কমলা সুরাইয়া (মাধবী কুট্টি)	২৮২
আব্দুল আযিয জলন্ধরী	২৮২

প্রথমেই যেটা জানতে হবে

স্যার আশুতোষ মুখার্জি

স্যার জগদীশ চন্দ্র বসু

স্যার প্রফুল্লচন্দ্র রায়

স্যার সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জি

স্যার উমেশচন্দ্র ব্যানার্জি

স্যার ব্রজেন্দ্রনাথ শীল

স্যার হরপ্রসাদ শাস্ত্রী

মানুষই একমাত্র প্রাণী যাদের প্রয়োজন ইতিহাসের। ইতিহাসের প্রাণ হোল সত্যতা ও সততা। ঘটনা বর্ণনার ক্ষেত্রে কারও প্রতি ভক্তির সীমাহীন অন্ধতা, অথবা অহেতুক প্রচন্ড বিরুদ্ধতা— দুটোই মারাত্মক ক্ষতিকর। যিনি জীবনে মিথ্যা থেকে নিজেকে বাঁচাতে পারেন না, যিনি মিথ্যাবাদিতা ও মিথ্যাচারিতাকে বুদ্ধিমত্তা ও কলাকৌশল বলে মনে করেন, তাঁর লেখা ইতিহাস কখনোই অব্যর্থ সত্য বা চূড়ান্ত বলে গ্রহণীয় নয়। যদিও তাঁর রচনার সমস্তটাই অসত্য নয় তবুও ইতিহাসবিদ্ হিসাবে তিনি অকৃতকার্য এবং প্রকৃত ঐতিহাসিকদের নিকট তাঁর অপাংক্তেয় হওয়ারই কথা। বহির্ভারতের ইতিহাস ব্যবসায়ীরা এবং তাঁদের ক্রীত তাবেদার-সহযোগীদের হাতে গড়া বর্তমান ভারতীয় ইতিহাস একশো কোটিরও বেশি ভারতবাসীকে এমন এক জায়গায় দাঁড় করিয়েছে যার ফলে আমরা পারস্পরিক অবিশ্বাস, হিংসা, হানাহানি, রক্তারক্তি প্রভৃতি সমাজবিরোধী কার্যকলাপকে বীরত্ব মনে করে থাকি। আর একে অপরকে ধ্বংস করতে গিয়ে নিজেরাও ধ্বংসের শেষ সীমান্তে দন্ডায়মান। এই বিধ্বংসী বিপদের হাত থেকে নিজেরা বাঁচতে ও অপর সকলকে বাঁচাতে এখন অত্যন্ত বেশি প্রয়োজন সঠিক ইতিহাস সংকলন এবং অন্ততপক্ষে মাধ্যমিক স্তর পর্যন্ত প্রত্যেকটি স্কুলে যথাযথভাবে তার নিরপেক্ষ পরিবেশন।

রবীন্দ্রনাথ, গান্ধীজী, দ্বারকানাথ, হরপ্রসাদের ইতিহাস লিখতে গিয়ে শুধু তাঁদের স্তবস্তুতি আর মহিমা প্রচার না করে তাঁদের সত্যিকারের আলো দিক যেমন তুলে ধরা হয়েছে সেইসঙ্গে তুলে ধরা হয়েছে তাঁদের কালো দিকও। সৈয়দ আহমাদ, মহামতি আকবর, মুহাম্মাদ আলি জিন্নাহ-র ইতিহাস লিখতে হলে তাঁদের আলো এবং কালো দিক দুটোই তুলে ধরা উচিত। নতুবা তা হবে ইতিহাসের ক্ষেত্রে একান্তভাবে অনৈতিহাসিক পদক্ষেপ।

ভারতবিভাগের কালে মহম্মদ আলি জিন্নাহকে যে মুসলমানেরা ঘৃণা ও উপেক্ষা করেছিলেন, যাঁরা তাঁর দ্বিজাতি তত্ত্ব মেনে নিতে পারেননি, তাঁরা পাকিস্তানে না গিয়ে এখানেই থেকে গেছেন। পাকিস্তানে চলে যাওয়াটা তাঁরা মনে করেছিলেন বাস্তব বুদ্ধির প্রতিকূল। তাই ভারতের মাটি কামড়ে এখানেই থেকে গেছেন তাঁরা, চিরকালের মত এখানে থাকবার সিদ্ধান্তে আজও রয়েছে তাঁদের দৃঢ় প্রত্যয়।

ঐতিহাসিকদের কেউ কেউ সঙ্গত কারণ মনে করে যদি জিন্নাহ বিরোধী হন তাহলে তাঁকে ইতিহাসের ক্ষেত্রে সত্যের খাতিরে এটাও লিখতে হবে যে, জিন্নাহ ছিলেন একজন আন্তর্জাতিক স্তরের বিখ্যাত ব্যারিষ্টার, আইনজ্ঞ ও রাজনীতিবিদ। অপরদিকে কোন ঐতিহাসিক যদি ব্যক্তিগতভাবে জিন্নাহভক্ত হন বা জিন্নাহ প্রেমে নিমজ্জিত হয়ে থাকেন তবুও তাঁকে ইতিহাসবিদ হিসাবে এটাও লেখবার ক্ষমতা রাখতে হবে যে, জিন্নাহ একজন ভাল মুসলমান হিসাবে গণ্য ছিলেন না, কারণ নিয়মিত দিনে রাতে পাঁচবার নামায পড়া এবং রমযান মাসে রোযা রাখা সম্ভব হয়নি তাঁর পক্ষে।

স্যার আশুতোষ মুখার্জি, স্যার জগদীশচন্দ্র বসু, স্যার প্রফুল্লচন্দ্র রায়, স্যার রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, স্যার সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জি, স্যার উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, স্যার ব্রজেন্দ্রনাথ শীল, স্যার হরপ্রসাদ শাস্ত্রীদের ইংরেজের রাজত্বে 'স্যার' উপাধি পাওয়ার জন্য ভারতবাসী যদি গৌরব অনুভব করেন বা প্রশংসায় পঞ্চমুখ হন তাহলে স্যার সৈয়দ আহমাদ, স্যার আব্দুল লতিফ, স্যার আবু আহমাদ, স্যার আজিজুল হক, স্যার ফজলে হোসেন, স্যার আকবর হায়দারী, স্যার জিয়াউদ্দিন, স্যার নাজিমুদ্দিন, স্যার সেকেন্দার হায়াত, স্যার সুলতান আহমাদ, স্যার সৈয়দ রেজা আলী প্রমুখের জন্যও প্রত্যেক ভারতবাসী গৌরব অনুভব করবেন না কেন, প্রশংসায় পঞ্চমুখ হবেন নাই বা কেন?

আর যদি বৃটিশের কাছ থেকে পাওয়া 'স্যার' উপাধি বিশ্বাসঘাতকতা, দালালি, গোলামি, নিজেদের বিকিয়ে দেওয়া বা এককথায় বেইমানি বলে মনে করা হয় তাহলে উভয় ক্ষেত্রে প্রত্যেককেই এই বেইমানির কলঙ্কে কলঙ্কিত করা যাবে নাই বা কেন?

বিজ্ঞানী জগদীশচন্দ্র বসু, বিজ্ঞানী প্রফুল্লচন্দ্র রায়, বিজ্ঞানী সত্যেন্দ্রনাথ বসু প্রভৃতি পণ্ডিতদের পাশে বিজ্ঞানী কুদরতে খোদা, বিজ্ঞানী মীর মহসিন ও বিজ্ঞানী আবুল ফজলের ইতিহাস পাশাপাশিভাবে বেঁচে থাকা উচিত ছিল।

ভারতে বৃটিশ রাজত্বে কলকাতা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি হওয়ার সুবাদে স্যার আশুতোষ মুখার্জির পাশে ঐ একই হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি নাসিম আলির ইতিহাস এবং ছবি প্রচারিত হওয়ারও প্রয়োজন ছিল।

স্যার সৈয়দ আহমাদ

স্যার আব্দুল লতিফ

স্যার আবু আহমাদ

স্যার আজিজুল হক

স্যার ফজলে হোসেন

স্যার আকবর হায়দারী

স্যার জিয়াউদ্দিন আহমাদ

স্যার নাজিমুদ্দিন

স্যার সেকেন্দার হায়াত

স্যার সুলতান আহমাদ

স্যার সৈয়দ রেজা আলী

স্যার আগা খাঁ

প্রধান বিচারপতি আশুতোষ মুখার্জি

প্রধান বিচারপতি নাসিম আলি

আমাদের দেশের বরেণ্য কবিদের নামে স্তব স্তুতি প্রশংসার বাড়াবাড়ি করার অভ্যাস আমাদের যথেষ্ট আছে। স্বাধীনতার ইতিহাসে যাঁদের তেমন কোন অবদান নেই, যাঁদের লেখনি বৃটিশ শাসকের স্তবস্তুতিতে ভরা, যাঁরা তদানীন্তন সরকারের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে ছিলেন সহায়ক ও পৃষ্ঠপোষক, তাঁরা ইতিহাসে খ্যাতির চূড়ায় দন্ডায়মান। কাজী নজরুল ইসলামকে দেশবাসী কবি গায়ক ও গীতিকার হিসাবেই জানেন। তিনি তাঁর লেখনির জন্য সরকারের পক্ষ থেকে হয়েছেন ধিক্কৃত ও তিরস্কৃত। তাঁর লেখা পাঁচ ছ'টি বই নিষ্ঠুরভাবে বাজেয়াপ্ত করা হয়েছিল আর সরকারের কারাগারে তাঁকে সহ্য করতে হয়েছিল দৈহিক ও মানসিক যন্ত্রণা। তাঁকে জওহরলাল, মতিলাল, আযাদ গান্ধীদের পংক্তিতে স্থান দেওয়া হয়নি আজও।

বৃটিশের তাড়া খাওয়া দৈনিক ও সাপ্তাহিক কয়েকটি পত্রিকার সম্পাদক, কারাগারে সশ্রম কারাদন্ডভোগী, বৃটিশবিরোধী বিপ্লবী মাওলানা আকরাম খাঁকে আমাদের দেশের ইতিহাস থেকে মুছে দেওয়া হোল কেন এসব প্রশ্নের সদুত্তর পাওয়া যায় না আজও। বাংলাদেশের বাসিন্দা হওয়াটাই যদি কারণ হয় তাহলে কি বাংলাদেশিরা তাঁদের ইতিহাস থেকে রবীন্দ্রনাথ সুভাষচন্দ্র গান্ধীজী এবং জহরলালকে এই অজুহাতেই বাদ দেবেন?

এইসব কথা সামনে রেখেই রচিত হোল এই গ্রন্থ। বর্তমান ও আগামী দিনের অনুসন্ধিৎসু পাঠক গবেষক লেখক বুদ্ধিজীবী সাংবাদিক বক্তা ও রাজনীতিবিদ্‌দের জন্য এটি হচ্ছে একটি আকর গ্রন্থ, যা তাঁদের জন্য হবে সবিশেষ প্রাপ্তি।

যাঁরা ইতিহাস বা তথ্যবহুল লেখা লেখেন তাঁদের থাকে গভীর পাণ্ডিত্য, অভিজ্ঞতা আর স্বাতন্ত্র্য। আমার ক্ষেত্রে ব্যাপারটি বিপরীত। 'পরের ধনে পোদ্দারি'র মত আমি শুধু প্রখ্যাত বড় ছোট স্বদেশী বিদেশী পণ্ডিতদের উদ্ধৃতি এবং পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত তথ্যাদি জড়ো করে আমার ব্যক্তিগত সুতো দিয়ে মালা গেঁথে দিয়েছি মাত্র।

এই বইটির 'বজ্রকলম' নামটি অনেকেই পছন্দ করছেন না জেনেই দ্বিতীয় খন্ডের নাম পাল্টে রাখা হোল 'এ এক অন্য ইতিহাস'। ভুল বোঝাবুঝির অবসান ঘটাতে ছোট্ট অক্ষরে 'বজ্রকলম দ্বিতীয় খন্ড' কথাটিও এতে লেখা থাকল।

স্বামী বিবেকানন্দ ও রামকৃষ্ণ পরমহংস আজকের ভারতে এত বিরাট ব্যক্তিত্ব যে, এঁদের সম্বন্ধে এই বইয়ের প্রথম খন্ডের প্রতিশ্রুতির পরিপ্রেক্ষিতে লিখতে হলে বইটি বড্ড বড় হয়ে যায়। আবার যদি একটি পৃথক খন্ড করা হয় তাহলে অনেকের কাছে পুস্তকটি মনে হবে একঘেয়ে ও ক্লান্তিকর। সেইজন্য 'মুসলমানদের চোখে বিবেকানন্দ' নাম দিয়ে অত্যন্ত প্রয়োজনীয় ও তথ্যবহুল গ্রন্থ প্রকাশ করার প্রস্তুতি নেওয়া হয়েছে। তাতে প্রসঙ্গক্রমেই এসে যাবেন রামকৃষ্ণ পরমহংসও।

মুদ্রণ ত্রুটি, ধারাবাহিকতার ত্রুটি, ব্যাখ্যা ও উদ্ধৃতি প্রয়োগের ত্রুটি, তথ্য পরিবেশনের ত্রুটি যদি হয়েই থাকে তাহলে আমি তা মাথা পেতে মেনে নিচ্ছি। আর পাঠকদের কাছে আবেদন জানাচ্ছি যে তাঁরা যেন তাঁদের পরিচয়সহ যুক্তিগ্রাহ্য দলিলের সঙ্গে সঠিক তথ্য আমার অথবা প্রকাশকের ঠিকানায় পাঠিয়ে কৃতার্থ করেন, যেটা আমার ও পাঠকদের পক্ষে হবে একটি মূল্যবান সংশোধন ও সম্পদ; তাঁদের জন্য দেওয়া রইল আমার আগাম কৃতজ্ঞতা ও শুভাশিস্। উপকৃত ও মুগ্ধ পাঠকদের কাছ থেকেও আশা করি প্রাণবন্ত শুভেচ্ছা আর সেইসঙ্গে আরও উৎসাহ।

সমস্ত প্রশংসা আমার মালিক বিশ্বনিয়ন্তা স্রষ্টারই জন্য।

মেমারি, বর্ধমান
পশ্চিমবঙ্গ

বিনীত
গোলাম আহমাদ মোর্তজা

বিজ্ঞানী সৈয়দ মীর মহসিন

বিজ্ঞানী ড. মুহাঃ কুদরতে খুদা

জেলখাটা কবি নজরুল ইসলাম

জেলখাটা বুদ্ধিজীবী মাওঃ আকরাম খাঁ

ভূমিকা

যে কোন জাতির জীবনে অতীত ইতিহাস ঐতিহ্য এক গুরুত্বপূর্ণ ও অনুসরণীয় বিষয়সমূহের মধ্যে উল্লেখযোগ্য একটি বিষয়। যদি অতীত ইতিহাসের সাথে অতীত ঐতিহ্যের আদান প্রদানের ক্ষেত্রে ভিত্তিভূমি বিছিন্ন হয়ে পড়ে সে ক্ষেত্রে যে কোন জাতির পতন অনিবার্য হয়ে পড়ে। অতীতের প্রতিবিম্বই হচ্ছে বর্তমান। আর বর্তমান উপহার দিবে ভবিষ্যতকে। এসব চলমান প্রক্রিয়ার কারণেই সব সচেতন জাতি তার অতীত ইতিহাসের পঠন -পাঠনকে যেমন গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হিসাবে গুরুত্ব প্রদান করে, আর তেমনি অতীত ঐতিহ্যের পুরোপুরি সংরক্ষণকেও এক অপরিহার্য বিষয় হিসাবে বিবেচনা করে। সত্যি কথা বলতে গেলে এ ক্ষেত্রে জাতি হিসাবে ইতিহাসের পাতায় আমাদের অবস্থান যথাযথ নয়। আমাদের মুসলমানদের ইতিহাস চর্চার ক্ষেত্রে অবস্থান ক্ষেত্রে বিশেষ আশাহত নয়। কারণ আমরা চারদিক থেকেই ইতিহাসের পাতায় বৈষম্যের স্বীকার। এরও একাধিক কারণ রয়েছে। এখানে বর্ণনার স্থান নয়। ইতিহাসে সৃষ্ট বিভ্রান্তির দ্বারা আমরা অনেক ক্ষেত্রেই ভিন্ন জাতির বিদ্বেষমূলক প্রচারণায় তাড়িত হয়ে থাকি। তাই এ ক্ষেত্রে ইতিহাসকে আমরা সুস্পষ্ট করে তোলার প্রচেষ্টা নিতান্তই ক্ষীণ। জাতি হিসেবে এটা আমাদের ইতিহাস সচেতনারই অভাবের পরিচায়ক। বলার অপেক্ষা রাখে না ইতিহাস ঐতিহ্য সংরক্ষণ এবং চিন্তা-চেতনা ভিত্তিক ইতিহাস প্রণয়নে আমাদের সচেতনাতার অভাব আরও প্রকট। যে জাতির অতীত গৌরবের, অতীত শৌর্যবীর্যের, অতীত মর্যাদার মহিমা, সে জাতিরই বহু স্মৃতিচিহ্ন ইতিমধ্যেই কালের আবর্তে বিলিন হয়ে গেছে। অর অবশিষ্ট যা কিছু আছে তাও এখন বিলুপ্তির পথে। এ পরিস্থিতে আমরা জাতি হিসাবে মিথ্যা ইতিহাস মেনে নিয়েছি এবং নতুন ইতিহাস প্রণয়নের প্রচেষ্টা না করে থাকাটাই আমাদের অর্থাৎ এ জাতির জন্য পীড়াদায়কই নয় বরং যন্ত্রণাদায়কও বটে।

কোন জাতির স্বচ্ছ পরিচ্ছন্ন ইতিহাস না থাকাটা (অনেক ক্ষেত্রে আছে বিভ্রান্তি ও বিদ্বেষপূর্ণ যা অন্যান্য জাতির দ্বারা রচিত) অত্যন্ত দুঃখজনক। ইতিহাস কেবল অতীতের অন্ধকারে ফেলে আসা কতিপয় ঘটনাবলীর শব্দ সমষ্টিই নয়। কালের প্রেক্ষিতে ইতিহাস অতীতের অধ্যায় কে ধারণ করে থাকলেও এর প্রভাব প্রক্রিয়া, প্রতিক্রিয়া অনাগতকাল জাতিকে পথ দেখায় এবং দিক-নির্দেশনা প্রদান করে অনুপ্রাণিত করে। কোন জাতির জনগোষ্ঠির গৌরবময় ইতিহাস থাকা সত্ত্বেও এ বিষয়ে যারা নিষ্ক্রীয়, নির্বিকার, চেতনাহীন—তারা সত্যিকার অর্থেই হতভাগ্য। আমাদের দেশের শিক্ষিত সমাজের অধিকাংশই বিশেষ করে স্বদেশের ইতিহাস সম্পর্কে সচেতন নয়। ইংরেজ রাজত্বের ইতিহাস থেকে বর্তমান সময়কালের ইতিহাসে কত পক্ষপাতিত্ব বিভ্রান্তি, বিদ্বেষতায় পরিপূর্ণ, যদিও আমাদের শিক্ষিত সমাজ বই পত্রের অনেক খবর রাখার পরও তারা এসব দেখে শুনেও পদানুকরণ করে যাচ্ছেন। মুসলিম জাতির ইতিহাস, ভারতে মুসলমান রাজত্বের ইতিহাস, ১৯৪৭ সনের ভারত বিভাগ সম্পর্কীত ঘটনাপ্রবাহ আজকের বাংলাদেশের ইতিহাস পাঠককে বিভিন্নপন্থায় ভুল বুঝানোর প্রয়াস লক্ষ্য করা যায় "ত্রিবেনী শক্তির প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ নির্দেশে এক দেহে লীন হয়ে যাবার মন্ত্রণায়। বর্তমান মুসলমানেরা বিশ্বের সর্বত্রই আজ গভীর ষড়যন্ত্রের শিকারে পরিণত। ইতিহাসে মুসলমানেরা যে কত উপেক্ষিত এ সম্পর্কে মৌলবী দীন মোহাম্মদ সাহেব এক গ্রন্থে লিখেছেন ঃ দুর্ভাগ্যবশত ভারতের সিংহাসন হইতে বিদায় হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই মুসলমানদিগের সর্ববিধ গৌরব বিনষ্ট হইয়াছে। কূটনীতি -বিশারদ খ্রীষ্টশিষ্যরা মাত্র যে তাহাদের রাজসিংহাসন অপহরণ করিয়াই তিপ্তি লাভ করিয়াছেন, তাহা নহে। যাহাতে ভবিষ্যতে শিষ্যরা মুসলমানদিগকে ঘৃণায় চক্ষে দর্শন করেন, তাহারও বিস্তর উপায় স্থাপন করিয়াছেন। তাঁহারা মিথ্যা কাহিনীর দ্বারা মুসলমান চরিত্রে কলংক-কালিমা নিক্ষিপ্ত করিয়া ইতিহাসের পৃষ্ঠা পূর্ণ করিতে বিন্দুমাত্র ও কৃপণতা করেন নাই। খৃষ্টানদের একটি মহৎ গুণ এই যে, দান ও অবদান পরম্পরায় তাহারা যতই না কৃপণ হোন না কেন, কিন্তু অন্য ধর্মাবলম্বীর অযথা অপবাদ ঘোষণা করিতে দান শৌণ্ডতায় পরাকাষ্ঠা দেখাইয়া থাকেন। অপরদিকে ঐতিহাসিকদিগের লেখনী মুসলিম বীরপুরুষ ও সম্রাটগণের অযথা কলংকোদগার অবধারিত।

এ সম্পর্কে আরও একজন বিশিষ্ট লেখক ও গবেষক মোহাম্মদ গোলাম হোসেন লিখেছেন ঃ "খৃষ্টান ঐতিহাসিকরা মুসলমানদের মিথ্যা অপবাদ ও অযথা কলংক রটাইতে যে মুক্তকণ্ঠ তাহার প্রমাণ সংগ্রহ করিতে অন্যত্র যাইতে হইবে না। বঙ্গদেশের ইতিহাস পাঠ করিলেই তাহা প্রমাণিত হইবে। ..... ইংরেজরা মুসলমানদিগকে যে চরিত্রে আখ্যায়িত করিয়া হিন্দুদিগকে পথ দেখাইয়াছেন, তাহারাও তদ্রূপ দর্শন করিয়াছেন। আর হিন্দুরা সেই চর্বিত চর্বন করিয়া, নতুন ইংরেজ প্রভুর মনোরার্থে তাহাতে আরও রং চড়াইয়া, ইতিহাস, নাটক, নভেলে দেশ বিস্মৃত করিয়াছেন। অনেকেই নিজে কিছু বিচার আচার না করিয়া কেবল ইউরোপীয় পণ্ডিতদিগেরই মতের অনুবর্তী। এই সমস্ত হইতে অনুমান হয় এ দেশবাসী পাশ্চাত্যবিদ্যা পারদর্শী ব্যক্তিবর্গ ইউরোপীয় পণ্ডিতদিগের বিদ্বেষ বুদ্ধি চালিত লেখনী প্রসূত অনেক কথাই বিশ্বাস করেন। সেই বিশ্বাস তাদের অটল। ..... তাহারা কোনরূপ বিচার আচারের ধারধারেন না।

—(বঙ্গদেশীয় হিন্দু মুসলমান)

এই সমস্ত আলোচনা হইতে একটা স্বতঃসিদ্ধ সিদ্ধান্ত যে, ইংরেজ ঐতিহাসিকরা ইচ্ছা করিয়াই সেই রূপ করিয়াছেন। কার্যক্রমে যেন ইংরেজ জাতি এদেশের রাজশক্তি লাভ করেন। রাজশক্তি লাভ করিয়া পূর্ববর্তী সম্রাটদিগের কুৎসা না গাহিতে পারিলে শাসিতদিগের অন্তকরণে ভক্তি স্থান লাভ করা কিছু কষ্টকর হইয়া পড়ে। সেই জন্যই তাঁহারা এদেশীয়দের ইতিহাস, লোকচরিত্র ও ধর্ম সংক্রান্ত ব্যাপারাদিতে এরূপ বিভিন্ন প্রকারে চিত্রিত করিয়াছেন। ..... এ দেশীয় ইংরেজকৃত মুসলমান রাজত্বের ইতিহাস অপরাধ, কলংক, কুৎসা রটনার সহিত ইংরেজদের জাতীয় স্বার্থসিদ্ধি সম্পূর্ণরূপে জড়িত। ..... সাধারণতঃ এ দেশে যে সমস্ত স্কুলপাঠ্য ইতিহাস প্রচলিত সে সমুদয় ইংরেজ ঐতিহাসিকগণের অবিকল অনুকরণ অথবা অনুসরণ মাত্র। তাহাতে অনুসন্ধিৎসার কোন পরিচয় তেমন প্রাপ্ত হওয়া যায় না। তবে সম্প্রতি কতিপয় সহৃদ কৃতবিদ্য অনুসন্ধিৎসু হিন্দু মহানুভবের অবির্ভাবে মুসলমান রাজত্বের কলংক কালিমা স্খলনের পথ কতক পরিমাণে উন্মুক্ত হইয়াছে। ..... সে ঋণ এক প্রকার অপরিশোধ্য। পুণ্য শ্লোক রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, নিখিল নাথ রায়, অক্ষয় কুমার মৈত্রেয় বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। অপরাপর দুই একজন মহাত্মারও অবির্ভাব হইতে আরম্ভ হইয়াছে।

(মোহাম্মদ গোলাম হোসেন ঃ বঙ্গদেশীয় হিন্দু মুসলমান) প্রকাশক ঃ মুন্‌শী মোহাম্মদ মেহেরুল্লাহ রিচার্স একাডেমী, ঢাকা।

উপমহাদেশে ইংরেজ রাজত্বের সময় একথা ঐতিহাসিকভাবেই সত্য যে, সুদীর্ঘ কাল পাশাপাশি বসবাস করেও হিন্দু মুসলমানের কোন সম্প্রতি গড়ে উঠে নাই; একে অপরকে সন্দেহ করেছে, করেছে ঘৃণা। এর মর্মমূলে কাজ করেছে সংখ্যা গরিষ্ঠ হিন্দু সম্প্রদায়ের আত্মকেন্দ্রিকতা ও সংখ্যা লঘু মুসলমান সমাজকে জানবার ব্যাপারে নিদারুন নিস্পৃহতা ও অনিহা। পরাধীনতার মুক্তির ব্যাপারে যখনই মুসলমানগণ ইংরেজ রাজত্বের অবসান ঘটাতে চেয়েছেন, তখনই হিন্দুরা ইংরেজদের সাথে সখ্যতা গড়ে তুলতে সর্বশক্তি নিয়োগ করেছে। এমন একটি দৃষ্টান্ত ঃ পলাশীর পরাজয়ের পর মুসলমানগণ যখন ইংরেজদের বিরোধিতা করেছে তখন হিন্দুরা করেছে ইংরেজ শাসনের প্রতি সহযোগিতা। ১৯০৫ সনে মুসলমানদের স্বার্থে ঢাকাকে রাজধানী করে পূর্ববঙ্গ ও আসাম নিয়ে একটি মুসলিম প্রধান প্রদেশ গঠিত হলে এর বিরুদ্ধে সারা ভারতের হিন্দুরা বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠে। বৃটিশ সরকার বাধ্য হয়ে ১৯১১ সনে তা পাল্টাতে বাধ্য হয়। ইংলন্ডের রাজা ও ভারত সম্রাট ১৯১১ সনে দিল্লীতে ডি. এল. রায় তাঁকে খোশ আহামেদ জানিয়ে লিখেন ঃ

বাজুক শংখ, উড়ক নিশান, বিবিধ বর্ণে সাজি,
ভারতের রাজা, ভারতের রানী, ভারতে এসেছে আজি।

কোলকাতা কেন্দ্রিক বাঙালি হিন্দু মধ্যবিত্ত ও বুদ্ধিজীবী মহল কোন প্রেক্ষিতে নিজেদের শ্রেণী ও গোষ্ঠীস্বার্থে সিপাহী বিদ্রোহের বিরোধিতা করেছিল এবং এ বিদ্রোহ ব্যর্থ হওয়ার পর এরা কিভাবে আনন্দ প্রকাশ করেছিল এর পরবর্তী বছরগুলোতে আমরা দেখতে পাই যে, বাঙালী তথা ভারতীয় হিন্দু জাতীয়তাবাদকে জাগ্রত করার লক্ষ্যে ইংরেজ পৃষ্ঠপোষকায় এ সৃষ্ট বুদ্ধিজীবী শ্রেণী কবিতা, গান, নাটক, উপন্যাস ও যাত্রাগানে কি রমক নগ্নভাবে প্রচেষ্টা চালাচ্ছে। ..... এ বুদ্ধিজীবী শ্রেণী প্রশ্চাত্যের ইংরেজ সভ্যতা ও সংস্কৃতির অনুকরণ , অনুসরণ ও গলধকরণ করে সাম্রাজ্যবাদী সম্পূরক হিসেবে নিজেদের অবস্থানকে সুদৃঢ় করেছে। উভয়ের মধ্যে সৃষ্ট হয়েছে এক অশুভ আঁতাত। —(এম. আর আকতার মুকুল ঃ কোলকাতা কেন্দ্রিক বুদ্ধিজীবী)

বৃটিশ যুগে সাহিত্য ক্ষেত্রে বাংলা নাটকে ভয়াবহ মুসলিম বিদ্বেষ লক্ষ্যণীয়। এরই একটি নমুনা এখানে তুলে ধরা হল। কিরণ চন্দ্র বন্দোপাধ্যায় রচিত অন্যতম দেশাত্মক বোধক (?)

নামক হচ্ছে 'ভারতে যবন'। এ নাটকের ভারত মাতার দুঃখে ভারত সন্তানেরা যবন (মুসলমান) বধ করে স্বাধীনতা (?) অর্জনের কিভাবে প্রচেষ্টা করেছে নাট্যকারের লিখিত বক্তব্যের নমুনা হচ্ছে ঃ স্বাধীনতা সম কি আছে আর, পামর যবনে করি কি ভয়?

উনবিংশ শতাব্দীর এসব লেখকের দৃঢ় ধারণা ছিল যে এরই সাথে গণমানুষের হৃদয়ে দেশাত্ববোধ জাগ্রহ হবে। এ শতাব্দীর শেষ ভাগের ১৮৭৫ (জোতিরিন্দ্র নাথ ঠাকুর) রচিত সরোজনী নাটক সংলাপের অংশ বিশেষ ঃ

সরোজনী ॥ মা চতুর্ভূজা। যাদের জন্য পিতার আজ এরূপ বিষম ভাবনা হয়েছে, সেই দৃষ্ট মুসলমানদের শ্রীঘ্র নিপাত কর।

লক্ষণ ॥ বৎসে মুসলমানদের নিপাত সহজে হবার নয়। তার পূর্বে অশ্রুপাত করতে হবে। জোতিরিন্দ্র নাথ ঠাকুরের মুসলিম বিদ্বেষী আরও একটি নাটকের সংলাপ ঃ

'যেখানে মুসলমান থাকে সেখানকার বাতাসও যেন আমার কাছে বিষতুল্য বোধ হয়। এ স্বপ্নময় নাটক (১৮৮২) এর অন্যতম চরিত্রে শুভসিংহ সংলাপ ..... দেব মন্দির সকল, চুর্ণচূর্ণ করিতেছে স্বেচ্ছ পদাঘাতে, বেদমন্ত্র ধর্ম করিতেছে লোপ, গোহত্যা নির্ভয়ে করে রাজপথ মাঝে।

এর চেয়ে মুসলিম বিদ্বষী বক্তব্য আর কি হতে পারে। ঠাকুর মহাশয় এখানে বলতে চেয়েছেন যে ..... মুসলিম রাজশক্তি শুধু অত্যাচারীই নয় বরং পুরো মুসলমান সমাজটাই এ পদাংক অনুসরণ করছে।— (কোলকাতা কেন্দ্রিক বুদ্ধিজীবী ৪৮-৪৯ পৃঃ)

এরপর আসা যাক কাব্য কেন্দ্রিক সাম্প্রদায়িকতায় মুসলমানদের স্বার্থে ইংরেজ আমলে প্রদেশ বাস্তবায়নের বিরোধিতা করতে যেয়ে বিশ্বকবি রবীন্দ্র নাথ ঠাকুর লিখেন ঃ আমার সোনার বাংলা গানটি। এ প্রসঙ্গে সাংবাদিক সাহিত্যিক মোহাম্মদ মোদারের লিখেছেন ঃ ১৯১১ সনে বঙ্গভঙ্গ রদ হয়ে যাওয়ায় কবি সোনার বাংলা গান লিখে হিন্দুদের প্রশংসা অর্জন করেছিলেন। কিন্তু মুসলমানেরা এতে ক্ষুদ হয়।— (ইতিহাস কথা কয়)

বাংলাদেশের জাতীয় সঙ্গীত সে পৌত্তলিকা মতবাদের ধারক, তা সত্ত্বেও আমরা তা মেনে নিতে বাধ্য হয়েছি, কারণ আমাদের চালিকা শক্তি থাকা সত্ত্বেও আমরা নিয়ন্ত্রিত হচ্ছি এক অশুভ শক্তির নির্দেশে এবং একেই আমরা সত্যিকার পথ প্রদর্শকরূপে মেনে নিয়েছি। এর চাইতে আমাদের বড় আক্ষেপ আর কি হইতে পারে যা ইতিপূর্বেও আলোচিত হয়েছে। প্রখ্যাত সাহিত্যিক কবি দেওয়ান আবদুল হামীদ সাহিত্যরত্ন লিখেন, "রবীন্দ্র সাহিত্যে মুসলমান" গ্রন্থে লিখেছেন, "তাঁর সাহিত্যে মুসলমানগণ সর্বত্র নিগৃহিত এবং নিকৃষ্ট চরিত্রে আখ্যায়িত করা হয়েছে এবং তিনি মুসলিম বিদ্বেষী ছিলেন।"

হিন্দুদের চরিত্র বিশ্লেষণ করতে গিয়ে তাদের জ্যাতিভিমানের যে অভিপ্রায়টি হচ্ছে ঃ বাঙালি হিন্দুরচিত্তে একটি অভিমান দুর্জয় হয়ে আছে। সে অভিমান চলে আমারই বাঙালী জাতি, আমাদের ভাবনা, ধর্ম, আচার, কৃষ্টি বাঙালী জাতির নিজস্ব ও সর্বস্ব। —(মোহাম্মদ ওয়াজেদ আলী, হিন্দু মুসলমান ঃ বুলবুল চৈত্র ঃ ১৩১৪ বাংলা)

অর্থাৎ বাঙালি মুসলমানকে বাঙালি বলে পরিচয় দিতে হলে হিন্দুত্বে অন্তর্লগ্ন হতে হবে। কথাটা ভুদেবচন্দ্রের একটি লেখায় অনবগুণ্ঠিত হয়ে আত্মপ্রকাশ করেছে। 'শিখা' থেকে উদ্ধৃতি দেয়া যাক ঃ

ভারতীয় জাতীয়তার যে আদর্শ হিন্দু গড়িয়া তুলিয়াছে তাহা সম্পূর্ণ হিন্দু জাতীয়তা, তাহাতে স্বতন্ত্র সত্ত্বা বিশিষ্ট অন্য সম্প্রদায়ের স্থান নাই। পরলোকগত ভূদেববাবু তাঁহার সামাজিক প্রবন্ধে হিন্দু-মুসলমান মিলনের এক ছবি আকিয়াছেন। এই জটিল সমস্যার তিনি যে সমাধান করিয়াছেন তাহা মৌলিক না হইলেও খুবই উপদেশব্যঞ্জক। তাঁহার মতে, 'জৈন ও শিখদিগকে যখন সাধারণ হিন্দু সমাজের অন্তর্নিবিষ্ট বলিয়াই বোধ হয়, কালে এখানকার মুসলমানেরাও যে ভারত সমাজের মধ্যে একটি বর্ণ বিশেষ রূপে লক্ষিত হইবে তাহার বিশেষ সম্ভাবনা। ('স্বাধীন ভারতের দাস', 'শিখা", ১৩৩৮) বাংলার মুসলমান স্বভাবতই এ দৃষ্টিভঙ্গিকে ভয় ও সন্দেহের চোখে দেখেছে। এমনিক ভঙ্গভঙ্গ-বিরোধী আন্দোলন যখন প্রবল আকার ধারণ করে উত্তেজিত বাঙালিয়ানাকে সত্য ও প্রত্যক্ষ করে তুলতে চেয়েছিল, তখনও দেখা গেছে এ আন্দোলনের ধারায় এসে শিবাজী –উৎসবের মত অন্ধ গোঁড়ামি সংগোপনে মিলিত হয়ে গেছে। রবীন্দ্রনাথও শিবাজীর 'একধর্ম রাজ্য পাশে খন্ড ছিন্ন বিক্ষিপ্ত ভারত বেঁধে দিব আমি' শুনে উৎসাহিত হয়েছেন এবং সে উৎসাহে নবীন সেনের এক ধর্ম, এক জাতি—এক রাজ্য এক নীতি'র প্রতিধ্বনি শোনা গেছে এমন অভিযোগ অযথার্থ নয়।

বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলন উপলক্ষে কংগ্রেস যে কর্মসূচী প্রণয় করে তা নিছক হিন্দুরাই মাত্র পালন করিতে পারে। বাংলার তদানীন্তন নেতা মিঃ সুরেন্দ্রনাথ বন্দোপাধ্যায়ের 'India in the making নামক সুবিখ্যাত পুস্তক হইতে সেই শোক দিবসের কর্মতালিকাটি উদ্বৃত করা হল ঃ

(ক) রাখী বন্ধন উৎসব–প্রত্যেকের বাহুতেই লাল ফিতা বাঁধিতে হইবে। ইহা ভ্রাতৃত্বের প্রতীক। ইহা প্রাচীন ভারতীয় (মানে হিন্দু) প্রথার পুনঃপ্রবর্তন।

(খ) ১৯শে অক্টোবর উপবাসবত পালন করিতে হইবে। ..... খুব সকালে সকলকে খালি পায়ে হাঁটিয়া আত্মশুদ্ধির জন্য গঙ্গাস্নানে যাইতে হইবে ইত্যাদি।

উপরোক্ত কর্মতালিকা অনুসরণের ফলে অত্যন্ত স্বাভাবিকভাবেই হিন্দুদের মধ্যে উগ্রধর্মীয় অনুভূতি জাগ্রত হইল এবং মুসলমানরা এই আন্দোলনের বিরোধিতা করায় হিন্দুদের উপরোক্ত অনুভূতি উগ্র মুসলিম-বিদ্বেষে পরিণতি লাভ করিল। ফলে, পূর্ব-বঙ্গের নানাস্থানে হিন্দু-মুসলমানে দাঙ্গা শুরু হইয়া গেল। তাহাতে বহু মুসলমান ও হিন্দু প্রাণ হারাইল।

শুধু এই মুসলিম–বিরোধী কর্মতালিকাই নয়-উগ্র মুসলিম বিদ্বেষমূলক একটি সঙ্গীতকে 'জাতীয় সঙ্গীত' বলিয়া এই আন্দোলনের ভিতর দিয়া চালু করা হইল। উহাই বঙ্কিমচন্দ্রের সুবিখ্যাত 'বন্দেমাতরম' সঙ্গীত। —[আবুল কালাম শামসুদ্দীন ঃ 'লীগ রাজনীতির ক্রমবিকাশঃ মোহাম্মদী, কার্তিক, ১৩৫১]

এ 'বন্দেমাতরম'কে নিয়ে গোঁড়া হিন্দুদের যে অসহিষ্ণুতা প্রকাশ পেয়েছে তার তুলনা বিরল। রবীন্দ্রনাথের 'ঘরে বাইরে' উপন্যাসে বিমলা ও নিখিলেশের আত্মকথায় এ বিষয়ে অতি উৎসাহের সমালোচনা আছে। বুদ্ধিজীবী মহলের কেউ কেউ এ অসহিষ্ণু মনোবৃত্তির নিন্দাও করেছেন। যেমন,

হাইকোর্টের অন্যতম আইনজীবী মিঃ এন. এন. সরকার (এখন স্যার নৃপেনন্দ্রনাথ) এ উপলক্ষে সংবাদপত্রে লিখিয়াছেন যে, বঙ্কিমচন্দ্র রচিত 'বন্দেমাতরম' শীর্ষক যে সঙ্গীতটি আজকাল জাতীয় সঙ্গীতরূপে চালাইয়া দিবার চেষ্টা চলিতেছে, উহাকে 'জাতীয় সঙ্গীত" বলা যাইতে পারে না। প্রথম যুক্তি এই যে, সঙ্গীতটির জন্ম মুসলিম বিদ্বেষ হইতে, বঙ্কিমচন্দ্র 'আনন্দমঠের' অন্যতম প্রধান 'সন্তান" ভবানন্দের মুখ দিয়া উহা গাওয়াইয়াছিলেন। এই সন্তানদের ব্রত ছিল 'নেড়ে মাতাল" দিগকে এদেশ হইতে 'মেরে তাড়ানো'। সুতরাং এই সঙ্গীতে মুসলিম বিদ্বেষের গন্ধ আছে। মিঃ সরকারের দ্বিতীয় যুক্তি এই যে, এই সঙ্গীত পৌত্তলিকতাপূর্ণ সুতরাং যে বাংলাদেশে শতকরা পঞ্চাশজন অধিবাসী একেশ্বরবাদী মুসলমান সে দেশের জাতীয় সঙ্গীতরূপে ইহাকে চালান যাইতে পারে না। —(কালস্রোতাঃ বুলবুলঃ ফাগুনঃ ১৩৪৩)

বঙ্কিম যে বিষবৃক্ষ হিন্দু মুসলমানের ক্ষেত্রে রোপণ করিয়া গিয়াছেন তাহা নিত্য নতুন ফল ফলাইতেছে। আজ যে হিন্দু মহাসভা মুসলমানকে ভারত হইতে তাড়াইয়া দিতে ও মুসলমানকে হিন্দু বলিয়া পরিচয় দিতে হইবে বলিয়া শাসাইতেছেন, সংকীর্ণমনা বঙ্কিমবাবুই তাহাদের দীক্ষাগুরু। তাহার কৃপাতেই আজ হিন্দু-মুসলমানের মিলনের মধ্যস্থলে যে সুবিশাল প্রাচীর অন্তরায় স্বরূপ দাঁড়াইয়াছে তাহা ভেদ করা সুকঠিন। সুতরাং স্বরাজ লাভের আশাও দুরাশা মাত্র। —[সৈয়দ শামসুল ইসলাম ঃ 'আনন্দমঠ'ঃ 'আল ইসলাহ্' ঃ ভাদ্র ও আশ্বিন, ১৩৪০ বাংলা]

স্বরাজ অবশ্যি পরে অর্জিত হয়েছে কিন্তু সে 'স্বরাজ' নয় যার স্বপ্ন অবিচেক হিন্দু কল্পনায় ধরা পড়েছিল, যার কথা ১৯৩১-সনের ২৩শে এপ্রিল বসুমতী সম্পাদকীয়তে লিখেছিলেন বলে 'আল ইস্‌লাহ' ঃ সিলেট, সম্পাদক (মরহুম) মুহম্মদ নুরুল হক উল্লেখ করেছেন।

ইতিহাসের পাতায় মুসলমান রাজত্বের ইতিবৃত্ত যাহা আমরা দেখিতে পাই, তাহা অনেক স্থলেই নিতান্ত কলঙ্ক-কালিমাময়। এতদসংক্রান্ত কি দেশীয়, কি বিদেশীয় পুরাবৃত্তকারগণের গ্রন্থে তাহার সত্য সুচিত্র দেখিতে পাইবার আশা অতি কম। এ দেশীয় ইতিবৃত্তকারদিগের মধ্যে

এমনও সহৃদয় ব্যক্তি অনেকেই আছেন, যাঁহারা কোনরূপ বিদ্বেষ-বুদ্ধি প্রণোধিত হইয়া লেখনী চালনা করেন নাই। তবে যাহারা নিতান্ত ইংরেজ জাতির স্তাবক, ইংরেজের লিখিত যাহা কিছু বেদবাক্যস্বরূপ গ্রহণ করেন, তাহারাই যে সেরূপ করিয়াছেন, একথা আমরা মুক্তকণ্ঠে বলিব। সেইরূপ পাশ্চাত্য শিক্ষায়-শিক্ষিত শ্বেতাঙ্গস্তুতি-পরায়ণ এদেশী ঐতিহাসিকগণের লেখনী—মাহাত্ম্যে মুসলমান রাজত্বের অতি বিভীষিকাময় চিত্রপট অঙ্কিত হইয়াছে এবং আমরা এ কথাও বলিব যে, তাহা তাঁহাদেরই স্বকপোল কল্পনা নয়, তবে ইংরেজ ঐতিহাসিকগণের ছায়া ও তাহা তাঁহাদেরই স্বকপোল কল্পনা নয়, প্রতিকৃতি। ইংরেজ ঐতিহাসিকগণের কল্যাণে যে মুসলমান রাজত্ব-যুগের ইতিবৃত্ত নিতান্ত বিকৃত হইয়াছে, একথা এ দেশীয় বঙ্গভাষার ইতিবৃত্তকার মহাত্মা রজনী কান্ত গুপ্ত মহাশয়ই তাঁহার রচিত ভারতবর্ষের ইতিহাসে প্রকাশ করিয়াছেন—"আজ পর্যন্ত ভারতের প্রকৃত ইতিহাস লিখিত হয় নাই। কোন কোন সংকীর্ণ-হৃদয় বিদেশীর হস্তে পড়িয়া, ভারতের ইতিহাস অনেক স্থলেই কলঙ্কিত ও অনেক স্থলে অতিরঞ্জিত বা অ রঞ্জিত হইয়া উঠিয়াছে।" —(ভারতবর্ষের ইতিহাস, ইংরেজ রাজত্ব)

মৃত মহানুভব ভূদেব মুখোপাধ্যায় মহাশয়ও প্রায় এভাবে লিখিয়াছেন—"অনেক ইংরেজ গ্রন্থকার কখনও স্পষ্টাক্ষরে, কখনও ইঙ্গিতক্রমে বলিয়া থাকেন যে, মুসলমানেরা যখন দেশের রাজা ছিল, যখন হিন্দুদিগের প্রতি অকথ্য অত্যাচার করিয়াছিল। ইংরাজ গ্রন্থকারেরা এইরূপে হিন্দুদিগের মনোমধ্যে মুসলমানদিগের প্রতি একটি গূঢ় বিদ্বেষ-বীজ বপন করিয়া দিতেছেন। আধুনিক ইংরেজী-শিক্ষিত যুবকদিগের হৃদয়ে, মুসলমান জাতি এবং মুসলমান ধর্মের প্রতি যতটা বিদ্বেষ দেখা দিয়াছে, পুর্বকালের পারস্য ভাষায় সুশিক্ষিত, সদাচার-সম্পন্ন সদ ব্রাহ্মণদিগের মনে তাহার অর্দ্ধাংশও দেখা যাইত না।" -('সামাজিক প্রবন্ধ' জাতীয়ভাব-ভারতবর্ষে মুসলমান)

বিদেশীয় পণ্ডিতেরা, কি ঐতিহাসিকেরা, এ দেশীয় সম্রাটদিগের চরিত্রাঙ্কনে সেরূপ সহৃদয়তার কোন পরিচয় দেন নাই। এরূপও অনুমান হয়, তাঁহারা মুসলেম সম্রাটদিগের চরিত্রে কোন কোন স্থলে কলঙ্কারোপ করিতেও ইতস্ততা করেন নাই। এ দেশীয় হিন্দু শিক্ষিতেরা, মুসলমান সম্রাটদিগের চরিত্র কুৎসা রটনা করিতে গিয়া পাশ্চাত্যগণের অনুবর্তী হইয়াছেন। অনেকস্থলে কল্পনা প্রবণতার পরিচয় দিতে গিয়া, তিলে তালও করিয়াছেন। এই সমস্ত কারণে ভারতীয় মুসলমান-শাসন যুগ অনেকটা বিকৃতভাবে চিত্রিত হইয়াছে! এরূপ আমরা সিদ্ধান্ত করিতে পারি কি?

"পাঠকদিগের এ কথাও স্মরণ করা উচিত, বিদেশীদের হাতে পড়িয়া এ দেশীয়দিগের গৌরব খর্ব না হইয়া পারে না। পাশ্চাত্যদেশবাসীরা সমস্ত বিষয়েই জয়পতাকা লাভের বড়ই ইচ্ছুক। এ দেশীয়রা বর্বর, অসভ্য, কৃষ্ণকায়; পাশ্চাত্য দেশবাসিরা সুসভ্য, দয়া, ধর্মশীল, শ্বেতকায়, আচার-পূত, এরূপ হাতে কলমের, বক্তৃতায়,একটা দৃঢ় বিশ্বাস, এ দেশবাসিদিগের অন্তকরণে অঙ্কিত করিতে তাহাদিগের চিরকালই প্রবল ইচ্ছা। এ বাসনা তাঁহাদের অনেকটাই পূর্ণ হইয়াছে। পাঠকগণ এ কথাও মনে রাখিবেন, যেখানে আমরা এ দেশীয় শিক্ষিতদিগকে 'ইংরেজ-স্তাবক' বলিয়াছি, তাহার অর্থ এইরূপ বুঝিতে হইবে, তাঁহারা পাশ্চাত্য পণ্ডিত, ইংরেজ, লেখকদিগের মতের অনুবর্তী এবং তাঁহাদের লিখিত বিবরণ-সে যাহাই হউক, এ দেশের ইতিহাস, কি লোকচরিত্র, কি অন্যান্য ধর্মসংক্রান্ত ব্যাপার, -অক্ষরে অক্ষরে সত্য বলিয়া বিশ্বাস করেন। এ দেশীয় ইতিহাস-সমালোচক যে দুই-একজন বিজ্ঞ ব্যক্তির মতামতের বিষয় আমরা উল্লেখ করিয়াছি, তাহাতে কিরূপ সিদ্ধান্ত হওয়া উচিত।"

"এরূপ কি অনুমান হয় না যে, ইংরেজ ঐতিহাসিকেরা, এ দেশের ইতিহাস আলোচনায় পূর্ণ অধিকার পাইয়া, যাহা ইচ্ছা তাহা করিয়াছেন: এ দেশে আইন ছিল না, কানুন ছিল না, সম্রাটের মুখের কথাই আইন, তিনি যেরূপ ইচ্ছা শাসন-দণ্ড পরিচালন করিয়াছেন, এরূপ একটা বিশ্বাস, মুসলমান সম্রাটদিগের বিরুদ্ধে, হিন্দুর মনে জন্মাইয়া দেওয়াই, তাঁহাদের প্রবল ইচ্ছা বলিয়া বোধ হয় নাকি?"

"এই সমস্ত আলোচনা হইতে একটা সিদ্ধান্ত স্বতঃসিদ্ধ যে, ইংরেজ ঐতিহাসিকেরা ইচ্ছা করিয়াই সেরূপ করিয়াছেন। কালক্রমে ইংরেজ জাতি এ দেশের রাজ-শক্তি লাভ করেন। রাজ-শক্তি লাভ করিয়া পূর্ববর্তী সম্রাটদিগের কুৎসা না গাহিতে পারিলে, শাসিতদিগের অন্তকরণে [illegible] স্থান লাভ করা কিছু কষ্টকর হইয়া পড়ে। সেই জন্যই তাঁহারা এদেশীয়দের ইতিহাস, লোকচরিত্র ও ধর্ম সংক্রান্ত ব্যাপারাদি ঐরূপ বিভিন্ন প্রকারে চিত্রিত করিয়াছেন।"

"[illegible] (হিন্দু-খৃষ্টানদের লিখিত) ইতিহাসসমূহ গাঢ় মনোযোগপূর্বক পাঠ করিয়া দেখিলে [illegible] প্রতীয়মান হয় যে, এ দেশীয় ইংরেজকৃত ইতিহাসে মুসলমান রাজত্বের অপবাদ কলঙ্ক [illegible] রচনার সহিত ইংরেজদিগের জাতীয় স্বার্থ-সিদ্ধি সম্পূর্ণ রূপে জড়িত। দুঃখের মধ্যে দুঃখ, [illegible] অধিক আক্ষেপ,এ দেশীয় শিক্ষিতেরা অনেকেই তেমন অনুসন্ধান না করিয়া, বিচার-[illegible] ধার না দারিয়া ইংরেজ লিখিত 'খেউড় পাচাল' যাহা কিছু আপ্তবাক্যবৎ বিশ্বাস করেন। [illegible] আস্থা, তাঁহাদের নিষ্ঠা এমনই প্রবল যে, তাহা কিছুতেই বিচলিত হইবার নয়। আমরা [illegible] সমস্ত ইংরেজ-স্তাবক দলের কিছু করিতে পারিব, এমন ভরসা অতি কম।"

"এই সমস্ত হইতে অনুমান হয়, এ দেশবাসী পাশ্চাত্য-বিদ্যা-পারদর্শী ব্যক্তিবর্গ, ইউরোপীয় [illegible]দিগের বিদ্বেষ-বুদ্ধি-চালিত লেখনী-প্রসূত অনেক কথাই বিশ্বাস করেন। সেই বিশ্বাস [illegible] অটল এবং ইহাও বিবেচনা হয়, সেইরূপ বিশ্বাস পোষণের পক্ষে, তাঁহারা কোনরূপ [illegible] আচারের ধার ধারেন নাই। পাশ্চাত্য পণ্ডিত, ইউরোপীয় ঐতিহাসিকেরা, অন্য [illegible]গণের গৌরব খর্ব করিতে যেন অধিক ভালবাসেন। তাহাদিগের নিকট অপর জাতীয়, [illegible] দেশীয়দিগের গৌরব যেন নিতান্তই অসহ্য। তাহারা ঐশ্বর্যমুগ্ধ মুসলমানদিগের গৌরব খর্ব [illegible] নিযুক্ত, এরূপ কেহ মনে করিবে না। মুসলমান ভিন্ন অন্য জাতিদের গুণ-গৌরব লইয়াও [illegible] ছিনিমিনি খেলিয়াছেন।—(বঙ্গদেশীয় হিন্দু মুসলমান)"

"এই সম্পর্কে হিন্দু-মুসলিম সমাজ সংস্কারক মুন্‌শী মোহাম্মদ মেহেরুল্লাহ লিখেছেন ঃ হিন্দু [illegible] উচ্চ হইতে নিম্নশ্রেণীর গ্রন্থ লেখকগণ শতাধিক বৎসর পর্যন্ত পবিত্র ইসলাম ধর্ম ও [illegible] যত প্রকার কুৎসিত চিত্রে চিত্রিত ও পৈশাচিক বিশ্লেষণে আক্রমণ করিয়া আসিতেছেন [illegible] তাহার ইয়ত্তা করিতে সক্ষম হইবেন? তাহারা সম্পূর্ণ অন্যায় ও বিদ্বেষ বুদ্ধিতে পরিচালিত [illegible] অকারণে মুসলমানদিগকে যবন, ম্লেচ্ছ, পাষণ্ড, পাতকী, পাপিষ্ঠ, পাপাত্মা, দুরাত্মা, [illegible], নরাধম, নরপিশাচ, বানর, নেড়ে, ধেড়ে, এঁড়ে, অজ্ঞান এবং অকৃতজ্ঞ ইত্যাদি অসংখ্য [illegible] আখ্যায় আখ্যায়িতপূর্ব, অসীম আনন্দ উপভোগ ও আত্মযোগ সমাধা করিয়া থাকেন, কিন্তু [illegible] কোন মুসলমান কবে তাহাদের তাদৃশ ভোগের বাধা জন্মাইয়া শফরীর ন্যায় ফর-ফর [illegible]? হিন্দু গ্রন্থকারগণ সম্পূর্ণ অলীক, আসার ও মিথ্যা কল্পনার আশ্রয়ে মুসলমান [illegible] যে সকল চূড়ান্ত পরিচয় প্রদান করিয়াছেন তাহা সমস্ত একত্রিত করিলে কয়েকখানি [illegible] গ্রন্থেও সঙ্কুলান হইবে না। আমরা সেইগুলির নিদর্শন স্বরূপ কয়েকটি কথা মাত্র এই [illegible] উদ্ধৃত করিতে বাধ্য হইয়াছি: আশা করি সুবিজ্ঞ পাঠকমণ্ডলী তাহাতেই জ্ঞান গর্বিত, [illegible], উদারমতি হিন্দু জাতির উদারতা ও ভদ্রাচারের বিশিষ্ট প্রমাণপ্রাপ্তে পরিতৃপ্ত হইবেন।

"হিন্দুর পরমারাধ্য ভঙ্গভাষা সৌন্দর্য সাধক, খ্যাতনামা সু-লেখক মৃত বাবু বঙ্কিমচন্দ্র [illegible] "কৃষ্ণকান্তের উইল" নামক পুস্তকে কল্পনা বলে তাহার ওস্তাদজী দানেস খাঁ দ্বারা [illegible] শুনাইয়াছেন। তাহার 'রাজসিংহে মহাত্মা আকবর বাদশাহকে একটি যুবতী দ্বারা ঝাড়ু পিটা [illegible] এবং ধর্মাত্মা আওরঙ্গের বাদশাহ মুখে কতিপয় কল্পিত সখী বা স্ত্রীলোকে দ্বারা লাথি [illegible] বন্দোবস্ত করিয়াছেন। "কবিতা পুস্তকে" মুসলমান জাতিকে লক্ষ্য করিয়া লিখিয়াছেন, [illegible] আসুক না আরবী বানর, আসে আসুক না পারশী পামর। আরবী ও পারশী মুসলমানেরা কি বাস্তবিক বানর ও পামর? লেখকের পূর্ব পুরুষগণ কি সেই বানর ও পামরদিগের দাসত্ব [illegible] কৃতার্থ ও গৌরবান্বিত হন নাই? সেই কথা কি এতই সহজেই তিনি ভুলিয়া গেলেন। "কবিতা সংগ্রহ" নামক পুস্তকে প্রাচীন কবি ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত মহাশয় লিখিয়াছেন, যথা ঃ

"বড় সব ধেড়ে দেড়ে ছাগল দেড়ে নেড়ে পানে রুকে, চোড়ে ঘাড়ে, কোলে দেয় হাড়ে হাড়ে [illegible]। পশ্চিমে মিয়া মোল্লা, কাচা খোল্লা: তোবা তাল্লা বোলে, কোলে পোড়ে তোপে উড়ে, যাবে [illegible] জ্বোলে, কেবল মর্‌জী তেড়া তেড়া কাজে ভেড়া নেড়া মাথা যত, নরাধম নীচ নাই নেড়াদের [illegible]।"

দামোদর মুখোপাধ্যায় বিদ্যানন্দ মহাশয় পবিত্র মুসলমান জাতিকে "দুরাত্মা দুরাচার, [illegible]হীন, দুস্য, দুর্দ্দান্ত, ম্লেচ্ছ" ইত্যাদি বিশেষণে বিশেষিত করিয়া তৃপ্ত হইয়াছেন। এহেন [illegible] সম্পন্ন মুসলিম বিদ্বেষীর প্রতাপসিংহ উপন্যাস পাঠ করলে চিন্তাধারার আভাস পাওয়া

যাইবে। বাবু যজ্ঞেশ্বর মুখোপাধ্যায় মহাশয়, টড্ সাহেবের রাজস্থানের অনুবাদে মুসলমানকে প্রাণ খুলিয়া গালি দিয়া শান্তি পান নই। তৎপ্রণীত বঙ্গানুবাদ রাজস্থান দেখুন। "জামাই বারিক" নামক পুস্তকে বাবু দীনবন্ধু মিত্র মহাশয় মুসলমান ধর্ম, সমাজ, মোল্লা, পীর, এমন কি মুসলমান মহিলাদিগের প্রতি কিরূপ জঘণ্য ভাষা ব্যবহার ও নিচে জন্মোচিত বিদ্রূপ ঠাট্টা করিয়াছেন তাহাও একবার দেখুন,

"আল্লাহ আল্লাহ বলরে ভাই নবী কর সার। মাজা দুলায়ে চলে যাবা ভব নদী পার ॥ শুনরে ভাই বিবরণ, লবদ্বারে আছে জীবন, কখন যে পালাবে বলতে নাহি পারি ॥ কোরানেতে বয়েন আছে, দুনিয়াটা ক্যাবল মিছে, খোদার নাম বিনে জানবা সকলি ঝকমারি ॥ ধ্যানে বিকেলে দুপহরে গরু ছাগল সাথে করে, নামাজ পড়বা মনডা করে স্থির ॥ মানী লোকের রাখবা মান, গরীব লোককে করবা দান, দরগায় গিয়ে ফয়তা দিবা ক্ষির ॥ ঝুট বাতামে না দিবা দেল, সত্যসে বানাবা এক্কেল, ভক্তি ভাবে করবা পূজো বাপ মার চরণ। গোনা বরাবর নাইকো বিষ, ভজে দ্বিজ গোলাম নবীশ ॥ কত কীর্তি আছেরে ভাই কওয়া নাইকো যায় ॥ দেখ সাদীর সনে দোলার বিবি ডুলি চেপে যায় ॥ ওরে কদু কুমড়া বাকলে ফেলে তুচ্ছ নেবেল ব্যাল আজগবী দুনিয়ার খেলা সর্ষির মধ্যে ত্যাল ॥ মুসলমানের মোল্লারে হাদুর মধ্যে সাধু। কদু কুমড়া ছেড়ে দিয়ে আখের মধ্যে মধু। আসমানেতে ম্যাগের খেলা করে সিংহলাদ। রাত্রির বেলায় সূর্য উঠে দিনের বেলা চাঁদ ॥ রাত্রির বেলায় ভূতি ভয়ে ডরি ওঠে ছেলে। আর হুড়কো মেয়ে ঝমকে উঠে খসম কাছে এলে ॥ বিরহিনী বিবি আমার গো বাধে নাক চুল। কলজেতে ফুটছে বিবির পঞ্চবানের হুল ॥ সায়েরে গিয়েছে স্বামী হাবলী আঁধার করে। পরাণ জ্বলে গেল বিবির কোকিলের ঠোকরে ॥ মুখ ঘামছে বুক ঘামছে বিবির ভেসে যাচ্ছে হিয়ে। খসম যদি থাকত কাছে পুঁচতো নুমাল দিয়ে ॥ পিড়েয় বসে কাঁদছে বিবি ডুবি আখির জলে। মোল্লারে ধরেছে ঠেসে খসম খসম বলে ॥ ষাঁড়ের মাথায় সিং দিয়েছে, মানসের মাথায় কেশ। আল্লাহ বলরে ভাই পালা কল্লাম শেষ।"

প্রিয় পাঠক! পাচালীগুলি একটু ধীরভাবে আলোচনা করিলেই সভ্য, শিক্ষিত, জ্ঞানগর্বিত হিন্দু লেখকদিগের ন্যায় নিষ্ঠার জ্বলন্ত চিত্র দেখিতে পাইবেন। বিবি স্বামী বলিয়া মোল্লাকে ঠাসিয়া ধরিয়াছে, এরূপ জঘন্য ও পৈশাচিক আক্রমণ কি ক্ষমারযোগ্য? —হিন্দু ধর্মরহস্য ও দেবলীলা ভূমিকা দ্রষ্টব্য)

এ সমস্ত অতীত ইতিহাসই আমরা আলোচ্য গ্রন্থে সন্নিবেশিত করেছি। বর্তমান ইতিহাস পাঠকদের ইতিহাস জানতে হলে অতীত ইতিহাসকে অবশ্যই জানতে হবে। আমরা যদি মুসলিমবিদ্বেষী রবীন্দ্র, বঙ্কিম, ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তসহ প্রাচীন-আধুনিক অন্যান্য কবি-সাহিত্যিক ও ঐতিহাসিকের সমালোচনার প্রতিবাদ করি, তখনই আমরা মৌলবাদী নামে আখ্যায়িত হই। মৌলবাদের সংজ্ঞা কি তারা এর মর্মার্থ না বুঝেই এক বকরীর তিন বাচ্চা, "দু'টি দুধ খায় একটি দেখে লাফায়" সে অবস্থার মত এদেরও অবস্থা। মুসলমানের সন্তানেরা ধর্মনিরপেক্ষ মতবাদে বিশ্বাসী এবং এটা যে একটা কুফুরী মতবাদ সে কথাটা ইতিপূর্বে পাশ্চাত্য পণ্ডিতদের শিখানো বুলি থেকে তারা দীক্ষা নিয়েছেন—এ সম্পর্কে কিছু আভাস দেয়া হয়েছে এবং বলা হয়েছে, এগুলো আমাদের চিন্তা-চেতনার ক্ষেত্রে ইতিহাস সচেতনতারই অভাব। এজন্যই এরা মুসলমানের ঘরে জন্ম নিয়ে মুসলমানের সমালোচনায় প্রবৃত্ত হতে দ্বিধাবোধ করে না। আল্লামা গোলাম আহমাদ মোর্তোজা সাহেব সেসব অতীত ইতিহাসের কাহিনী নতুন করে বর্তমান প্রজন্মের কাছে উপস্থাপন করেছেন। আমরা তাঁর এহেন শ্রমলব্ধ কর্মের প্রতি মোবারকবাদ জানাই।

বিনীত

মোহাম্মদ শামসুজ্জামান

মুন্‌শী মোহাম্মদ মেহেরুল্লাহ রিসার্চ একাডেমী

১৮/০৮/০৫ ঢাকা।

জাতির মূল্যায়ন ও বিস্তার

সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি ম্যাজিক ও ভোজবাজির দ্বারা ফিরিয়ে আনা সম্ভব নয়। এও সম্ভব নয় যে জেলের ভয় ও বন্দুক দেখিয়ে সাম্প্রদায়িক মানুষকে সহজে অসাম্প্রদায়িক করে তোলা যাবে। যেখানেই সাম্প্রদায়িকতা আছে সেখানেই দুই সম্প্রদায় বা বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে অজ্ঞতা, ভুল বোঝাবুঝি,সত্য অসত্য,ক্ষোভ বিদ্বেষ, অহংকার ঔদ্ধত্য মিলিত হয়ে প্রতিদ্বন্দ্বিতা ও প্রতিহিংসা থেকে দেখা যায় দাঙ্গা,খুনোখুনি, অগ্নিসংযোগ ইত্যাদি। সুতরাং সাম্প্রদায়িকতা দূর করে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি ফিরিয়ে আনতে এইসব সমস্যার সমাধান করা দরকার। শুধুমাত্র প্রশাসনের চাপ অথবা কাগুজে আইনের ভয় দেখিয়ে তা সম্ভব নয়।

ভারতে মুসলমান সম্প্রদায় অনেকের মতে একটি সংখ্যালঘু সম্প্রদায়। যে কোন দেশে সংখ্যালঘু দুর্বলতর সম্প্রদায় ও গোষ্ঠীর উপর যদি সবলতর শক্তিশালী গোষ্ঠী অত্যাচার চালায় তাহলে সেটা আদৌ বাহাদুরি নয়, বরং তা চরম পর্যায়ের কাপুরুষতা। দৃষ্টান্ত দিয়ে বলা যায়, পাকিস্তানের মুসলিমরা যদি সেখানকার সংখ্যালঘু খৃষ্টান, ইহুদি, হিন্দু প্রভৃতি দুর্বলতর সমাজের উপর আঘাত হানে তাহলে সেটা বীরত্ব নয়, তা হবে কাপুরুষতা বা পশুত্ব মাত্র।

আমাদের ভারতে সাঁওতাল, কোল, ভিল, মুন্ডা, ইহুদি ,পার্সি, খ্রীষ্টান, মুসলমান প্রভৃতি নানা জাতি বা গোষ্ঠী রয়েছে। এই সবগুলো কিন্তু সমমান বা সমপর্যায়ের নয়। যেমন সবগুলোই যে সারা পৃথিবীর সব রাষ্ট্রে ছড়িয়ে আছে তা নয়। আবার তাদের নিজস্ব রাষ্ট্র আছে তাও নয়। তাদের ভাষা রাষ্ট্রভাষা হিসাবে অনেক রাষ্ট্রে মর্যাদা পেয়েছে তাও নয়। যেমন ভারত সংলগ্ন নেপাল ছাড়া পৃথিবীতে কোন হিন্দু রাষ্ট্র নেই। ভারত ছাড়া হিন্দি কোথাও রাজভাষা নয়। এক দল গবেষকের মতে সংস্কৃত ভাষার বিশ্বে কোন অস্তিত্ব নেই। কেননা এমন একটি পরিবারও নেই যে বাড়ির সদস্যরা সংস্কৃতে কথা বলেন। এ সম্বন্ধে যথেষ্ট আলোচনা 'বজ্রকলম'এর প্রথম খন্ডে হয়েছে এবং প্রমাণ দেওয়া হয়েছে যথেষ্ট পরিমাণে।

খ্রীষ্টান ধর্ম বহু দেশে প্রচলিত ও প্রতিষ্ঠিত। তাছাড়া পৃথিবীর বহু দেশে খ্রীষ্টান জাতি ক্ষুদ্র-বৃহৎ প্রতিষ্ঠা নিয়ে টিকে আছে। ইহুদি জাতিও অন্ততঃ একটা নিজস্ব রাষ্ট্র যেকোন রূপেই পেয়ে গেছে। সেখানে তাদের নিজস্ব সংস্কৃতি-সভ্যতা বিদ্যমান।

মুসলমান জাতি কিন্তু এক্ষেত্রে বিশেষভাবে নজর কাড়ে। আজকের হিসেবেও মুসলিম রাষ্ট্রগুলো সংখ্যায় নেহাত কম নয়। যেমন সৌদি আরব, সংযুক্ত আরব আমীরশাহী, কাতার, আফগানিস্তান, আলজিরিয়া, ইন্দোনেশিয়া, ইরান, ইরাক, ইয়েমেন, ইরিত্রিয়া, উজবেকিস্তান, উগান্ডা, ওমান, আলবেনিয়া, কাজাকাস্তান, কমোরস, কিরগিজিস্তান, ক্যামেরুন, কুয়েত, গিনিয়া, গাম্বিয়া, গ্যাবন, গিনিবিসাউ, জর্ডন, চাদ, তাজিকিস্তান, জিবুতি, তানজানিয়া, তুরস্ক, তিউনিসিয়া, তুর্কমেনিস্তান, নাইজেরিয়া, পাকিস্তান, নাইজার, বসনিয়া, ব্রুনই, বাহরাইন, বাংলাদেশ, বুরকিনাফাসো, মরক্কো, মালদ্বীপ, মালয়েশিয়া, মালী, মৌরিতানিয়া, মিশর, লিবিয়া, লেবানন, সিরিয়া, সেনেগাল, সুদান, সোমালিয়া, আজারবাইজান প্রভৃতি ৫২টি মুসলিম রাষ্ট্র সগৌরবে দাঁড়িয়ে আছে মাথা উচুঁ করে। অজ্ঞতার কারণে আরবী ভাষাকে অখ্যাত বলে যাঁরা মনে করেন তাঁদের জানা দরকার যে, বর্তমানে একুশটি রাষ্ট্রের সরকারি ভাষাই হোল আরবী। এ সংখ্যা বেড়েই চলবে, কমে যাবার আশঙ্কা কম।

মুসলিম রাষ্ট্র নয়, এইরকম রাষ্ট্রেও স্থায়ী মুসলমান বাসিন্দা রয়েছেন। আজকের হিসাবে অস্ট্রেলিয়ায় অর্ধকোটিরও বেশি মুসলমান বাস করছেন। তাছাড়া নিউজিল্যান্ডে শতকরা ১জন, নরওয়েতে শতকরা ১০জন, নিউক্যালিডোনিয়াতেও ১০জন, সলোমন দ্বীপপুঞ্জে শতকরা ৪০জন, ফিজিতে শতকরা ৩৫জন, পাপুয়ায় শতকরা ৯০জন আর নিউগিনিতে শতকরা ৯৫ জন মুসলমান রয়েছেন।

উত্তর আমেরিকার কোস্টারিকা, জামাইকা, কানাডা, আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র এবং মেক্সিকোতে মুসলমান বাসিন্দা আছেন প্রায় এক কোটির উপর। দক্ষিণ আমেরিকার আর্জেন্টিনা, ব্রাজিল, ত্রিনিদাদ, গিয়েনা, সুরিনাম, ভেনেজুয়েলা এবং কলম্বিয়ায় মোট মুসলিম বাস করছেন প্রায় ৩০ লক্ষ।

আফ্রিকার সোয়াজিল্যান্ড, সিসিলি, সাওস্টোমি ও প্রিন্সিপিতে মুসলমান রয়েছেন প্রায় একলক্ষ। মরিশাস, কঙ্গো, নামিবিয়া ও লিসোথোতে মুসলমান বাস করছেন প্রায় ৭লাখ। লাইবেরিয়া, জাম্বিয়া, জাইরি ও দক্ষিণ আফ্রিকায় মুসলমান বাস করছেন প্রায় ৩০ লাখ। রোয়ান্ডা, মাদাগাস্কার, বুরুন্ডি, টোগো এবং জিম্বাবোয়েতে এক কোটিরও বেশি মুসলমান বাস করছেন। আঙ্গোলা, বেনিন, মালাবি ও ঘানাতে বসবাস করছেন প্রায় এককোটি ষাট লক্ষ মুসলমান। মোজাম্বিক, শিরোলিয়ান, আইভরিকোস্ট ও কেনিয়াতে বাস করছেন প্রায় ২ কোটি ৭০ লাখ মুসলিম।

ইওরোপে দৃষ্টি দিলে দেখা যাচ্ছে ফ্রান্স, জার্মানী ও বুলগেরিয়ায় মুসলমান বাস করছেন প্রায় পঞ্চাশ লাখ। ফিনল্যান্ড, অষ্ট্রিয়া ও ডেনমার্কে মুসলমান বাস করছেন এক

লক্ষেরও বেশি। মাল্টা, স্পেন ও হল্যান্ডে বসবাস করছেন প্রায় ৬ লক্ষ মুসলমান। চেকোস্লোভাকিয়া, নেদারল্যান্ডস, বেলজিয়াম ও হাঙ্গেরিতে মুসলমান বাস করছেন প্রায় ৯ লক্ষ। নরওয়ে, গ্রীস, সাইপ্রাস ও রুমানিয়াতে দশ লক্ষেরও বেশি মুসলমান বাস করছেন। পোল্যান্ড, ইতালি ও বৃটেনে মুসলমান বাস করছেন যাঁরা তাঁরা সংখ্যায় ২২ লক্ষেরও বেশি।

এমনিভাবে এশিয়ায় তাকালেও দেখা যাচ্ছে, নেপালের মতো ছোট্ট দেশেও মুসলমান ৭ লক্ষ। কোরিয়া, সিঙ্গাপুর ও তাইওয়ানে প্রায় ২৮ লাখ মুসলিম বাস করেন। শ্রীলঙ্কাতে মুসলমান বাস করছেন প্রায় ১৫ লাখ। কাম্পুচিয়া, মায়ানমার, থাইল্যান্ড ও ভিয়েতনামে প্রায় ১ কোটি ৮৫ লাখ মুসলিম স্থায়ীভাবে বসবাস করছেন। ফিলিপাইনে বাস করছেন পৌনে এক কোটি মুসলিম। রাশিয়ায় মুসলমান বাসিন্দা রয়েছেন ৩ কোটি। চিনে মুসলমানের সংখ্যা ৮ কোটি, বেসরকারি মতে ভারতে মুসলমান বাস করছেন ২০ কোটিরও বেশি। [তথ্য : The Reader's Digest Great World Atlas London, The Muslim World, New Delhi, মুসলিম জাহান : অতীত ও বর্তমান, কলকাতা, ১৯৯৬]

ভারত এবং বহির্ভারতে ধর্মাচার

গোটা বিশ্ব জুড়ে এই বিশাল মুসলিম জাতির বিশ্বাস যে, কোরআন শরীফ আল্লাহর বাণী এবং হাদীস শরীফ তাদের শ্রেষ্ঠতম নবী হজরত মুহাম্মাদের (স) কোরআন কেন্দ্রিক উপদেশ। তাদের উপাস্য ও উপাসনা নিয়ে আলোচনা করলে দেখা যাবে খুবই ছোটখাটো বিষয়ে সামান্য ছিটেফোঁটা কিছু মতভেদ থাকলেও মৌলিক বিষয়ে প্রত্যেক দেশ-মহাদেশের মুসলমান একমত। যেমন মসজিদে নামাজের পূর্বে উচ্চ স্বরে আজান দেওয়া, মক্কার কাবা শরীফের দিকে মুখ করে নামাজ পড়া, নামাজের পূর্বে ওজু করা, ইমামের নেতৃত্বে নামাজ শেষ করা, মৃত্যু হলে স্নান করিয়ে কাফন পরিয়ে মাটিতে কবর দেওয়া, সন্তান ভূমিষ্ঠ হলে তার কানে আজানাদি পৌঁছে দেওয়া, পুত্রসন্তানের খত্না দেওয়া, চাঁদের হিসাবে রোজা শুরু করা এবং চাঁদ দেখে দুই ঈদ পালন করা। ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা সারা বিশ্বের এই কোটিকোটি মুসলমানের একই গন্ডির মধ্যে থাকাটা এক বিস্ময়কর ব্যাপার। এমনিভাবে আকিকা বা নামকরণের ব্যাপারেও সর্বজনীন প্রথা প্রচলিত। বিবাহ পদ্ধতি আলোচনা করলে দেখা যাবে যে, হজরত মুহাম্মাদের (স) সময় থেকে নিয়ম বেঁধে দেওয়া হয়েছে কাদের সঙ্গে বিবাহ বৈধ এবং কাদের সঙ্গে অবৈধ। দুজন সাক্ষী নির্ধারণ করে দেনমোহর ঠিক করে উভয়কে প্রস্তাব দেওয়া এবং তাদের স্বীকৃতি নেওয়ার নামই হোল ইসলামী বিবাহ।

মুসলমানদের পর্ব বলতে ঈদুল ফিতর এবং ঈদুল আজহা উল্লেখ করা হয়েছে। তাছাড়া সাপ্তাহিক জুমআর নামাজ ও রাতে দিনে পাঁচবার নামাজের প্রথাও একই ভাবে চলমান। সমাজে কে কতটা ধর্ম মানল বা মানল না সেটা স্বতন্ত্র ব্যাপার। কোন নেতা বা গোষ্ঠী মনে করেন না যে, ফরজ নামাজ পাঁচবারের পরিবর্তে চার বা সাতবার। কেউই মনে করেন না যে, রোজা ৩০ দিন নয়, বরং ২০ বা ৪০ দিন। পৃথিবীর কোন মুসলমানই মনে করেন না যে, তিনি তাঁর মৃত আত্মীয়কে কবরের পরিবর্তে দাহ করবেন।

খাদ্য হিসাবে আমিষ নিরামিষ দুইই মুসলিমদের কাছে বৈধ। আমিষ হিসাবে পৃথিবীর সমস্ত মুসলমান একই নিয়ম মেনে চলেন। অর্থাৎ হিংস্র পশু যেমন বাঘ, সিংহ, গন্ডার এবং হিংস্র পাখি যেমন চিল, শকুন, বাজ প্রভৃতি খাওয়া নিষিদ্ধ। গৃহপালিত পশুর মধ্যে নিষিদ্ধ মাংস হোল শুয়োর, কুকুর এবং বেড়াল প্রভৃতি। কেউ আজ পর্যন্ত এই গন্ডি ভাঙেন নি, ভাঙতে চেষ্টাও করেন নি শুধু নয়, ভাঙার প্রয়োজনই মনে করেন নি।

মুসলমান জাতিকে বাদ দিয়ে ভারতে হিন্দু জাতি বলতে যাঁদের বোঝায় তাঁদের কাজকর্ম খাদ্যাভ্যাস, উপাস্য ও উপাসনা পদ্ধতি, মৃতের সৎকার বা বিবাহ পদ্ধতি একসূত্রে বাঁধা নয়। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূতপূর্ব অধ্যাপক ডক্টর অতুল সুর (এম.এ., ফার্স্ট ক্লাস ফার্স্ট) লিখেছেন : "ঋগ্বেদের সপ্তম মন্ডলে (৭/২/৫) বর্ণিত 'সমন' উৎসবের অনুষ্ঠান থেকে সায়ন 'সমন' শব্দের যে ভাষ্য দিয়েছেন তা থেকে মনে হয় 'সমন' উৎসবটা অনেকটা আজকের দিনের অলিম্পিক উৎসবের মত।" এই উৎসবে, লেখক জানিয়েছেন, "যুবতী মেয়েরা মনোমত পতিলাভের আশায় সুসজ্জিতা হয়ে যোগদান করতো। এছাড়া বারাঙ্গনাগণও ধনলাভের আশায় সেখানে উপস্থিত থাকতো। সমস্ত রাত্রিব্যাপী এই উৎসব চলতো।" লেখক আরও লিখেছেন, "বৈদিক যুগের বিবাহ সম্বন্ধে আরও লক্ষ্য করার বিষয় এই যে, নবপরিণীতার বিবাহ কোন বিশেষ ব্যক্তির সঙ্গে হোত না, তার সমস্ত সহোদর ভ্রাতাদের সঙ্গেই হোত। অন্ততঃ আপস্তম্ভ ধর্মসূত্রের যুগ পর্যন্ত এই রীতি প্রচলিত ছিল। কেননা, আপস্তম্ভ ধর্মসূত্রে পরিষ্কার বলা হয়েছে যে, কন্যাকে দান করা হয় কোন এক বিশেষ ভ্রাতাকে নয়, বংশের সমস্ত ভ্রাতাকে।" [ভারতের বিবাহের ইতিহাস, পৃষ্ঠা ২২-২৩]

"ঋগ্বেদে এবং অথর্ব বেদে এমন কয়েকটি স্তোত্র আছে যা থেকে পরিষ্কার বোঝা যায় যে, যদিও বধূকে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাই বিবাহ করতো তাহলেও তার কনিষ্ঠ সহোদরগণেরও তার উপর যৌন মিলন বা রমণের অধিকার থাকতো। এই দুই গ্রন্থেই স্বামীর কনিষ্ঠ ভ্রাতাকে 'দেবৃ' বা দেবর বলা হয়েছে। এই শব্দদ্বয় থেকেও তা সূচিত হয়। কেননা 'দেবর' মানে দ্বিবর বা দ্বিতীয় বর।"

"বহুপত্নী গ্রহণও মহাভারতীয় যুগে বেশ ব্যাপকভাবে প্রচলিত ছিল। ... মহাভারতে একস্থলে উল্লিখিত হয়েছে যে, কৃষ্ণের ১০১৬ স্ত্রী ছিল। আবার অপর স্থলে বলা হয়েছে যে কৃষ্ণের ১৬০০০ স্ত্রী ছিল। মহাভারতে আরও উল্লিখিত হয়েছে যে, রাজা সোমকের একশত স্ত্রী ছিল। ...পান্ডব ভ্রাতাদের সঙ্গে দ্রৌপদীর বিবাহই একমাত্র বহুপতি গ্রহণের দৃষ্টান্ত নয়। কালান্তরে গৌতম বংশীয়া জটিলা সাতটি ঋষিকে একসঙ্গে বিবাহ করেছিলেন। আবার বার্ক্ষী নামে এক ঋষিকন্যা একসঙ্গে দশ ভাইকে বিবাহ করেছিলেন। ... দ্রৌপদীর বিবাহকালে ব্যাস বলেছিলেন, 'স্ত্রী লোকের পক্ষে বহুপতি গ্রহণই সনাতন ধর্ম।' ধর্মসূত্র সমূহেও এর উল্লেখ আছে।"

"বিবাহের পূর্বে মেয়েদের যৌনসংসর্গ মহাভারতের যুগে অনুমোদিত হোত। বোধহয় আগেকার যুগেও হোত। কেননা ছান্দোগ্য উপনিষদে আমরা দেখতে পাই যে, মহর্ষি সত্যকামের মাতা জবালা যৌবনে বহুচারিণী ছিলেন। ... কুন্তীও কুমারী অবস্থায় সূর্যের সঙ্গে মিলনের ফলে পুত্র কর্ণকে প্রসব করেছিলেন।"

ডঃ অতুল সুর লিখেছেন, "রামের বিবাহ যে ভগিনী সীতাদেবীর সঙ্গে হয়েছিল তা দশরথ জাতকেও উল্লিখিত হয়েছে। ... স্বামী যদি বিদ্যা অর্জনের জন্য দেশান্তরে যায় তাহলে স্ত্রী দশ বা বারো বৎসর পর্যন্ত অপেক্ষা করবে। যদি সেই স্ত্রী স্ববর্ণ কোন ব্যক্তি হতে পুত্র লাভ করে তাহলে তার অপবাদ বা দন্ড হবে না।" [দ্রষ্টব্য : ডঃ সুর : পূর্বোক্ত, পৃ. ৪৩]

"মেগাস্থিনিস তক্ষশীলায় যে প্রচলিত প্রথা থাকতে দেখেছিলেন তার উল্লেখ করা যেতে পারে। তিনি বলেছেন, যাঁরা দারিদ্রের জন্য কন্যাকে সুপাত্রে দিতে পারেন না, তাঁরা যুবতী কন্যাদের হাটে নিয়ে গিয়ে ঢাকঢোল বাজিয়ে জনতার সমাবেশ করান। যখন মধ্য থেকে কেহ বিবাহ ইচ্ছুক হয়ে এগিয়ে আসে, তখন কন্যাকে সম্পূর্ণ অনাবৃত করে তাকে নিরীক্ষণ করতে দেওয়া হয়। প্রথমে সে কন্যার পশ্চাৎভাগ নিরীক্ষণ করে, পরে নিরীক্ষণ করে তার সম্মুখভাগ। যদি কন্যাকে তার পছন্দ হয় তাহলে উপযুক্ত পণ দিয়ে সে তাকে নিয়ে যায় এবং স্বামী-স্ত্রী রূপে বসবাস করে।"

শাস্ত্রকাররা বলে গেছেন যে; বালিকাদের ঋতুস্রাব হবার পূর্বে বিয়ে দিতেই হবে। ডক্টর সুর লিখেছেন, "কুমারী অবস্থায় কন্যা যতবার রজঃস্বলা হবে ততবার তার পিতামাতা ও অভিভাবকদের ভ্রূণ হত্যার পাপে লিপ্ত হতে হবে।" [দ্রষ্টব্য : ঐ, পৃ. ৪৬]

অধ্যাপক সুর আরো লিখেছেন, "নরক থেকে পূর্বপুরুষদের উদ্ধার করার জন্য পুত্র উৎপাদনের প্রয়োজনীয়তার উপর স্মৃতিকাররা বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছেন। এই কারণে বিবাহিত জীবনে যদি সন্তান উৎপন্ন না হয়, কি নিঃসন্তান অবস্থায় যদি কেহ মারা যায়, তাহলে তার স্ত্রী বা বিধবার 'ক্ষেত্রে' অপরের দ্বারা সন্তান উৎপাদনের বিধান স্মৃতিকাররা দিয়েছেন। এই ব্যবস্থাকে 'নিয়োগ' প্রথা বলা হোত। 'নিয়োগ' আর কিছুই নয়, স্বামীর পরিবর্তে কোন নিযুক্ত ব্যক্তিকে উৎপাদকরূপে গ্রহণ করা।... 'নিয়োগ' প্রথানুযায়ী মাত্র এক বা দুটি সন্তান পর্যন্ত উৎপন্ন করা যেত, তার অধিক নয়। মনু এবং গৌতম মাত্র দুটি সন্তান উৎপাদনেরই অনুমতি দিয়েছেন।"

লেখক আরো লিখেছেন, "সন্তান প্রজননের জন্য স্বামী কর্তৃক স্ত্রীকে অপরের হস্তে সমর্পণ করা কলিযুগে নিষিদ্ধ হয়েছে।" ডঃ সুর লিখেছেন, "বৌধায়ন ও মনু উভয়েই ব্যভিচারীর জন্য মৃত্যুদন্ড ব্যবস্থা করলেন। আপস্তম্ভ বললেন যে, ব্যভিচার অপরাধে অভিযুক্ত ব্যক্তিকে পুরুষাঙ্গ ও অন্ডকোষ কর্তন করে শাস্তি দেওয়া হবে এবং যদি সে কোন অনূঢ়া কন্যার সঙ্গে ব্যভিচার করে থাকে তাহলে তার সমস্ত সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করা হবে এবং তাকে দেশ থেকে বহিষ্কৃত করে দেওয়া হবে।... ব্যভিচারীর শাস্তিস্বরূপ নারদ

যে দন্ডবিধান করেছেন তা হচ্ছে, ১০০ পণ অর্থদন্ড, সমস্ত সম্পত্তি বাজেয়াপ্তকরণ, পুরুষাঙ্গ ছেদন ও মৃত্যু।"

গৃহকর্ত্রী উল্লেখযোগ্য অতিথির কাছে নিজেকে নিবেদন করে তাঁকে সঙ্গ দিতে পারেন। লেখক ডঃ অতুল সুর উদাহরণ দিয়ে সুদর্শনের জন্য লিখেছেন, "স্ত্রী ওঘাবতীকে অতিথি সৎকারের কাজে নিয়োজিত করে তিনি তাকে আদেশ দেন যে, প্রয়োজন হলে ওঘাবতী যেন নির্বিচারে নিজেকেও অতিথির কাছে সমর্পণ করে। কেননা, অতিথি অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি আর কেউ নেই।"

এখানে সবচেয়ে লক্ষণীয় বিষয় হল, বিবাহ এবং ব্যভিচারের মধ্যে পার্থক্য নির্ধারণ করা যাচ্ছে না; সব যেন একাকার হয়ে গেছে। মুসলমানদের বিবাহের ক্ষেত্রে কিন্তু সারা বিশ্বে একাধিক বা বহু পদ্ধতি অবলম্বন করা হয় নি বা হচ্ছে না। কিন্তু হিন্দুদের ক্ষেত্রে ভারতে এমন গোষ্ঠী আছেন যাঁরা সাত দেবদেবীর পূজক, তাঁরা কখনোই তাঁদের মতো সাত দেবদেবীর পূজকদের ঘরে তাঁদের ছেলেমেয়ের বিয়ে দেন না। ছয় বা আট দেবদেবীর পূজকদের ঘরে তাঁরা সম্বন্ধ পাতান।

বারোদার রাজপুত ও লেওয়াকুম্বীরাদের মধ্যে নিজের গ্রামে বিয়ে করা নিষিদ্ধ। উত্তরপ্রদেশের ভান্টুদের মধ্যে বিবাহের জন্য মাতামহীর কুলের দুই পুরুষ বর্জন করার বিধি বিদ্যমান। মধ্যপ্রদেশে একটি সম্প্রদায়ে মাতৃকুলের দুই পুরুষ বর্জন করার রীতিও চালু রয়েছে। মানভূমে শগরখড়িয়া ও পাহাড়িয়াখড়িয়া সম্প্রদায়ের মধ্যে বিবাহ বৈধ নয়, যদিও তারা প্রায় একই গোত্রের।

পশ্চিমবঙ্গ ও পূর্ববঙ্গে সহোদরা, পিসতুতো ও মাসতুতো বোনকে বিয়ে করা অকল্পনীয় অর্থাৎ নিষিদ্ধ। কিন্তু অন্ধ্রপ্রদেশে মামাতো ও পিসতুতো বোনকে বিয়ে করাই প্রচলিত ও বৈধ রীতি। আবার তাদের খুড়তুতো জেঠতুতো বোনকে বিয়ে করা অবৈধ। মান্ডালা ও বালাঘাট অঞ্চলে পিসতুতো বোনকে বিয়ে করার প্রচলন আছে, মামাতো বোনকে মোটেই নয়। মুরিয়া হিন্দুদের মধ্যে পিসতুতো ও মামাতো উভয় বোনকেই বিয়ে করার রীতি আজও বিদ্যমান। মাদুরার হিন্দুদের মধ্যে মামাতো বোনের সঙ্গে বিয়ে হয়, কিন্তু পিসতুতো বোনের সঙ্গে নয়। কিন্তু কোচিন এবং ত্রিবাঙ্কুরে পিসতুতো বোনের সঙ্গে বিয়ে বৈধ হিসাবে প্রচলিত।

নীলগিরি পাহাড় অঞ্চলে একাধিক স্বামীর সঙ্গে বিবাহ বৈধ রয়েছে। ত্রিবাঙ্কুরের মুথুবন, মল-পুলায়ন ও মল-আরয়নদের মধ্যেও বহুপতিকে বিয়ে করার নিয়ম বহুদিন ধরে চলে এসেছে। হিমাচল সীমান্ত প্রদেশের মধ্যেও বহুপতি গ্রহণ করার নিয়ম আজও অব্যাহত। টোডা সম্প্রদায়ের একজন মহিলা বহুপতি গ্রহণ করতে পারে। সেই মহিলা গর্ভবতী হলে গর্ভের সপ্তম মাসে স্বামীদের মধ্যে ধনুর্বাণ অনুষ্ঠান করে সেই গর্ভস্থ সন্তানের

পিতা নির্ধারিত হয়। কাশ্মীরের লাদাখ উপত্যকার হিন্দু মেয়েরা বহুপতি গ্রহণ করেন— "তাদের মধ্যে প্রচলিত রীতি অনুযায়ী সাধারণতঃ জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাই বিবাহ করে, কিন্তু সেই বিবাহিতা স্ত্রী কনিষ্ঠ ভ্রাতাদেরও স্ত্রীরূপে পরিগণিত হয়।" [দ্রষ্টব্য : ভারতের নৃতাত্ত্বিক পরিচয়, ডক্টর অতুল সুর, পৃষ্ঠা ১১৭]

ভারতের উত্তর-পূর্ব সীমান্ত অঞ্চলে বহুপতি গ্রহণ করার প্রচলন রয়েছে। হিমালয়ের পাদদেশে যৌনসর বেওয়া অঞ্চলেও বহুস্বামী গ্রহণের নিয়ম প্রচলিত। উত্তর ভারতে কেরালার নায়ারদের মহিলাদের একসঙ্গে বহুপতি গ্রহণ করার নিয়ম আছে। কেরালার স্বর্ণকার আশরী জাতির মধ্যে ভ্রাতৃত্বমূলক বহুপতি গ্রহণ করার নিয়ম আজও অব্যাহত।

মধ্যপ্রদেশের বেশ কিছু জায়গায় মেয়েদের বিয়ের বয়স হচ্ছে ১৫ থেকে ৪০। ত্রিবাঙ্কুরে একটি সম্প্রদায়ে ১৫ বছরের পূর্বে কখনো বিয়ে হয় না। কাশ্মীরের লাদাখ উপত্যকার মহিলারা যেকোন সময় স্বামীকে পরিত্যাগ করতে পারে। সেটাই বিবাহ বিচ্ছেদ বলে গণ্য করা হয়। উড়িষ্যা পরোজাদের মধ্যে বিধবাকে বাধ্যতামূলকভাবে দেবরকে বিয়ে করতেই হয়। সেই বিধবা দেবরকে বিয়ে করতে অস্বীকৃত হলে অর্থদন্ড আদায় করে দেবরকে দেওয়া হয়। ত্রিবাঙ্কুরের আর একটি হিন্দু সম্প্রদায়ে জ্যেষ্ঠভ্রাতার পক্ষে কনিষ্ঠ ভ্রাতার বিধবা পত্নীকে বিবাহ করা বৈধ। আসামের একটি সম্প্রদায়ে জামাতা কর্তৃক বিধবা শাশুড়িকে বিবাহ করার রীতি প্রচলিত। আসামের আর একটি সম্প্রদায় তাদের পিতার মৃত্যুর পর সন্তান বিধবা বিমাতাকে স্ত্রীরূপে গ্রহণ করে। গঞ্জাম ও কোরাপুট জেলার একটি সম্প্রদায়ে বিধবা খুড়ী বা কাকীকে বিয়ে করার নিয়ম বৈধ। মধ্যপ্রদেশের একটি সম্প্রদায়ের মধ্যে বিধবার যদি অনেকগুলি ছেলেমেয়ে থাকে তাহলে সে বিবাহ না করে অপর পুরুষের সঙ্গে যথেচ্ছ যৌন সঙ্গমে প্রবৃত্ত হতে পারে। উত্তর ভারতের হিন্দু সমাজে স্বগোত্রে কখনো বিবাহ হয় না। তামিলনাড়ুর ব্রাহ্মণদের মধ্যেও ঐ প্রথা প্রচলিত। কিন্তু পশ্চিম ভারতের মারাঠারা ও দক্ষিণ ভারতের হিন্দু সমাজভুক্ত কোন জাতি ঐ বিধি অনুসরণ করে না।

স্বপিন্ডবিধি বিশেষভাবে প্রচলিত আছে উত্তরভারতে। এই বিধান অনুযায়ী স্বপিন্ডদের মধ্যে কখনো বিবাহ হয় না। স্বপিন্ড বলতে ঊর্ধতন ছয় পুরুষ এবং স্বয়ং— এই সাতপুরুষ। কিংবা পুত্র থেকে অধঃস্তন ছয়পুরুষ এবং স্বয়ং— এই সাতপুরুষ বোঝায়। [মনু ৫/৬০]

"অঙ্ক কষে দেখা গেছে যে, এই নিয়ম অনুসরণ করতে গেলে অগণিত সম্ভাব্য জ্ঞাতির সঙ্গে বিবাহ পরিহার করতে হয়। এজন্য বর্তমানে স্বপিন্ডবিধিকে সংক্ষেপ করে [সাতপুরুষের পরিবর্তে] তিন পুরুষে দাঁড় করানো হয়েছে।" [ঐ, ডঃ সুর, পৃঃ ১২২]

"কৌলিন্য প্রথা বিশেষভাবে প্রচলিত ছিল বাংলাদেশ ও মিথিলায়। ... বাংলাদেশের ব্রাহ্মণদের মধ্যে এই প্রথানুযায়ী কুলীন গোষ্ঠীভুক্ত মেয়ের বিবাহ কুলীন গোষ্ঠীতে দেওয়া একান্ত বাধ্যতামূলক ছিল। হীনতর মর্যাদাবিশিষ্ট গোষ্ঠীতে দিতে পারা যেত না। দিলে তাকে 'পতিত' হতে হোত। ... অনেক সময় বৃদ্ধ বয়স পর্যন্ত কুলীন কন্যার বিবাহ হত না। এই কারণে কোন কোন স্থানে কৌলিন্য কলুষিত সমাজে শিশু কন্যা হত্যার প্রচলন ছিল। আবার কোন কোন স্থলে কুলীন ব্রাহ্মণদের মধ্যে পাইকারি হারে বহু বিবাহ দ্বারা কৌলিন্যের কঠোর বিধান এড়ানো যেত। ... হিন্দু সমাজে সাধারণতঃ পাত্র অপেক্ষা পাত্রীর বয়স কম হয়। কিন্তু পশ্চিম বা দক্ষিণভারতে এই নিয়ম সবসময় পালিত হয় না। ... এরূপ ক্ষেত্রে বয়সের তারতম্যের দরুণ অসামঞ্জস্য দূর করবার জন্য ছেলের সঙ্গে মেয়ের বয়সের যত বছরের তফাত, মেয়ের বিয়ের সময় তার কোমরে তত সংখ্যক নারিকেল বেঁধে দেওয়া হয়।" [পৃ. ১২৪]

দক্ষিণভারতে বহু হিন্দুর মামা-ভাগ্নীর মধ্যে বিবাহ হয়। সেই বিয়েকে বলা হয় 'বাঞ্ছনীয় বিবাহ'। সিকিমে হিন্দুদের একটি সম্প্রদায়ে মাতৃকুলে বিবাহ হয়, কিন্তু পিতৃকুলে কখনো সম্ভব নয়। [পৃ.১২৫]

এলোমেলো এইসব নিয়ম কানুন ভেঙে চুরমার করার জন্য ১৯৫৫ সালে হিন্দু বিবাহ আইন পাস হয়। যাতে 'এক পত্নীত্বই একমাত্র আইনসিদ্ধ বিবাহ বলে পরিগণিত হয়েছে'।

"স্বামীর মৃত্যুর পর জীবন্ত স্ত্রীকে (অধিকাংশ ক্ষেত্রে বলপূর্বক বা মাদকদ্রব্য প্রয়োগের প্রভাবে) স্বামীর জ্বলন্ত চিতায় আহুতি দেওয়া হোত।" ১৮২৯ সালে রামমোহনের সময়ে উইলিয়াম বেন্টিঙ্ক আইন করে এটা বন্ধ করে দেন। বালিকা, কিশোরী ও যুবতীরা বিধবা হলে তাদের উপর কঠোর সংযমের বোঝা চাপিয়ে দেওয়া হোত, যা বহন করতে তারা অপারগ হোত—"এর ফলে সমাজে নানারূপ দুর্নীতি প্রবেশ করেছিল।" এর বিজ্ঞানসম্মত আলোচনা প্রথম খণ্ডে করা হয়েছে। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর "একাই রক্ষনশীল সমাজের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে, তৎকালীন সরকারকে ১৮৫৬ সালের ১৫ নম্বর আইন বিধিবদ্ধ করতে প্রবুদ্ধ করলেন। এই আইন দ্বারা বিধবার বিবাহ বৈধ করা হোল।" অর্থাৎ যেটা হোল উনিশ শতকে, হজরত মুহাম্মাদ (স) সেটা করতে পেরেছেন ছয় শতকে, অর্থাৎ তেরশো বছর আগে।

"১৮৭২ সালের ৩ নম্বর আইন দ্বারা সবর্ণে বিবাহের বাধাও দূর করা হোল। তবে এই আইন অনুযায়ী বিবাহ করতে হলে, বিবাহেচ্ছু উভয় পক্ষকেই শপথ গ্রহণ করতে হোত যে, তারা হিন্দু নয়।" ফলে প্রেম প্রণয় রক্ষা করতে গিয়ে অনেকে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করছিল। সুতরাং আবার এক নতুন আইন তৈরি হোল— "কিন্তু ১৯২৩ সালের ৩০ নম্বর আইন দ্বারা বিধান দেওয়া হোল যে, অহিন্দু বলে ঘোষণা না করেও অসবর্ণ বিবাহ করতে পারা যাবে।" [পৃ. ১৩১]

কিন্তু ইসলাম ধর্মে, সারা বিশ্বের প্রত্যেক নারী পুরুষ বয়সে ছোট বড় যাই হোক একে অপরকে বিয়ে করতে পারে; শুধুমাত্র কোরআন ও হাদীস অনুযায়ী নিষিদ্ধ ব্যক্তি ছাড়া। যেমন কোন মুসলিম বিয়ে করতে পারেন না আপন মা, বোন, বৈমাত্রেয় বোন, আপন মাসী-পিসী, পিতামহী, মাতামহী, শাশুড়ী এবং তার ঊর্ধ্বতন মহিলাগণকে। তাছাড়া আপন ভাগ্নী-ভাইঝি, বিধবা পুত্রবধূ, কন্যা, স্ত্রীর অপরপক্ষ বা পূর্বপক্ষের কন্যা, একসঙ্গে দুইবোন এবং দুধবোন প্রভৃতিকেও বিয়ে করা নিষিদ্ধ। বিশ্বের প্রত্যেকটি দেশের প্রত্যেকটি মুসলিম আজও এটা সহজভাবে মেনে আসছেন।

ভগবান মনুর বিধান ছিল বিবাহের জন্য মেয়ের বয়স হবে ৮ আর ছেলের হবে ২৪। কিন্তু ইসলামী বিধান হোল, নাবালক এবং নাবালিকার বিয়ে তাদের পিতামাতা বা অভিভাবকরা দিতে পারেন। কিন্তু কন্যা বা পুত্র প্রাপ্তবয়স্ক হবার পর তারা ওটা মানতেও পারে আবার অমান্য করতেও পারে। সেটা তাদের ব্যক্তি স্বাধীনতার বিষয়।

১৯৪৯ সালের ২১ নম্বর আইন দ্বারা বিবাহ ক্ষেত্রে জাতিগত বর্ণগত শ্রেণীগত ও সম্প্রদায়গত যতরকম বাধাবৈষম্য ছিল তা দূর করা হোল; ইসলামে যেটা হজরত মুহাম্মাদ (স) ৬০০ খৃষ্টাব্দের পরেই করে দিয়ে গেছেন। "বলাবাহুল্য, গত দেড়শ বৎসর যাবৎ সরকার চেষ্টা করেছেন আইন প্রণয়ন দ্বারা হিন্দু বিবাহকে নূতন মর্যাদা দিয়ে বিবাহিতা নারীর স্বার্থরক্ষার জন্য। কিন্তু দুঃখের বিষয়, বিবাহিতা হিন্দু নারী আজও সামাজিক বা পারিবারিক নিষ্ঠুরতা ও অবিচারের হাত থেকে নিষ্কৃতি লাভ করতে পারে নি। সংবাদপত্রে প্রত্যহ বধূ নিধনের যে সকল সংবাদ বেরুচ্ছে, তা থেকে প্রমাণ হয় যে, সমাজ থেকে পণপ্রথা ঘটিত পাপ অত্যাচার ও নিষ্ঠুরতা এখনও দূরীভূত হয় নি। আজও মেয়েরা পণের বলি হয়ে রয়েছে। তাছাড়া, মধ্যযুগের বর্বর 'সতী' প্রথাকে আবার জাগিয়ে তোলা হচ্ছে।" [ডঃ অতুল সুরের ঐ বই, পৃ. ১৩৫]

ইসলাম ধর্মে বৎসরের যে কোন দিন বা রাত্রিতে বিবাহ বৈধ। কিন্তু হিন্দুদের ক্ষেত্রে তা সম্ভব নয়। আবার হিন্দু ধর্মীয় এই আইন হিন্দু ধর্মাবলম্বী ছেলে মেয়েরা মেনে নিতে পারছেন না। লাভ ম্যারেজ বা প্রয়োজনীয় আকস্মিক বিবাহের ক্ষেত্রে লগ্ন উপেক্ষা করে বিয়ে রেজিস্ট্রেশন করিয়ে নেন তাঁরা। বঙ্গদেশে বিবাহ হয় বৈশাখ, জৈষ্ঠ, আষাঢ়, শ্রাবণ, অগ্রহায়ণ, মাঘ ও ফাল্গুন মাসে। বাকী পাঁচ মাসে বিবাহ নিষিদ্ধ। আবার কোন কোন প্রদেশে প্রত্যেক বছর বিবাহ হয় না। নয়, দশ বা এগারো বছর অন্তর কোন্ বছরে বিয়ে হবে তা ঠিক করে দেন জ্যোতিষীরা। বরোদা ও মধ্যপ্রদেশে একাধিক সম্প্রদায়ের বিবাহ শুধুমাত্র নির্দিষ্ট বৎসরের নির্দিষ্ট দিনে হয়। এখানেও জ্যোতিষীরা নয় দশ বা এগারো বছর অন্তর বিবাহের বছর নির্দিষ্ট করেন। এরূপভাবে দীর্ঘকাল অন্তর বিবাহের দিন নির্দিষ্ট হয় বলে সকল পরিবারই মেয়ের বয়স নির্বিশেষে পরিবারের সকল অবিবাহিতা

মেয়েদের ঐ নির্দিষ্ট দিনে পাত্রস্থ করে। এমনকি গর্ভস্থ মেয়েরও বিয়ে দেওয়া হয়। যদি গর্ভস্থ সন্তান মেয়ে হয় তাহলে বিয়ে বৈধ হোল, আর ছেলে হলে বিয়ে বাতিল হয় স্বাভাবিকভাবেই। আবার বিয়ের বছরের ঐ নির্দিষ্ট দিনে যদি পাত্র না পাওয়া যায় তাহলে ঐ কুমারীর বিয়ে একগুচ্ছ ফুলের সঙ্গে দেওয়া হয়। পরে পাত্র পাওয়া গেলে ঐ ফুলের গুচ্ছটিকে কোন কুয়োর মধ্যে ফেলে দেওয়া হয় এবং সেই পাত্রের সঙ্গে তার বিবাহ দেওয়া হয়। [পৃ. ১৩৬]

বরোদার একটি হিন্দু সম্প্রদায়ের বিবাহের নির্দিষ্ট দিন ১২, ১৫ বা ২৪ বছরের ব্যবধানে ঠিক করা হয়। মধ্যপ্রদেশের আগারিয়া হিন্দুদের পাঁচ-ছয় বছর অন্তর বিয়ের দিন ঠিক করা হয়। ঐ দিনে পরিবারের সব ছেলেমেয়ের বিয়ে দিয়ে দেওয়া হয়। মাদ্রাজের চেট্টি হিন্দুদের বিবাহের দিন ১০ বা ১৫ বছর অন্তর ঠিক হয়। গঙ্গা ও গোদাবরীর অন্তর্বর্তী ভূভাগে ১২ বছর অন্তর সিংহ রাশিতে যখন বৃহস্পতির সংক্রমণ হয় তখন বিবাহ ও অন্যান্য ধর্মকর্ম বন্ধ রাখা বাধ্যতামূলক।

পাঞ্জাবের বিবাহ অনুষ্ঠানগুলোর মধ্যে 'ফেরে' বা যজ্ঞকুন্ড প্রদক্ষিণ করার নিয়ম আছে। কিন্তু উত্তর প্রদেশের বহু জায়গায় ঐ নিয়ম নেই। সেখানে একটি মন্ডপ নির্মিত হয় ও স্থাপিত হয় একটি দন্ড— সেটাকেই প্রদক্ষিণ করা হয়।

বাংলা বিহার ও উড়িষ্যায় কন্যার সিঁথিতে 'সিঁদুরদান' বাধ্যতামূলক প্রথা। আবার অনেক জায়গায় কাঁটার সাহায্যে আঙ্গুল থেকে রক্ত বের করে পাত্রপাত্রী একে অপরকে মাখিয়ে দেয়। মহারাষ্ট্রে প্রদক্ষিণ প্রথা প্রচলিত। আর ঐ মহারাষ্ট্রেই আর একটি শ্রেণী বরকনের উপর চাল জল ও দুধ ছিটিয়ে দেয়। আবার দক্ষিণ ভারতের বেশির ভাগ ক্ষেত্রে 'তালিবন্ধন' প্রথা বিবাহের অপরিহার্য অঙ্গ।

বঙ্গদেশে বিবাহ হয় রাত্রে। আবার তামিলনাড়ুতে বিবাহ হয় মধ্যাহ্নের পূর্বেই। দক্ষিণ ভারতের সর্বত্রই বিবাহ অনুষ্ঠানের মূল হোল তালিবন্ধন, আমাদের দেশে সিঁদুরদান, কোন কোন স্থানে 'জোয়াল পূজা'; অর্থাৎ বর ও কনের কাঁধের উপর জোয়াল চাপিয়ে বুঝিয়ে দেওয়া হয় যে, পাত্রপাত্রী 'জোয়ালগ্রথিত বলদের ন্যায়' যুক্তভাবে সুখদুঃখের সমান অংশীদার। মহারাষ্ট্র ও গুজরাটে বিবাহ একদিনেই শেষ হয়ে যায়। হরিয়ানায় কিন্তু দুদিন লাগে বিয়ে হতে। [পৃ. ১৩৭-৩৮]

প্রত্যেক মুসলিমের মসজিদে প্রবেশের সমান অধিকার। যে কোন পংক্তিতে বা সারিতে তিনি দাঁড়াতে পারেন। ছোটলোক ভদ্রলোকের এই ব্যবধান সেখানে অনুপস্থিত। কিন্তু হিন্দু সম্প্রদায়ের জাতিভেদ প্রথা সম্বন্ধে ডক্টর সুর লিখেছেন, "এমনকি ব্রাহ্মণেরা নিজেদের মধ্যে শুচিতা রক্ষার জন্য বাতিকগ্রস্ত হয়ে উঠল। এ সম্বন্ধে উত্তরপ্রদেশে প্রচলিত এক প্রবচন যথেষ্ট আলোকপাত করে। প্রবচনটা হচ্ছে— 'তিন কনৌজিয়া

তেরহ চুলি'। তার মানে, তিন কনৌজ ব্রাহ্মণ যদি একত্রিত হয় তাহলে তাদের শুচিতা রক্ষার জন্য তেরটা রন্ধনশালার প্রয়োজন হয়।" [পৃ. ১৭৫]

"হিন্দু সমাজে আমিষ ভোজন বিষয়ে ভবদেব ভট্টই প্রথম বিধান দিলেন। তার আগে বাঙালী ব্রাহ্মণ আমিষ ভোজনের জন্য উত্তর ভারতের ব্রাহ্মণদের কাছে হেয় ছিল। ভবদেব ভট্ট বাঙালী ব্রাহ্মণের আমিষ ভোজনের বিধান দিলেও সেদ্ধ চাউল ও মুসুরির ডাল খাওয়ার অনুমতি দিলেন না। বাঙালী ব্রাহ্মণকে এই অনুমতি দিলেন পরবর্তী বিধানদাতা রঘুনন্দন। এরপর ব্রাহ্মণরা বিদেশি তরকারিও (আলু, কপি, টমেটো ইত্যাদি) খেতে আরম্ভ করল। উত্তর ভারতের ব্রাহ্মণরা কিছুদিন তাদের গোঁড়ামি বজায় রাখল বটে, কিন্তু পরে তারাও এসব খেতে লাগল।" [পৃ. ১৭৮]

"মধ্যপ্রদেশে গোন্ড ও উড়িষ্যার কন্দ জাতির মধ্যেও আগুন জ্বেলে ধর্মানুষ্ঠান করতে দেখি এবং সেই আগুনের মধ্যে তারা জীবন্ত পশু নিক্ষেপ করে আহুতি দেয়। এইভাবে তারা নরমেধ যজ্ঞও করত।... মনে হয় পরবর্তীকালে হিন্দু ধর্মে যে সকল বৈশিষ্ট্য প্রকাশ পেয়েছিল সেগুলি নবোপলীয়-তাম্রাশ্ম যুগের সন্ধিক্ষণেই দানা বাঁধতে শুরু করেছিল।" [পৃ. ২১৬-২১৭]

প্রথমখন্ডে আলোচনা করা হয়েছে যে, 'হিন্দু' শব্দটি, অনেকের মতে, চক্রান্তবাজদের আমদানি করা একটি শব্দ। কারণ হিন্দু বলে কোন অবতার ছিলেন না। বেদ পুরাণ রামায়ণ মহাভারতেও 'হিন্দু' শব্দের উল্লেখ নেই। কী করলে হিন্দু হওয়া যায় আর কী করলে হিন্দু ধর্ম থেকে বেরিয়ে যায় সে আলোচনাও প্রথম খন্ডে হয়েছে। ডক্টর সুরও লিখছেন, "এ সম্বন্ধে J.H.Hutton-এর মন্তব্য বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য। তিনি বলেছেন, 'যতক্ষণ পর্যন্ত আদিবাসী সমূহ ব্রাহ্মণ পুরোহিত গ্রহণ না করে ও গরুকে পবিত্র জীব মনে না করে এবং হিন্দু মন্দিরে হিন্দু বিগ্রহের পূজার্চনা না করে ততক্ষণ তাদের হিন্দু বলে অভিহিত করা সঙ্গত নয়'।" [পৃ. ২২৭]

মৃতের সৎকার একটি বিশেষ কর্ম। মুসলমানদের মৃতদেহ সৎকার করার কথা একটু আগেই উল্লেখ করা হয়েছে। বিশ্বের খ্রীষ্টানদের মধ্যে সমাধি দেওয়ার ব্যবস্থাই প্রচলিত। যাঁদের হিন্দু বলে ধরা হয় তাঁদের মৃতদেহ সৎকার করার পদ্ধতি সর্বজনীন বা এক বলে প্রমাণ পাওয়া যায় না। পূর্ববাংলা এবং পশ্চিমবাংলায় মৃতদেহকে দাহ করা হয়। কিন্তু অনেক ক্ষেত্রে অনেক হিন্দু সম্প্রদায়ে সমাধি দেওয়ারও ব্যবস্থা রয়েছে। কচি শিশু, কুষ্ঠ রোগী, বসন্ত রোগী ও আত্মহত্যাকারী মৃতদেহকে উত্তর-দক্ষিণে শায়িত করে সমাধি দেওয়া হয়। কিন্তু সাধু সন্তদের ক্ষেত্রে সমাধি দেওয়া হয় উপবিষ্ট অবস্থায়। বাস্তার জেলার মারিয়াদের মধ্যেও মৃতদেহ পোড়ানোর রীতি আছে। মৃত ব্যক্তিকে দেহের পোষাক ও গহনাসহ তাঁকে দাহ করা হয় এবং কিছু কিছু ক্ষেত্রে তাঁর ব্যবহৃত অস্ত্র ও প্রিয়

সামগ্রী কবরের মধ্যে দেওয়া হয়। উত্তর পূর্ব সীমান্তের রেঙ্গমাগণ মৃতব্যক্তিকে কবরই দিয়ে থাকেন। কিন্তু সেই কবর একটু অন্য রকম। একখন্ড সমতল পাথর চাপা দিয়েই সমাধি দেওয়া হয়। আবার কিছু সম্প্রদায় মৃতদেহ সমাধিস্থ করার একবছর পর আবার সেই মৃতদেহ বের করে দাহ করে। একে বলে 'হাড়বোরা'।

আমাদের দিকে সাধারণতঃ সৎকারের কর্মী পুরুষই হয়ে থাকেন। কোন কোন সম্প্রদায়ে মহিলারাই মৃতদেহ বহন করে নিয়ে যান এবং সৎকারে বিশেষভাবে অংশ নেন। চিতা জ্বলার একদিন একরাত্রি পর তাঁরা চিতাভস্ম ও অস্থি সংগ্রহ করে দেড় হাত গভীর গর্ত খুঁড়ে ঐ ভস্ম অস্থি ও মুরগীর ডিমের খোলা পুঁতে দেন। তার উপর শেষে একটি সমাধি কুটীর তৈরি করেন। সুতরাং অমুসলমান বা হিন্দু সম্প্রদায়ের কোন সর্বজনীন সৎকার নিয়ম দেখা যাচ্ছে না।

বেদের দিকে তাকালে বৈদিক দেবতামন্ডলী যাঁরা ছিলেন তাঁদের প্রভাব আস্তে আস্তে নিষ্প্রভ হয়ে গেল। তাঁদের মূর্তি তৈরি করে খুব ঘটা করে পূজার্চনা আর দেখা যায় না। যেমন দ্যৌস্ ও পৃথিবী, অদিতি ও আদিত্যগণ, অগ্নি, সূর্য, পূষণ, মিত্র, বরুণ, অশ্বিনীকুমারদ্বয়, ঊষা, ইন্দ্র, পর্জন্য, বায়ু, মরুৎ, সোম, ত্বষ্টা, যম, প্রভৃতি দেবতাগণ। পরে পৌরাণিক দেবতামন্ডলী আবির্ভূত হলেন। যেমন ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব, দুর্গা, লক্ষ্মী, সরস্বতী, কালী, কার্ত্তিক, গণেশ, বলরাম, হনুমান, নীল, গঙ্গা, তুলসী, অশ্বত্থ, নবপত্রিকা প্রভৃতি। তারপরে আবির্ভূত হলেন লোকায়ত দেবদেবী। যেমন শীতলা, মনসা, ইতু, রক্ষাকালী, মঙ্গলচন্ডী, মাণিকপীর, ধর্মঠাকুর, বাবাঠাকুর, সন্তোষী মা প্রভৃতি। দুর্গা, কার্ত্তিক, গণেশ, লক্ষ্মী ও সরস্বতীর মূর্তিতে পূজা অর্চনা পরিলক্ষিত হচ্ছে। কিন্তু ঋগ্বেদে এই নামগুলো নদী হিসাবে স্তুত হোত।

১৭৮৭ খৃষ্টাব্দে ইস্টইন্ডিয়া কোম্পানির এক বিজ্ঞপ্তি থেকে আমরা জানতে পারি যে, তখন যেসব পর্বের দিনে সরকারি অফিস আদালত বন্ধ থাকতো আজকের পঞ্জিকায় বা সরকারি ছুটির তালিকায় দৃষ্টি দিলে তার অনেক তারতম্য লক্ষ্য করা যাবে। ১৭৮৭ সালে হিন্দু পার্বণ উপলক্ষে ছুটির দিনগুলো ছিল এইরকম— অক্ষয়তৃতীয়া ১দিন, নৃসিংহ চতুর্দশী ১দিন, জ্যৈষ্ঠ মাসের দশমী একাদশী ২দিন, স্নানযাত্রা ১দিন, পুনর্যাত্রা ১দিন, উত্থান একাদশী ২দিন, অরন্ধন ১দিন, দুর্গাপূজা ৮দিন, তিলওয়া সংক্রান্তি ১দিন, বসন্তপঞ্চমী ১দিন, অনন্তব্রত ১দিন, বুধনবমী ১দিন, নবরাত্রি ১দিন, অন্নকূট ১দিন, রাসযাত্রা ১দিন, অগ্রহায়ণ নবমী ১দিন, রটন্তী অমাবস্যা ২দিন, মৌনসপ্তমী ১দিন, ভীমাষ্টমী ১দিন, বাসন্তী পুজো ৪দিন, হোলি বা দোলযাত্রা ৫দিন, বারুনী ১দিন, চড়ক পূজা ১দিন, রামনবমী ১দিন, জন্মাষ্টমী ২দিন। এছাড়া সূর্য ও চন্দ্রগ্রহণের দিন ছুটি থাকতো। "গ্রহণের দিন লোকে হাঁড়ি ফেলে দিত, রান্নার জন্য আবার নতুন হাঁড়ি ব্যবহার করতো।" কিন্তু

আজকের দিনে মানুষ আর মাটির সস্তা হাঁড়ি ব্যবহার না করে এ্যালুমিনিয়াম, তামা, কাঁসা, স্টীল প্রভৃতি দামী ধাতুর রান্নার সরঞ্জাম ব্যবহার করেন বলে আর ফেলে দেওয়া সম্ভব হচ্ছে না।

"বিংশ শতাব্দীর সূচনায় এসব পরবের অনেকগুলি লুপ্ত হয়ে গিয়েছিল। আবার অনেক নূতন পরব সৃষ্টি হয়েছিল।" 'যে সব পরব বিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে প্রতিপালিত হতে দেখেছি' বলে লেখক যে লম্বা ফিরিস্তি দিয়েছেন তার কয়েকটি উল্লেখ করছি। যেমন হালখাতা, গন্ধেশ্বরীপূজা, জামাই ষষ্ঠী, গঙ্গাপূজা, স্নানযাত্রা, রথযাত্রা, পুনর্যাত্রা, পৌষপার্বণ, চড়ক বা গাজন, ঘন্টাকর্ন বা ঘেঁটুপূজা। খোশপাঁচড়া থেকে বাঁচবার জন্য ঘেঁটু পূজার সৃষ্টি হয়। [তথ্য : ভারতের নৃতাত্ত্বিক পরিচয়, পৃ. ২৪৬]

বঙ্গদেশে সবচেয়ে ঘটা হয় দুর্গোৎসবে। কিন্তু বিহারে সবচেয়ে বড় উৎসব ছট। উত্তরপ্রদেশে বড় উৎসব হোলি, দশেরা বা রামলীলা। পশ্চিমভারতে দেওয়ালি আর দক্ষিণ ভারতে পোংগল।

কিছু গাছগাছালিও দেবতায় পরিণত হয়েছে। তার মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য হোল অশ্বত্থ, বট, ধাত্রী, পলাশ, তুলসী, বেল, ধান, সিজমনসা, শ্যাওড়া, ঘেঁটু, দুর্বা, আমলকী, কুল, কলা, করমকদম, শাল, খেজুর, নিম, বাঁশ ইত্যাদি।

মুসলমানদের কিন্তু শুধু ভারত নয়, সারা বিশ্বে নামাজ, রোযা, ঈদ, ঈদুল আজহা, হজ প্রভৃতির সময় নির্ধারিত এবং অপরিবর্তনীয়। "ভাদ্রমাসের চতুর্থী তিথিকে 'নষ্টচন্দ্র' বলা হয়। ঐ দিন চাঁদ দেখা নিষিদ্ধ। কেননা পৌরাণিক কাহিনী অনুযায়ী ঐ দিন চন্দ্র গুরুপত্নীকে ধর্ষণ করেছিল। ঐ দিন গৃহস্থের বাড়ী থেকে ফলমূল চুরি করার প্রথা আছে।" [পৃ. ২৬৭]

উত্তর ভারত ও বঙ্গদেশে রামসীতা বেশি সমাদর পান। দক্ষিণভারতে তার বিপরীত। সেখানে সুব্রহ্মণ্যদেবের সমাদর বেশি। বঙ্গদেশের গাজন ও চড়কের মত কোন উৎসব বহির্বঙ্গে দেখা যায় না। বিহারের ছটপূজাও অন্য কোথাও দেখা যায় না। আমাদের দেশে বৈশাখ মাসের প্রথম দিনে বাংলার হালখাতা বা ইদানীং নববর্ষ উৎসব হয়। কিন্তু উত্তরভারতে তা হয় না। উত্তরভারতে ঐ দিনে হয় ধ্বজারোপণ নামে এক উৎসব। ঐ উত্তরভারতে বৈশাখ মাসে রামনবমী পালন করা হয়।

শ্রাবণ মাসের কৃষ্ণপক্ষের পঞ্চমীকে নাগপঞ্চমী বলা হয়। সেইজন্য উঠানে মনসাগাছ পুঁতে সাপের পূজো করা হয়। মনসা গাছের দুপাশে গোবর দিয়ে সাপের মূর্তি তৈরি করা হয়। আবার কোন কোন স্থানে জীবন্ত সাপের পূজো করা হয়। দাক্ষিণাত্যে অঘ্রাণ মাসে শুক্লা পঞ্চমীতে নাগপূজা হয়। কোন কোন স্থানে ঐ পূজো শ্রাবণ মাসে হয়। কোথাও জ্যৈষ্ঠমাসেও হয়।

উত্তরভারতে শ্রাবণী পূর্ণিমায় 'রাখীবন্ধন' একটি বড় উৎসব। বাংলায় ঐ সময় শ্রীকৃষ্ণের ঝুলন যাত্রার ব্যবস্থা আছে। আবার পশ্চিমভারতে ঐ দিনটিকে নারকেল পূর্ণিমা বলা হয়। সেদিন সমুদ্রপূজার ব্যবস্থা আছে।

ভাদ্র মাসের শুক্লা চতুর্থীতে বঙ্গদেশে কোন পূজো হয় না। কিন্তু মহারাষ্ট্রে ঐ সময় সবচেয়ে বেশি সমারোহের সঙ্গে পূজো হয়। বঙ্গদেশে দুর্গাপূজোর যেমন ধূমধাম, মহারাষ্ট্রে গণেশ পূজোরও সেইরকম ধূমধাম। গণপতির ভাসানও হয়। বঙ্গদেশে যখন দুর্গাপূজার ধূম চলে উত্তরভারতে সেইসময় নবরাত্রি, রামলীলা ও দশেরা উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। আবার দক্ষিণভারতে ঐ সময় কোথাও কোথাও সরস্বতী ও আয়ুধ পূজা হয়। বঙ্গদেশে দুর্গাপূজার পরের অমাবস্যাতে সাড়ম্বরে কালীপূজা হয়। কালীপূজার দিন দীপমালায় গৃহ সজ্জিত করা হয়। আনন্দ করা হয় আতসবাজি করে। ঐ সময় পশ্চিমভারতের লোকেরা ঐ রাত্রিকে বিশেষ আনন্দ উৎসব মনে করে রাত্রি জাগরণ করেন এবং জুয়ো খেলায় মত্ত হন। জুয়োর হারজিতের উপর পরের বছরটা কেমন যাবে তা নির্ধারিত হয়। [পূর্বোক্ত, পৃ.২৮৮]

বঙ্গদেশে ভাইফোঁটা অনুষ্ঠানে শাস্ত্রের নির্দেশ এই যে, এ দিন বোনেরা যম যমুনা প্রভৃতির পূজো করে ভাইকে খাওয়াবেন এবং বাঁ হাতের কড়ে আঙ্গুল দিয়ে ভাইকে চন্দন ও মাঙ্গলিক দ্রব্যের ফোঁটা দিয়ে বলেন : 'ভাইয়ের কপালে দিলাম ফোঁটা, যমের দুয়ারে পড়ল কাঁটা।' বিহারে এইদিনে দোয়াত ও চিত্রগুপ্তের পূজো করা হয়। মাঘমাসের শুক্লপক্ষের পঞ্চমীতে বঙ্গদেশে সরস্বতী পূজো হয়। এটা পড়াশোনা বন্ধ রাখার দিন। পশ্চিমবঙ্গে এই দিন থেকে কুল খাওয়া আরম্ভ হয়। আর এদিন নিরামিষ খিচুড়ি খাওয়া অবশ্য কর্তব্য। কিন্তু পূর্ববঙ্গে এই তারিখে কুলের পরিবর্তে ইলিশ মাছ খাওয়া শুরু হয়। আগেকার দিনে অনেকক্ষেত্রে সরস্বতী পূজোর দিন পড়াশোনা বন্ধ রাখা হোত না, ঐ দিনেই পড়াশোনার হাতেখড়ি হোত। সরস্বতী পূজোর দিন মিথিলা ও উত্তর বিহারে লাঙল পূজোর রীতি প্রচলিত।

বর্তমানে দুর্গাদেবীর ভাবমূর্তি সকল দেবদেবীর ঊর্ধ্বে। হিন্দু সভ্যতা বলে যেটি বেলুনের মত ফুলিয়ে সামনে রাখা হয়েছে এটির সঙ্গে অনেক ক্ষেত্রে মিশে আছে বৃটিশদের বা বিলেতি সাহেবদের ধাপ্পাবাজির চক্রান্ত। বেদ, আর্য, সংস্কৃত ভাষা, শিলালিপি, মহেঞ্জোদড়ো, হরপ্পা, রয়াল এশিয়াটিক সোসাইটি বা এশিয়াটিক সোসাইটির অনেক গোপন তথ্য প্রমাণ সহকারে এই বইয়ে প্রথম খন্ডে লেখা হয়েছে।

আজকাল আধুনিক সাহসী অনেক লেখক সত্য তথ্য প্রকাশ করতে এগিয়ে এসেছেন ও আসছেন। ১৯৯১ সালের আনন্দবাজার পত্রিকার পূজা ক্রোড়পত্রে 'দুগ্গা বৈ গতি নাই' প্রবন্ধে প্রখ্যাত লেখক শংকর (মণিশংকর মুখোপাধ্যায়) এক তথ্যভিত্তিক পর্যালোচনায়

যা লিখেছেন তার মর্মার্থ হচ্ছে ঃ দুর্গাদেবীও ফরেন থেকে আমদানি হয়েছেন। অর্থাৎ সেখানকার দেবদেবী সামনে করেই ফরেনাররা কাঠামোটা ঠিক করে দিয়েছেন। এশিয়া মাইনরের ইয়াজিলিকায়া গুহায় ৩৩০০ বছর আগেকার ৬৬ জন দেবদেবীর সঙ্গে একটি দেবী আছেন যাঁর নাম 'সুপিপলিলিউমা'। এই শব্দটির শেষ অক্ষর দুটিকে নিয়ে উমা দেবী বানানো হয়েছে। এশিয়া মাইনরের ঐ ভাস্কর্যেও সিংহবাহিনী বিদ্যমান। সেইসঙ্গে দুর্গার স্বামী শিবেরও একটি মূর্তি রয়েছে যিনি ষাঁড়ের উপর চড়ে রয়েছেন। লেখকের মতে ইনিই ভোলা মহেশ্বর। [দ্রষ্টব্য পৃষ্ঠা ১৩-১৫]

Wisdom নামের আন্তর্জাতিক ইংরাজি পত্রিকায় বলা হয়েছে যে, দুর্গাপূজার প্রচলন আমাদের দেশে সর্বপ্রথম কৃষ্ণনগরের জমিদার বাড়িতে ইংরেজের আমলে শুরু হয়। ১৯৯৭-এর ৫ই অক্টোবর আনন্দবাজার পত্রিকার রবিবাসরীয়তে 'ক্লাইভের দুর্গোৎসব' প্রবন্ধে নির্মল করও এক গুরুত্বপূর্ণ ইতিহাস লিখেছেন।

১৭৫৭-র ২৩শে জুন পলাশীর যুদ্ধে নবাব সিরাজের পরাজয়। অন্যভাবে বলা যায়, ঐ তারিখে ভারতবাসীর পরাজয় আর ইংলন্ডবাসীর বিজয়। নবকৃষ্ণ দেব ছিলেন সাহেবদের মুন্সী বা চাকর। কোন সময় ছিলেন ওয়ারেন হেস্টিংসের প্রাইভেট টিউটর। উন্নতি করে হয়েছিলেন তালুকদার— চার হাজারি মনসবদার। পলাশীতে সিরাজের পতনে "যাঁরা সবচেয়ে উল্লসিত হন তাঁদের মধ্যে ছিলেন নদীয়ার মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র আর কলকাতার নবকৃষ্ণদেব। কোম্পানীর জয়কে এঁরা হিন্দুর জয় মনে করলেন। ক্লাইভ চাইলেন এই জয়কে 'সেলিব্রেট' করতে। ... ক্লাইভের পরামর্শে মুশকিল আসান করলেন মুন্সী নবকৃষ্ণদেব। বাসন্তী পূজাকে পিছিয়ে আনলেন শরৎকালে। ...গড়ে উঠল একচালা প্রতিমা। প্রতিমার গা ভর্তি সোনার গয়না ঝলমল করে উঠল। দুর্গার কেশদামে গুঁজে দেওয়া হোল ২৬টি স্বর্ণনির্মিত স্বর্ণচাঁপা। নাকে ৩০টি নথ। মাথায় সোনার মুকুট।... তারপর তোপধ্বনির সঙ্গে সঙ্গে সন্ধিপূজোর শুরু।... দৈনিক নৈবেদ্য দেওয়া হচ্ছে ২৩ মণ চালের।... সে বছর নবকৃষ্ণদেব আর নদীয়ার কৃষ্ণচন্দ্র লক্ষাধিক টাকা ব্যয় করে শরৎকালীন দুর্গাপূজোর মাধ্যমে ইংরেজদের বিজয় উৎসবটি পালন করলেন।... তত্ত্বজ্ঞদের মতে এর আগে শারদীয়া দুর্গাপূজো ছিলনা, ছিল বাসন্তীপূজো। ক্লাইভ নিজে খৃষ্টান, আর মূর্তি পূজোর বিরোধী হয়েও স্রেফ নিজেদের স্বার্থে হিন্দু প্রেমিক সেজে নবকৃষ্ণের দুর্গাপূজোয় ১০১ টাকা দক্ষিণা আর ঝুড়িঝুড়ি ফলমূল পাঠিয়েছিলেন। প্রশাসনিক ও বাণিজ্যিক স্বার্থে ইংরেজরা এদেশে দুর্গাপূজোকে উপলক্ষ করে গড়ে তুললেন এক অনুগ্রহজীবী তাবেদার সম্প্রদায়। নবকৃষ্ণের কাছেও দুর্গাঠাকুর ছিলেন উপলক্ষ মাত্র। ক্লাইভকে তুষ্ট করাই ছিল আসল উদ্দেশ্য।... নবকৃষ্ণ ভাল করেই জানতেন মূর্তিপূজোর বিরোধী খৃষ্টান ক্লাইভকে শুধু দুর্গাঠাকুর দেখিয়ে মন ভরানো যাবে না। তাই বোধনের

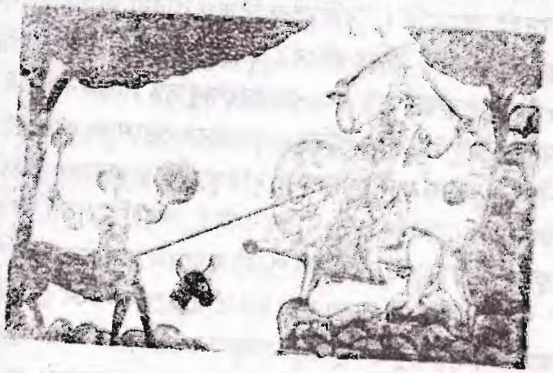

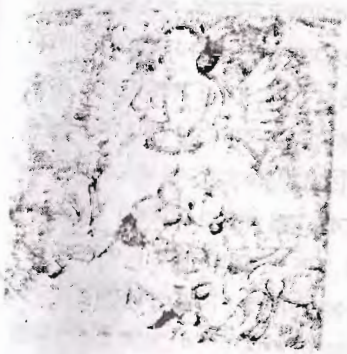

দিন থেকে সাহেবদের জন্যে মদ মাংস আর নাচগানের অঢেল আয়োজন করলেন।... একটি নির্দিষ্ট আসনে এসে বসলেন ক্লাইভ, পাশের আসনে নবকৃষ্ণদেব বাহাদুর।... ক্লাইভ সেদিন পশুবলি সহ হিন্দুদের দেবীর পায়ে পুষ্পাঞ্জলিও দিয়েছিলেন।... নর্তকীদের নাচগান চলছে, চারিদিক ঘিরে কোম্পানীর বাঘাবাঘা সাহেব মেম অতিথিরা কৌচে বসে মৌজ করে তা দেখছেন। নাচ দেখতে হাতির পিঠে চড়ে এসেছিলেন ওয়ারেন হেস্টিংসও।"

এই সত্য তথ্য জানার পর পরাধীনতাকে যাঁরা ঘৃণা করেন, স্বাধীনতাকে যাঁরা শ্রদ্ধা জানান তাঁরা এই দুর্গোৎসবকে কী চোখে দেখবেন জানি না। যে দেবী কোন সময়ে দুহাত বিশিষ্ট, কোন সময়ে চার, কোন সময়ে আট, কখনো দশ, বারো, আঠারো এমনকি বিশ ভূজা হয়ে আবির্ভূতা, তাঁর সত্যাসত্যের মূল্যায়ন কিভাবে হবে তা বলা কঠিন। [তথ্য ও ছবি দ্রষ্টব্য : 'দেশ', ৪ অক্টোবর '৯৭, পৃ. ৭৮ এবং ১৯ সেপ্টেম্বর, '৯৮ প্রচ্ছদ ও পৃ. ৪৮-৫৩]

বঙ্কিমচন্দ্রও জানতেন যে লর্ড ক্লাইভের আমলেই দুর্গার সৃষ্টি। তিনি এও জানতেন যে ওটা ইংরেজদেরই কারসাজি। "বঙ্কিমচন্দ্র বিদ্রুপ করিয়া লিখিয়াছিলেন যে, পরে দুর্গাপূজার মন্ত্রও ইংরাজিতে পঠিত হইবে।" [দ্রঃ বাঙালী জীবনে রমণী, নীরদচন্দ্র চৌধুরী, পৃ. ১৮] নবকৃষ্ণবাবু সৃষ্ট এবং কৃষ্ণচন্দ্রবাবু সৃষ্ট লাভজনক এই কৌশলকে অনুসরণ করে অন্যান্য বাবু যাঁরা দরিদ্র শ্রমিক ও কৃষকদের রক্তশোষণ করে ধনী হয়েছিলেন, তাঁরা আরও ধনী এবং আরও মানী হবার জন্য দুর্গাপূজো শুরু করলেন। "এই তালিকায় ছিলেন প্রাণকৃষ্ণ সিংহ, কেষ্টচাঁদ মিত্র, নারায়ণ মিত্র, রামহরি ঠাকুর, বারাণসী ঘোষ, দর্পনারায়ণ ঠাকুর। ওঁরা ছাড়াও তৎকালে পূজো করতেন রমাকান্ত চট্টোপাধ্যায়, রাজা সুখময় রায়।" আরো যাঁরা এই পূজো করতেন তাঁরা হলেন সাবর্ণ চৌধুরী, লক্ষ্মীকান্ত গাঙ্গুলী, রানী রাসমণি, ছাতুবাবু ও লাটুবাবু, রামদুলাল দে, দ্বারিকানাথ দত্ত প্রমুখ। [তথ্য আনন্দবাজার পত্রিকা ৭.১০.৯৭, বাবুদের পূজো : কমলেন্দু সরকার, পৃ.১৬]

মুসলমানদের মধ্যে বৈধ খাদ্য বলে যেটা বিবেচিত সেটা যখন ইচ্ছা সুবিধামত খাওয়া যাবে, রোযা ছাড়া কোন বাধা নিষেধ নেই। কিন্তু হিন্দু রীতি, ধর্ম ও সংস্কৃতিতে যেসব ব্যবস্থাপনা দেখা যায় তাতে কোন্‌টা যে ধর্ম আর কোন্‌টা যে অধর্ম তা বোধগম্য হওয়া মুশকিল। যেমন অরণ্যষষ্ঠী বা জামাইষষ্ঠীর দিন বিবাহিতা স্ত্রীলোকের মাছ খাওয়া নিষিদ্ধ। জ্যৈষ্ঠ মাসের প্রতি মঙ্গলবার 'জয়মঙ্গলবার' হিসাবেও মাছ খাওয়া নিষিদ্ধ। অগ্রহায়ণ মাসের প্রতি রবিবার ইতু পূজোর দিন মহিলাদের মাছ খাওয়া নিষিদ্ধ। পশ্চিমবঙ্গে শ্রীপঞ্চমীর দিন হিন্দু পুরুষ-নারী নির্বিশেষে মাছ খাওয়া নিষিদ্ধ। কিন্তু পূর্ববঙ্গের হিন্দুরা ঐ দিন থেকেই ইলিশ মাছ খাওয়া শুরু করেন। বিজয়া দশমীর পর থেকে ইলিশ মাছ

খাওয়া নিষিদ্ধ। দশহরার দিন ফল ভক্ষণ জরুরী। ভাদ্র মাসের সংক্রান্তিতে রান্না করা দ্রব্য খাওয়া নিষিদ্ধ। তবে একটা পথ বের করা হয়েছে— তার পূর্বের দিনের রান্না করা অর্থাৎ বাসী খাবার খাওয়া যাবে। মাঘ মাসের শুক্লপক্ষের ষষ্ঠী, শীতলা ষষ্ঠী নামে পরিচিত। ঐ দিন ঠান্ডা খাবার খেতে হয়, টাটকা গরম খাওয়া নিষিদ্ধ। ঠিক তার আগের দিন বেগুন আলু ইত্যাদি সমেত মাসকলাই সেদ্ধ করে পরের দিন সেই কলাই দই-এর সঙ্গে খেতে হয়। জ্যৈষ্ঠ মাসে লাউ খাওয়া নিষিদ্ধ। ঐ রকম মাঘ মাসে মূলো। আরো নিষিদ্ধ খাবার হোল, প্রতিপদে কুমড়ো, দ্বিতীয়ায় ছোট বেগুন, তৃতীয়ায় পটল, চতুর্থীতে মূলো, পঞ্চমীতে বেল, ষষ্ঠীতে নিম, সপ্তমীতে তাল, অষ্টমীতে নারকেল, নবমীতে লাউ, দশমীতে কলমি শাক, একাদশীতে শিম, দ্বাদশীতে পুঁইশাক, ত্রয়োদশীতে বেগুন, চতুর্দশীতে মাসকলাই। এই তরিতরকারি ছাড়া অষ্টমী, নবমী, চতুর্দশী পূর্ণিমা ও অমাবস্যার তিথিতে স্বামী স্ত্রীর যৌনমিলন নিষিদ্ধ। তাছাড়া তেল ব্যবহার, মাছ ও মাংস খাওয়াও কঠিন ভাবে নিষিদ্ধ ছিল। আজকের শিক্ষিত সমাজে এগুলো মেনে চলা শুধু কঠিন নয়, ক্ষতিকারকও বটে। ফলে আধুনিকবাদীরা ধর্মে আস্থা হারিয়ে ফেলেন এবং সহজ হয়ে ওঠে নাস্তিক হয়ে যাওয়া।

পূর্বে কিশোরীদের প্রথম রজোদর্শন বা স্রাব শুরু হলে বিয়ের মতো এক উল্লেখযোগ্য পর্ব পালন করা হোত। আত্মীয়স্বজনদেরও নিমন্ত্রণ করা হোত। ধুমধামের সঙ্গে এ প্রথা চলে আসছিল, কিন্তু আজ শিক্ষিত সমাজে এটাকে অশোভন ও উৎকট অসভ্যতা মনে করায় তা বন্ধ হয়ে গেছে প্রায়।

পদবীর বিবর্তন

হিন্দু জাতির মধ্যে 'ছোটলোক' 'ভদ্রলোক' বলে যে শ্রেণীবিভাগ এবং নানারকম যে উপাধি তা থেকে সেই ব্যক্তি কোন পর্যায়ের তা নির্ধারণ করা বেশ কঠিন। যেমন ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র প্রভৃতি চারবর্ণ তো আছেই, তাছাড়া আছে 'তফশিল' এবং 'অতফশিল'ভুক্ত জাতি। যেমন বাউড়ি, চামার, রজক, ডোম, দোসাধ, ঘাসী, লালবেগী, মুসাহার, পান, পাসী, রাজোয়ার, ঝালোমালো, জেলে-কৈবর্ত, হাড়ি, গোঁড়ি, দোয়াই, দামাই, বিন্দ, ভুইঞা, ভুঁইমালী, বেলদার, বেদিয়া, বাইতি, বাহেলিয়া, দুলে, বাগদি, তুরি, করেঙ্গা, কেওরা, কান্দ্রা, কামি, কাদার, কোনাই, কোচ, খটিক, কেওট, কাউর, মাল, মাহার, লোহার, কোটাল, কোঁয়ার, নুনিয়া, নমঃশূদ্র, মেথর, মাল্লা, মল্ল, রাজবংশী, পোদ বা পৌন্ড্র, পাটনী, পলিয়া, চৌপল, বান্টার, তিয়র, শুঁড়ি, সরকি, কাঞ্জার, হালালখোর, দাবগর, ভোগতা, খয়রা, ভঙ্গী, ভূমিজ, নট, কোরারিয়ার— এঁরা সব তফশিলভুক্ত বা ছোটলোক (!) জাতি।

এই ছোটলোক ভদ্রলোকের হাটে কে যে কখন শুঁয়োপোকা থেকে প্রজাপতি হবার মতো ছোটলোক থেকে রূপান্তরিত হয়ে ভদ্রলোক হচ্ছেন তার হিসেব রাখা মুশকিল। "কায়স্থরা নিজেদের ক্ষত্রিয় বলছে, বাগদীরা নিজেদের বর্গক্ষত্রিয় বলছে। মেথররা নিজেদের মলক্ষত্রিয় বলছে। পোদরা নিজেদের পুন্ড্রক্ষত্রিয় বলছে। কিন্তু কেউই চিন্তা করে দেখছেন না যে, সকলেই যদি ক্ষত্রিয় হয়, তাহলে সমীকরণ করলে পরিস্থিতিটা কী দাঁড়ায় : কায়স্থ, বাগদী, মেথর, পোদ, ক্ষত্রিয়।" [ভারতের নৃতাত্ত্বিক পরিচয়, পৃ. ১৮৫]

ধর্মপুরাণ নামক হিন্দু ধর্মগ্রন্থে একটি পদবী তালিকা পাওয়া যাচ্ছে— সদগোপ, কৈবর্ত, গোয়ালা, তাম্বুলী, উগ্রক্ষত্রিয়, কুম্ভকার, তিলি, যোগী, তাঁতী, মালী, মালাকার, নাপিত, রজক, দুলে, শঙ্খধর, হাড়ি, মুচি, ডোম, কলু, চন্ডাল, মাঝি, বাগদী, মেটে, স্বর্ণকার, সুবর্ণ বণিক, কর্মকার, সূত্রধর, ধীবর, পোদ্দার, ক্ষত্রিয়, বারুই, বৈদ্য, পোদ, পাকমারা, কায়স্থ, কেওড়া প্রভৃতি।

মুসলিম সমাজে যে কয়েকটি পদবি আছে তা এক হিসাবে মূল্যহীন বলা যায়। কারণ, হিন্দু সমাজে যেমন 'ছোটলোক' ভদ্রলোক হতে পারেন না, তেমনি ভদ্রলোকেরাও সহজে 'ছোটলোক' সাজতে চান না। মুসলিম সমাজে পৌরহিত্য বা ইমামতি বলে যে

বিষয়টি আছে সেটি সারা পৃথিবীর প্রত্যেক প্রাপ্তবয়স্কের, তাঁর যে পদবিই থাক না কেন, তা করার অধিকার পূর্বেও ছিল আজও রয়েছে। সে যাইহোক, হিন্দু সমাজের পদবিগুলো যা-ই আছে তা নিয়েও এক বিরাট সমস্যা। যেমন 'কর' উপাধি ২২ রকমের আছে। 'কুন্ডু' আছে ১৮ রকম, 'গুপ্ত' ৯ রকম, 'গোস্বামী' ১২ রকম, 'ঘোষ' ১৫ রকম, 'চৌধুরী' আছে ৩২ প্রকারের, 'জানা' ১৯ প্রকার, 'ঠাকুর' ৯ রকমের, 'দত্ত' ২৮ রকম, 'দাস' পদবিটি আছে ৭৬ রকম, 'দে' আছে ২৮ রকমের, 'ধর' ১৫ রকম, 'নন্দী' ১৯ রকম, 'নাগ' আছে ১৬ রকম, 'পাত্র' ১৮ রকম, 'পাল' ২৮ রকম, 'পালিত' ৬ রকম, 'প্রামাণিক' ২৯ রকম, 'বাগচি' ৫ রকম, 'ভাদুড়ি' ৩ রকম, 'বিশ্বাস' ৩২ রকম, 'মল্লিক' ৩৯ রকমের, 'মজুমদার' ২৪ রকম, 'রায়চৌধুরী' ১৯ রকম, 'হালদার' ২৭ রকম, 'সিংহ' ২৯ রকম, 'সেন' ২৪ রকম, 'সামন্ত' ১৩ রকম, 'সাহা' আছে ১২ রকমের, 'সরকার' আছে ৩৫ রকমের, 'হাজরা' আছে ২১ রকম, এবং 'রায়' আছে ৪৭ রকমের। এইভাবে 'মুখোপাধ্যায়' ব্রাহ্মণদের মধ্যে আছে, আবার ক্ষত্রিয়দের মধ্যেও আছে। ব্রাহ্মণদের অনেক পদবি সদগোপের ভিতরেও আছে। আবার কিছু উপাধিধারী ব্রাহ্মণ বলে দাবী করেন, কিন্তু শুনলে তা মনে হয় না। যেমন চম্পটি, ঝম্পটি, খড়খড়ি, তোড়ক, মৎস্যাসি, শিহড়ি, গোচন্ড, কাবরী, শূল, বলোৎকটা, লাড়ুলি ও বাড়ুরি। এ এক বিরাট ব্যাপার।

বর্তমানে সরকার তফশিলি জাতি, উপজাতি বা 'ছোটলোক' সম্প্রদায়ের উপর করুণা বর্ষণ করায় চাকরি বাকরির কোটা নির্ধারিত হয়েছে। এই সুযোগে ভদ্রলোক বাবুরা রাতারাতি ভদ্রলোকের খোলস খুলে 'ছোটলোকে'র খোলস পরে বৈধ কাগজপত্র (?) তৈরি করে অনুন্নতদের বঞ্চিত করে চাকরি গুছিয়ে নিতে তৎপর।

ছোটলোক ভদ্রলোকের শ্রেণীবিভাজন পুরোপুরি না হলেও সিংহভাগ বা মোটা অংশটি বৃটিশেরই সৃষ্টি। ডক্টর কামিনীকুমার রায়ের 'লৌকিক শব্দকোষ', ডঃ সুকুমার সেনের 'প্রাচীন বাংলা ও বাঙালী', ডঃ অতুল সুরের 'বাংলার সামাজিক ইতিহাস', ডঃ দীনেশচন্দ্র সরকারের 'শিলালেখ-তাম্রশাসনাদির প্রসঙ্গ', ডঃ কোশাম্বির 'মিথ অ্যান্ড রিয়ালিটি', 'দি কালচার অ্যান্ড সিভিলাইজেশন অব এনসেন্ট ইন্ডিয়া', মিঃ উইলিয়াম হান্টারের 'এ্যানালাস অব রুরাল বেঙ্গল', এইচ রিজলীর 'ট্রাইবস অ্যান্ড কাস্টস অব বেঙ্গল', রোমিলা থাপারের 'পাস্ট অ্যান্ড প্রেজুডিস', রমেশচন্দ্র মজুমদারের 'করপোরেট লাইফ ইন এনসেন্ট ইন্ডিয়া', খগেন্দ্রনাথ মিত্রের 'পদবীর উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশের ইতিহাস' প্রভৃতি গ্রন্থ এই বিষয়ের সহায়কগ্রন্থ বলে বিবেচিত হয়।

তাত্ত্বিক লেখক লোকেশ্বর বসুও 'আমাদের পদবির ইতিহাস' নামে একটি মূল্যবান বই লিখেছেন। বইটি থেকে কয়েকটি উদ্ধৃতি দিয়ে শেষ করতে চাইছি প্রসঙ্গ।

পদবিস্রষ্টা সুবিধাবাদীদের জন্য তিনি বলেছেন, "তাঁরা কেউ ইচ্ছামত পদবী গ্রহণ করেছেন, কেউ আদি পদবীর গায়ে সংস্কৃত ভাষার পালিশ চড়িয়েছেন, কেউবা পদবীটি আমূল বদলে নিয়েছেন। আমরা পরবর্তী সন্তান সন্ততিরা সেই পদবীকেই আদি ও অকৃত্রিম মনে করে নামের শেষে যুক্ত রেখে আত্মগর্বে আপ্লুত হয়ে আছি।"

"কারণ আদিতে কোন পদবীই ছিল না। আপনার পদবী কি বন্দ্যোপাধ্যায় বা মুখোপাধ্যায়? চট্টোপাধ্যায় বা গঙ্গোপাধ্যায়? এই পদবীগুলিকে যত প্রাচীন ভাবছেন সত্যই কিন্তু ততখানি প্রাচীনত্ব এদের নেই। ভারতবর্ষে কুত্রাপি এই পদবী ছিল না।... বঙ্গ দেশেও ব্রাহ্মণদের পদবীগুলি ছিল অন্য, ক্ষেত্রবিশেষে রীতিমত শ্রুতিকটু। আপনি কি ঘোষ, বসু, মিত্র বা দত্ত? স্বীকার করি এই শব্দগুলি খুবই প্রাচীন। কিন্তু পদবী হিসাবে এগুলির কোন প্রাচীন ব্যবহার খুঁজে পাওয়া দুষ্কর।"

"এখানে প্রাসঙ্গিক বলেই উল্লেখ্য যে বন্দ্যোপাধ্যায়, চট্টোপাধ্যায়, মুখোপাধ্যায়, গঙ্গোপাধ্যায়ও পরিবর্তিত পদবী। আদি পদবী বাড়বি বা বন্দ্যঘটি, চাটুতি বা চট্ট, মুখটি, গাঙ্গুর বা গঙ্গ। মুখটি বা মুকুটি এখনো পাওয়া যায়। বাড়ব বা বাড়বি গ্রাম থেকে বাড়বি ও বন্দ্যঘটি রূপান্তর, তা থেকে বন্দ্যোপাধ্যায়।" [ঐ, পৃ. ৯ দ্রষ্টব্য]

"চাটুতি, মুখটি, বাড়বির মতই বাকচি, লাহিড়ী, সান্যাল পদবিও তো আপাতদৃষ্টে অর্থহীন।... কুশো গ্রাম থেকে সৃষ্ট পদবি কুশারী কিভাবে লোকমুখে ঠাকুর পদবিতে রূপান্তরিত হয় সে কাহিনী আজ অনেকেই জানেন।" লেখক এখানে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের বংশের উৎস সম্পর্কে বলেছেন।

"পদবীর খোঁজে বেদ, পুরাণ, জাতক এবং কথাসরিতের পাতা, ওল্টালেও তার হদিস মেলে না। সেখানে শুধুই নাম, কোন পদবি নেই।... আধুনিক কালেও দেখা গেছে শিবনাথ ঘোষ বা কালিকাপ্রসাদ সেন ইংরেজদেরই ত্রিমাত্রিক নামের অনুসরণে (জর্জ বার্নার্ড শ বা জি. বি. এস.) নিজেদেরও এস. এন. ঘোষ বা কে. পি. সেন বানিয়ে তোলেন। ... উত্তরভারতে ব্রাহ্মণদের আদি পদবীর সন্ধানে গেলে দেখা যাবে শর্মা ও স্বামী অনেক ক্ষেত্রেই বিদায় নিয়ে শিক্ষাগত উপাধি তার স্থান করে নিয়েছে। অর্থাৎ একালে নামের শেষে বি-এ এম-এ লেখার মত তারা বেদপাঠের বিজ্ঞাপন দিতেন। পন্ডিত, দ্বিবেদী, ত্রিবেদী, চতুর্বেদী ও শাস্ত্রী উপাধিগুলি ছিল ডিগ্রি ডিপ্লোমার সমতুল্য।... একটি বেদ যিনি পাঠ করেছেন তিনি ছিলেন পন্ডিত, দুটি বেদ পাঠে দ্বিবেদী, তিনটি বেদ পাঠে ত্রিবেদী, চারটি বেদ পাঠে চতুর্বেদী। কিন্তু বংশপরম্পরায় এগুলি যে পদবী হয়ে গেল।... ব্রাহ্মণদের আদি পদবি শর্মা ও স্বামী আজ বাংলাদেশে প্রায় অনুপস্থিত।" [দ্র. পৃ.২০]

বৃটিশ তার কাজের সুবিধার জন্য ডিভাইড অ্যান্ড রুল অর্থাৎ বিভেদ ও শাসন পদ্ধতি চালাতেই উঁচু নিচুর ব্যবধান সৃষ্টি করেছে। পূর্বে ব্রাহ্মণ বড়ুয়া ও ডোম প্রভৃতি গোষ্ঠী সব একাকারই ছিল। এখন তা কল্পনা করা দুঃসাধ্য। "একদা ব্রাহ্মণ ও বড়ুয়া ছিল পাশাপাশি। দৃষ্টান্ত :

পুখুর পাড়েতে সদা ডোমের কুড়িয়া (কুঁড়েঘর)।
ঘন ঘন আইসে যায় ব্রাহ্মণ বড়ুয়া।।" [পৃ. ২১]

পূর্বে গ্রাম বাংলায় ঝাড়ফুঁক করা, সাপে কাটা রোগীকে মন্ত্র ও ঔষধ দেওয়ার লোকদেরকে সাধারণত ওঝা বা 'রোঝা' বলা হোত। "বড় বড়ু বাড়ব-এর সঙ্গে ওঝা, মুখটির সঙ্গে ওঝা, চাটুতির সঙ্গে ওঝা যুক্ত হয়ে বাড়ুওঝা, চাটুওঝা, মুখুওঝা পদবীগুলি হয়ে দাঁড়ায় বাড়ুজ্যে, মুখুজ্যে ও চাটুজ্যে।... আচার্য ডক্টর সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় একজায়গায় লিখেছেন, চাটু গ্রামের হিন্দি জী বা জীউ থেকে চাটুর-জিয়া, চাটুর্জ্যা, চাটুর্জ্যে ও চাটুজ্যে। ১৭৬০ সালের পর ইংরাজী রূপ দাড়ায় চ্যাটার্জী। ১৭৫০-এর পর পন্ডিতি বা সংস্কৃত রূপ হয় চট্টোপাধ্যায়।" [পৃ.২১, ৩৮]

সুনীতিবাবুর মতে 'মুখটি' বা 'মুখড়া' গ্রাম থেকেই মুখুজ্যে। 'বন্ডউরী', 'বাঁড়ুরি' গ্রাম থেকেই বাঁড়ুজ্জেদের উৎপত্তি। 'বন্দিঘটি' গ্রাম থেকে 'বন্দ' শব্দ নিয়ে বন্দ্যোপাধ্যায়। তেমনি 'গঙ্গা কুলিক' গ্রাম থেকে 'গাঙ্গৌলি' ও 'গাঙ্গুলি' শব্দটিকে সংস্কৃতের পোষাক পরিয়ে গঙ্গোপাধ্যায় বানানো হয়েছে।

এমনিভাবে বোড়াল ও বোড়া গ্রাম থেকে তৈরি হয়েছে বড়াল পদবি। কুশো গ্রাম থেকে কুশারী। ঘোষ ও ঘোষাল গ্রাম থেকে ঘোষাল আর মুকটি থেকে হয়েছে মুখটি পদবী। চাটুতি গ্রাম থেকে হয়েছে চট্ট। পাকুড় গ্রাম থেকে হয়েছে পর্কট ও পাকড়াশী। পলশা ও পোষলা গ্রাম থেকে হয়েছে যথাক্রমে পলসাঁয়ী এবং পুষালী। পোড়াবাড়ী গ্রাম থেকে তৈরি হয়েছে পোড়ারি পদবি।

গ্রামের নাম অনুসন্ধান করলে দেখা যাবে বর্ধমান জেলার বাইশটি গ্রাম, বাঁকুড়ার চারটি গ্রাম, বীরভূম ও মুর্শিদাবাদের ন'টি করে গ্রাম, হুগলী জেলায় পাঁচটি, মানভূম জেলায় একটি এবং আরও বিভিন্ন জেলা থেকে আর সাতটি গ্রামের বন্দ্য, চট্ট, গঙ্গ, মুখটি প্রভৃতি নাম থেকেই বন্দ্যোপাধ্যায়, চট্টোপাধ্যায়, গঙ্গোপাধ্যায়, মুখোপাধ্যায়ের সৃষ্টি। লেখক লোকেশ্বর বসুর মতে ব্রাহ্মণ তৈরি হয়েছে বেশির ভাগ বর্ধমান জেলায়: "সুতরাং অনুমান করা যেতে পারে সেখান থেকে রাঢ়ী ব্রাহ্মণরা চতুর্দিকে নিজেদের বিস্তার করেন।" [ঐ, পৃ. ৩৯]

মোঘল আমলে অর্থাৎ মুসলমানদের তাবেদার আমলা ও কর্মচারী প্রতিনিধির উপর সন্তুষ্ট হয়ে তাঁরা দিয়েছিলেন রকমারী পদবী। তার মধ্যে কয়েকটি উল্লেখ করা যেতে পারে। যেমন সরকার, হাজারী বা হাজরা। বর্তমানে অনেক ব্রাহ্মণের পূর্বপরিচয় নিতে গেলে দেখা যাবে তাঁরা অনেকেই হাজরা ছিলেন। লেখকের মতে "হালদার ও হাজরা উভয়ই মোঘল আমলের পদবি।" [পৃ. ২৪]

মোঘলদের দেওয়া চাকরি সূত্রেও বহু পদবীর সৃষ্টি হয়— "যেমন তালুকদার, চাকলাদার, মহলানবীশ, তরফদার, সেহানবীশ, খাসনবীশ, পত্রনবীশ, বক্‌শী, মুনশী, মুস্তাফী ইত্যাদি।" এছাড়াও মজুমদার, নস্কর, কয়াল, মীরবহর, হালদার প্রভৃতি পদবিগুলো মুসলমান আমলের অবদান।

ইংরেজ আমলে অর্থাৎ ইংরেজ শাসকরা ও তাদের গোলাম, আমলা, স্তাবক, বিশ্বাসভাজন কর্মীদের বহু উপাধি দিয়ে গেছে— "পরবর্তীকালে ইংরেজ শাসকরাও রায়সাহেব, রায়বাহাদুর, নাইট, স্যার প্রভৃতি উপাধি বিতরণ করেছিলেন। অনেকেই হয়তো জানেন না যে, 'মহামহোপাধ্যায়' ইংরেজ সরকারের দেওয়া খেতাব।"

'দাস' পদবিটিকে অনেকে ঘৃণ্য মনে করে 'দাস' কে 'দাশ' বানিয়ে ফেলেছেন। "দাস কোন জাতিবাচক পদবী নয়।" কায়স্থ বৈদ্য এবং ব্রাহ্মণদের মধ্যেও দাস ছিল এবং আছে। "পঞ্চাশ ষাট বছর আগে দাস পদবীর বহুল প্রচলন ছিল, বর্তমানে প্রায় অদৃশ্য। দাস পদবীকে অপাংক্তেয় করার আগে মনে রাখতে হবে আমাদের মহাভারতের রচনাকারের নাম কাশীরাম দাস।"

মুর্শিদাবাদ জেলার 'বসু' গ্রাম থেকে বসু পদবির সৃষ্টি। বর্তমানে গ্রামটির নাম হয়েছে 'বসুয়া', বীরভূমের ঘোষ বা ঘোষাল গ্রাম থেকে ঘোষ পদবি। "আবার ঘোষ গ্রাম থেকেই ঘোষাল। ঘোষ পদবী কায়স্থদের তুলনায় গোপদের মধ্যে অধিক প্রচলিত।"

খুব খুঁটিয়ে দেখলে গবেষকরা দেখতে পাবেন যে, মানুষের তৈরি করা ছোটলোক ভদ্রলোক দুই শ্রেণীর মধ্যে প্রায় সব উপাধিই বিদ্যমান। এই বড়রকম বেইমানি বঙ্গের একশ্রেণীর বাঙালিরাই ঘটিয়েছে, তারাই সৃষ্টি করেছে ভদ্রলোক ও ছোটলোকদের মাঝে বিশাল চৈনিক প্রাচীর।

"মুষ্টিমেয় বাঙালী ফার্সী শিখে (মুসলিম আমলে) উন্নতি করেন, পরে ইংরাজী শিখে। বাঙালীর সর্বাঙ্গে বর্তমানে যে প্রসাধন লক্ষ্য করা যায় তার শুরু এক শতাব্দীও নয়।" [পৃ.২৮]

শাস্ত্র প্রেমিকদের মনে রাখতে হবে যে, হিন্দুধর্ম বা হিন্দু "শাস্ত্রমতে অব্রাহ্মণ অবাঙালী মাত্রেই শূদ্র। অবশ্য বহু জাতি ক্ষত্রিয়ত্ব দাবী করে। কিন্তু সমুদয় দাবীর পিছনে কোন যুক্তি নেই।" [পৃ. ৩২]

ইংরেজদের তৈরি করা কঠিন চক্রান্ত সাধারণ মানুষের কাছে সহজবোধ্য হওয়া সুদীর্ঘ সময় ও কঠিন শ্রম সাপেক্ষ। আমাদের মস্তিষ্কে বেদ এমনভাবে বাসা বেঁধেছে যে তার সত্যতার উপর যেন কোন প্রশ্নই হতে পারেনা। তাই পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, পৃথিবীতে ঋগ্বেদটি হচ্ছে এক নম্বর খাঁটি জিনিস। যেটি পৃথিবীতে আর কোথাও পাওয়া যায় না। মূল ঋগ্বেদ একটিই আছে, তাও আবার লন্ডনে (!)। আর তা সংগ্রহ করলেন কে? সাহেব পন্ডিত ম্যাক্সমূলার। কোত্থেকে পেলেন ঐ রত্নটি? রাশিয়া থেকে। ভারত পাকিস্তান বাংলাদেশ অর্থাৎ অবিভক্ত ভারতবর্ষে কোথাও মিলল না ঋগ্বেদের একটি কপি অথবা একটি ছেঁড়া পাতাও। লোকেশ্বর বসুও লিখেছেন, "মনু সংহিতার তো একটি মাত্র পুঁথি ইংরেজরা উদ্ধার করেন দক্ষিণভারত থেকে। তাও সেটি খুব প্রাচীন নয়। শাস্ত্রবাক্য কণ্ঠস্থ থাকতো বলেই আঞ্চলিক প্রভাবে কেউ কেউ দু চারটি শ্লোক যে প্রক্ষিপ্ত করেন নি (অর্থাৎ ভেজাল দেন নি) এমন মনে করার হেতুও নেই।" [পৃ. ৩৪]

বড়কর্তারা চাকর বাকরদের মাথায় যা ঢুকিয়ে দেন তাই নিয়েই তাজা থাকে আমাদের মগজ। যেমন উপনিষদের মূল্যবান উদ্ধৃতি 'সত্যম্ শিবম্ সুন্দরম্'। কিন্তু এটি একটি অসত্য প্রচার। আমাদের দূরদর্শনেও উপনিষদের উক্তি মনে করে এটিকে মূলমন্ত্র করা হয়। আসলে ফরাসী দার্শনিক মিঃ কুঁজার উক্তি এটি। আমদানি করেছেন ঠাকুর বাড়ির জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর। [মতান্তরে : অমিতাভ চৌধুরী, দ্রঃ শারদীয় আজকাল: ১৪০৪, পৃ. ১২৪]

উপাধি ভক্তদের মনে রাখা উচিত মুসলমান ও ইংরেজ আমলে যেনতেন প্রকারে যাঁরাই পয়সা কামাতে পেরেছেন বা ধনী হয়েছেন তাঁরাই তখন ভদ্রলোক হয়ে গেছেন। লোকেশ্বর বসু লিখেছেন, "সেকালের কৌলিন্যও এভাবেই গড়ে উঠেছিল।

'দালান গোত্র পুষ্করিণী গাঞি
ইহা ছাড়া কুলীন নাই॥
যদি থাকে দুই এক ঘর
লোহার সিন্দুক আর টিনের ঘর॥'

সুদূর অতীতের কথা বাদ দিলে ইংরেজ আগমনের আগে বাঙালীর ধন দৌলতের পরিচয় বলতে কি বোঝাতো তাও এই ছড়াটির মধ্যেই পাওয়া যায়।... আগেই বলেছি ভারতবর্ষে তিন শতাধিক শ্রেণীর ব্রাহ্মণ আছে।... পাঁড়ে, দুবে, তেওয়ারী, চৌবে, সুকুল, দীক্ষিত, মিশির, পাঠক, ওঝা, বাজপেয়ী বা তার দশটি শুদ্ধ রূপ" ইত্যাদি। [পৃ. ৩৭]

'বজ্রকলম'-এর প্রথম খন্ডে জানানো হয়েছে যে, রাজত্ব ছাড়াই রাজা মহারাজা বানানো হয়েছিল কাদের। লেখকও লিখেছেন, "রাজত্বহীন রাজা মহারাজাও ইংরেজরা

বানিয়ে গেছেন। কখনও বড় জমিদার, কখনও ধনাঢ্য ব্যক্তিকে কখনও বা রাজকীয় ব্যক্তিত্ব বোঝাতো। আবার শুধুই লোকমুখে কেউ প্রিন্স হয়ে গেছেন।"

আজকের পশ্চিমবঙ্গ পূর্ববঙ্গ আসামের দিকে তাকিয়ে দেখে কেউ কি অনুমান করতে পারবেন যে, গগনচুম্বী প্রাসাদ, হোটেল, বড়বড় ফ্যাক্টরি, মিলমালিক ও কোটিকোটি টাকার পুঁজিওয়ালাদের উন্নতির উৎস মুসলমান রাজা বাদশা বা মোঘলদের সুনজর? আর পরিপূর্ণ পুষ্টিলাভ বা আঙুল ফুলিয়ে কলাগাছ বানানোর কাজটি করে গেছে ইংল্যান্ডের বৃটিশ সরকার? মোঘল ও বৃটিশদের মধ্যে মৌলিক পার্থক্য এই যে, মোঘলরা অবিভক্ত ভারতের উদ্বৃত্ত ধনসম্পদ বিদেশে পাচার করে নি। দেশের সম্পদ দেশেই রেখে নিজেরা মিশে গেছে মৃত্যুর সঙ্গে। কিন্তু বৃটিশ শুধু উদ্বৃত্ত নয়, ভারতবর্ষের অর্থনৈতিক হৃৎপিন্ড নিংড়ে ধনসম্পদ কাঁচামাল ড্রেন থিওরী পদ্ধতিতে পৌঁছে দিয়েছে তাদের স্বদেশ ইংল্যান্ডে। অন্যদিকে মোঘল শাসকদের সময়ে অমুসলমান সম্প্রদায়ের যে সব ভাগ্যবানদের বেছে নেওয়া হয়েছিল নিঃসন্দেহে তাঁরা উপকৃত হয়েছিলেন। যাঁদের নেওয়া সম্ভব হয় নি তাঁদের অর্থনৈতিক কাঠামো ভেঙে দিয়ে অর্থাৎ তাদের চাকরি কেড়ে নিয়ে বা তাদের জমির মালিকানা কলা কৌশলে ছিনিয়ে নিয়ে ঐ ভাগ্যবানদের দেওয়া হয় নি। কিন্তু বৃটিশ আমলে উন্নততম সাড়ে সাতশ বছরের রাজত্বপ্রাপ্ত মুসলিম সম্প্রদায়ের চাকরিগুলো ক্রূর কৌশলে কেড়ে নিয়ে এবং তাঁদেরকে জমির মালিকানা থেকে বঞ্চিত করে বেছে নেওয়া ভাগ্যবান দলটিকে ধনী মানী ও জ্ঞানী সম্প্রদায়ে পরিণত করা হয়। যেটা অত্যন্ত বেদনাদায়ক চিন্তার বিষয়।

লোকেশ্বর বসু লিখেছেন, "জমিদার বলতে মোঘল যুগে বোঝাতো ক্ষুদ্র অঞ্চলের শাসক, এবং তাঁরা অধিকাংশই ছিলেন মুসলমান।... কিন্তু ইংরেজ যুগে হিন্দুরা আবার জমিদার হলেন। কার্যক্ষেত্রে এঁরা কিন্তু জামিনদার। এই জমিদারী প্রথার বয়স মাত্র দেড়শো বছর। পলাশীর যুদ্ধের সময়েও কোন বিশিষ্ট বাঙালী হিন্দুর দেখা মেলে না। পরে যে বাঙালীরা কলকাতায় ছুটে এলেন, তাঁদের মধ্যে যেমন ব্রাহ্মণ কায়স্থ ছিল, তেমনি ছিল অন্যান্য জাতি। সে সময় তন্তুবায় এবং বণিকরাই ছিল ধনী।... এই সময় ইংরেজদের সঙ্গে সহযোগিতা করে ব্যবসা করে, নানাভাবে তাদের উপকার করে, দোভাষী হয়ে জাহাজ ঘাটায় মাল নামানোর কুলি সংগ্রহ করে দিয়ে অনেকেই কপাল ফেরালেন। এদের মধ্যে ধনীরা জমিদারী কিনলেন ইংরেজদের কাছ থেকে। কিন্তু সে জমিদারী আসলে খাজনা আদায়ের ঠিকাদারী। তবু দু-তিন পুরুষেই তাঁরা বনেদী বনে গেলেন। [বসু, পৃ. ৬৩]

পদবির কথা বলতে গেলে মহিলাদের সম্পর্কে বাদ দেওয়া যায় না একটা কথা। "ব্রাহ্মণরা বাংলাদেশে অন্য সমস্ত জাতিকে শূদ্র ও সংকর অভিধা দিয়ে তাঁদের স্ত্রীদের

পদবী দেন দাসী।... সেকালে কায়স্থ জাতির বিবাহিত রমণীরাও ছিলেন দাসী। পঞ্চাশ বছর আগেও বহু বিখ্যাত কায়স্থ রমণী নামের শেষে দাসী লিখতেন।... কিন্তু বর্তমানে দাসী সম্পূর্ণ লুপ্ত। এখন সকলেই দেবী।... প্রাচীন ঐতিহ্য অনুযায়ী ভূস্বামীরা নিজেদের দেব ভাবতেই অভ্যস্ত ছিলেন, অতএব জমিদার গৃহিনীরা দেবী চৌধুরানী হবেন না কেন!" [পৃ. ৭৬-৭৭]

সাহেবরা যা করে তাই আমাদের কাছে চরম ও পরম বস্তু। সাহেবদের নামের সঙ্গে অনেক পশুর নাম মিশে একাকার হয়ে গেছে। যেমন ভার্জিনিয়া উল্‌ফ। টোয়েন্টিয়েথ সেঞ্চুরি ফক্স নামক চলচ্চিত্রের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন জনৈক ফক্স। মার্চেন্ট অব ভেনিস নাটকে পোর্সিয়া এসেনিয়া ইত্যাদি নামগুলো মিষ্টি মনে হলেও পোর্সিয়া মানে শূকর আর এসেনিয়া মানে গাধা। পূর্বোক্ত শব্দ দুটির একটি উল্‌ফ মানে নেকড়েবাঘ আর দ্বিতীয়টি ফক্স অর্থাৎ খেঁকশিয়াল। কলকাতার হগ মার্কেট হগ সাহেবের নামেই হয়েছে। হগ মানে শূকর। হিন্দু পদবি 'দাস' এবং 'দাশ'-এর যেমন বানানের পার্থক্য দেখানো হয়েছে এখানেও হগের একটি 'জি'-এর বদলে দেওয়া হয়েছে দুটি 'জি'। তেমনি আমাদের দেশীয় পদবীতেও সিংহ, বাঁদুড়ী, হাতি, ঘোড়া বা ঘোড়ুই, বাঘ বা বাগ ইত্যাদি বিদ্যমান। অবশ্য ইংরেজী ঢঙে আবার রং পালটে গেছে। যেমন ঠাকুর হয়েছে Tagore। হাতি হয়েছে Hati। বাঘ থেকে Bag প্রভৃতি।

নবভারতের সূতিকাগৃহ কলকাতা

চলমান ধারণার বিরুদ্ধে কোন কিছু বলতে গেলে স্বাভাবিকভাবেই মানুষ চমকে উঠবেন। বারবার আমরা যেটা বলতে চাইছি সেটা হোল, আমাদের স্বর্ণময় ভারত যদি অর্থনৈতিক দিক থেকে ধ্বংস হয়ে থাকে এবং সাম্প্রদায়িকতার অক্টোপাস যদি ভারতবাসীকে গ্রাস করে থাকে তাহলে বলতে হয় যে, এই কর্মকাণ্ডের মূল কেন্দ্র ছিল আমাদের অবিভক্ত বঙ্গদেশ। সুতরাং বাঙালীদের অনেকেই সংযুক্ত ছিলেন ঐ বৃহত্তম ষড়যন্ত্রে। এই সাংঘাতিক তত্ত্বটি ভারতের বাঘা বাঘা বুদ্ধিজীবীরা সমর্থন করলে তাতে আর সন্দেহ থাকে না মোটেই। তাই কয়েকজন বুদ্ধিজীবীর বক্তব্য ও সমর্থনসূচক মন্তব্য তুলে দেওয়া হোল।

(ক) "এই কলকাতাকে কেন্দ্র করেই বৃটিশরা ভারতেসাম্রাজ্য স্থাপন ও বিস্তার করে। এ রাজ্য শাসনকাল শুধু বাংলার নয়, সারা ভারতের অন্ধকারের কাল। শোষণ, অত্যাচার, রক্তঝরা আর স্বজন হারাবার বেদনায় সমাকীর্ণ। আর এই ভারত-শোষণের অর্থে ইংলন্ডে হয়েছে শিল্প বিপ্লব— এই শোষিত শক্তির দাপটে ইংরেজরা বিশ্বময় এমন সাম্রাজ্য স্থাপন করেছে যেখানে সূর্য অস্ত যায় না। আর, এ বিজয়বৈজয়ন্তীর সূচনা হয়েছে জব চার্নকের কলকাতায় পদার্পণে। .কলকাতার ইতিহাস সমগ্র বাঙালীর ইতিহাস, আরও বড় করে বলা যায় গোটা ভারতের ইতিহাস।"

(খ) "পলাশীর ক্ষেত্রে ইংরেজ পক্ষের সামরিক জয়লাভের সুদূর প্রসারী ফলাফল আলোচনা প্রসঙ্গে স্যার যদুনাথ সরকারের মতো প্রবীণ ঐতিহাসিক মন্তব্য করেছেন যে, এখান থেকেই বাংলা তথা ভারতের ইতিহাসে নতুন যুগের সূচনা হয়েছিল।"

(গ) প্রচার ও অপপ্রচারের প্রধান প্রয়োজনীয় মাধ্যম সংবাদপত্র। ইংরেজরা ভারতে কোথায় প্রথম শুরু করেছিল সংবাদপত্রের মহড়া, প্রশ্ন উঠলে উত্তর আসবে— ভারতবর্ষে সংবাদপত্রের জন্ম কলকাতা শহরেই।

(ঘ) ১৬৬০ সালে কলকাতার পত্তনের কয়েক বছরের মধ্যেই এ স্থানকে ইংরেজরা চূড়ান্তভাবে বেছে নিল।

(ঙ) ইংরেজরা ব্যবসায়িক সূত্রে এদেশে এসে সর্বপ্রথম ১৭৫৩ খৃষ্টাব্দে প্লে হাউস নামে এক নাট্যশালা প্রতিষ্ঠা করে।

(চ) কলকাতার নগরে রূপান্তরণ ঔপনিবেশ বণিক স্বার্থের তাগিদেই— পরে যা সাম্রাজ্য লিপ্সায় আরও আগ্রাসী উদ্ধত হয়েছিল।

(ছ) লক্ষ্যণীয় এইটুকু, তখনকার সারা ভারতের রাজধানী কলকাতাতেই ঘটেছিল সমস্ত স্বদেশী চিন্তাচেতনা, রাজনৈতিক আন্দোলন, স্বাধীনতা আন্দোলনের সূচনা ও বিকাশ। সারা দেশের স্নায়ুকেন্দ্র কলকাতা থেকেই তা সারা দেশে ছড়িয়ে পড়েছিল। দেশী রাজশক্তি ও অন্যান্য সাম্রাজ্যলোলুপ বিদেশী শক্তির সঙ্গে ক্ষমতার লড়াইয়ের মধ্যেই বাণিজ্যের অজুহাতে ইংরাজ শক্তি যে কলকাতাকে কেন্দ্র করে ভারত উপমহাদেশ জুড়ে সাম্রাজ্যবাদ বিস্তারের পরিকল্পনা করেছিল তা ছিল দিনের আলোর মতই পরিষ্কার।

উপরোক্ত 'ক' থেকে 'ছ' পর্যন্ত কথাগুলো যাঁরা বলেছেন তাঁরা সকলেই বিখ্যাত বরণীয়, যেমন রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক শোভন সোম, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অতিথি অধ্যাপক এবং বসুমতী পত্রিকার সম্পাদক কৃষ্ণধর মহাশয়, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক প্রবীর রায়চৌধুরী, রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক দেবনারায়ণ গুপ্ত, বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ভূদেব চৌধুরী, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদের মুখ্য নির্বাহী আধিকারিকপ্রশান্ত কুমার দাশগুপ্ত, নীরদবরণ হাজরা এম.এ., পি-এইচ.ডি. প্রমুখ।

ইংল্যাণ্ডের পাঠানো বৃটিশ প্রতিনিধিরা ব্যবসার তুলাদণ্ড নিয়ে কাজ শুরু করলেও গোটা ভারতবর্ষ দখল করার কামনা বাসনা তাদের প্রত্যেকের মস্তিষ্কে ছিল। সুচতুর বিদেশী বণিকেরা একটি 'বেস্ট পয়েন্ট' খুঁজছিল। খুঁজতে খুঁজতে পেয়ে গেল তারা 'কালা আদমি'র ভারতবর্ষের বঙ্গদেশ। তারা হিসেব করে দেখেছিল সেটাই হবে তাদের বাছাই করা স্থান বা বাছাই করা ঘাঁটি যেখানকার জনসাধারণকে তারা কাজে লাগাতে পারবে যেমন খুশি তেমনভাবে। তাদের হিসেব করতে ভুল হয়নি যে, এমন জায়গা খুঁজে নিতে হবে যেখানে জলপথে যাওয়া আসা করা যাবে সহজে কারণ তখন আকাশপথের যানবাহনের আবিষ্কার হয়ে ওঠেনি। সেখানকার মানুষের সবচেয়ে বড় বৈশিষ্ট্য থাকবে যে, তাদের অধিকাংশের চরিত্র এমনই হবে যারা অর্থের জন্য এমন কোন কাজ নেই যা পারবে না। আর একটি বৈশিষ্ট্য থাকবে— তারা হবে অত্যন্ত অনুন্নত, অসভ্য ও অশিক্ষিত। আমাদের দুর্ভাগ্য না সৌভাগ্য জানিনা, এই বঙ্গ এবং বঙ্গবাসীকেই বেছে নিল তারা তাদের ক্রূর চক্রান্তের প্রেক্ষিতেই।

এই বঙ্গদেশের নাম কেন 'বঙ্গ' হোল এ নিয়ে ঐতিহাসিকেরা বহুরকমের মত পোষণ করেছেন। কিন্তু আসল সত্য আমাদের মত বাঙালীর শুনতে কটু বা রূঢ় হলেও এই যে, আমরা ছিলাম সাঁওতাল, কোল, ভীল, বাউড়ি প্রভৃতি গোষ্ঠী। তার প্রমাণে বলা যায়, আদিম সাঁওতাল ও কোল জাতির দেবতাকে বলা হয় 'বোঙ্গা' আর দেবীকে বলা হয় 'বোঙ্গী'। সারা ভারতের অন্যান্য প্রদেশের মতো গোটা বঙ্গদেশও ছিল কালো চামড়ার মানুষে ভরা। কি করে আমাদের রঙের পরিবর্তন হোল তার বিস্তারিত আলোচনা আমরা

প্রথম খণ্ডে করেছি। তার মর্ম নির্যাস হোল . মুসলমানদের রক্তে মিশেছে আরব, ইরান বা পারস্য ও আফগান প্রভৃতি সাদা চামড়া বিশিষ্ট মানুষের রক্ত। আর অমুসলমানদের রক্তে মিশেছে বিলেতী, ফরাসী ও পর্তুগীজ রক্ত। আবার একটি উদ্ধৃতি দিতে বাধ্য হচ্ছি— "বঙ্গে প্রথম সাঁওতাল, কোল, বাউড়ি, ওরাওঁ প্রভৃতি অনার্য জাতির বাস, কোল, মোঙ্গল, দ্রাবিড় আর্যের মিশ্রণে বাঙ্গালীর উৎপত্তি, বঙ্গে আর্য নিবাসের আধুনিকত্ব, আদিম সাঁওতাল, কোলদিগের দেবতা 'বঙ্গা' ও দেবী 'বঙ্গী' হইতে দেশের বঙ্গ এই নাম প্রাপ্তি। [দ্রষ্টব্য বঙ্গের বাহিরে বাঙ্গালী, পৃ. ভূমিকা ২, লেখক জ্ঞানেন্দ্রমোহন দাস, ১৯১৫-তে ছাপা। আনন্দবাজার, প্রবাসী, বঙ্গবাসী, বসুমতী, দর্শক, ভারতবর্ষ, The Pioneer, Amrita Bazar Patrika প্রভৃতি তদানীন্তন বহুদামী দামী পত্রিকা সমর্থিত এবং কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি স্যার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রশংসাপ্রাপ্ত এই বইটি।]

আর একটি কথা বলে রাখা ভাল। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়টি প্রথমে তৈরি হয়েছিল দুটি উদ্দেশ্য নিয়ে। একটি হোল সিভিলিয়ান অফিসার ও বৃটিশ বুদ্ধিজীবীদের সন্তানদের লেখাপড়ার ব্যবস্থা করা আর দ্বিতীয়টি হোল একটি প্রভুভক্ত অনুগত স্তাবকদল তৈরি করা। শান্তিনিকেতনের কোন শাখা প্রশাখা না থাকলেও বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়টি ছিল বৃটিশদের সহকারী কেন্দ্র—"শান্তিনিকেতনকে বস্তুত কলকাতার উপক্ষেত্র বলা যায়। বিশেষতঃ রবীন্দ্রকালে।" [ডঃ নীরদবরণ হাজরা : কলকাতা ইতিহাসের দিনলিপি, পৃষ্ঠা ভূমিকা ৬]

একটা প্রশ্ন মনে আসবে যে, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় তৈরি হবার আগেই বৃটিশরা এসেছিল। তাহলে তখন তাদের বা তাদের তাবেদারদের উচ্চশিক্ষার কী ব্যবস্থা ছিল? তার উত্তরে বলা যায়, কৃষ্ণনগর কলেজ ছিল সমস্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের মা। ওখান থেকেই নিজেদের লোকেদের পড়াশুনা করিয়ে সার্টিফিকেট দেওয়া হোত এবং স্তাবক ও দালাল শ্রেণীর লোকেদের উচ্চশিক্ষাও ওখানে দেওয়া হোত। একটি উদ্ধৃতি : "কৃষ্ণনগর কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা হবারও আগে। এককালে এখানে এম. এ. এবং ল'ও পড়ানো হোত।" [দ্রঃ ঐ, পৃ. ৮]

বৃটিশ দালাল, হিন্দু দালাল ও মুসলমান দালাল শ্রেণীর সৃষ্টি ও কর্ম সম্পর্কে প্রথমখণ্ডে দীর্ঘ আলোচনা করা হয়েছে। বলা হয়েছে কেমনভাবে স্যার, রায়বাহাদুর, বিদ্যাসাগর, খানবাহাদুর, রাজা-মহারাজা প্রভৃতি বেইমানি-তকমা দান করা হয়েছিল।

ভাস্কর সেতুপতি, অজিত সিং, সুঢল দেব, ঈশ্বরচন্দ্র সিংহ, ইন্দ্রচন্দ্র, সত্যানন্দ ঘোষাল, নরেন্দ্রকৃষ্ণ, প্যারীমোহন মুখার্জী, ঈশ্বরীপ্রসাদ, প্রিয়মোহন মুখার্জী, রাধাকান্তদেব, রণজিৎ সিং, কুমুদচন্দ্র সিং, সুবোধ মল্লিক, মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী, জানকীনাথ রায় প্রমুখ বৃটিশের তাবেদার কর আদায়কারী জমিদার বা জামিনদার— এঁরা সকলেই পেয়েছিলেন 'রাজা' উপাধি।

পূর্ণেন্দু নারায়ণ সিং, রামাক্ষয় চট্টোপাধ্যায়, জানকীনাথ বসু, গৌরীশঙ্কর, মধুসূদন রাও, ভূতনাথ দে, শরৎচন্দ্র সান্যাল, জীবনদাস, বল্লভ দাস, রাজেশ্বর মিত্র, কৃষ্ণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, অন্নদাপ্রসাদ সরকার, গঙ্গারাম, প্রিয়নাথ মুখোপাধ্যায়, তারাদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, দীননাথ সান্যাল, রাধানাথ দাস, গোপীমোহন, কুমার হরিনাথ নন্দী, বৈদ্যনাথ, শিবচরণ নন্দী, রাজেন্দ্রনারায়ণ দেব, রামশঙ্কর সেন, যাদবচন্দ্র ঘোষ, শরৎচন্দ্র দাস, যাদবকৃষ্ণ ঘোষ, শ্রীনাথ পাল, বৈকুণ্ঠনাথ বসু, ব্রজেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, দেবেন্দ্রনাথ রায়, নরেন্দ্রনাথ সেন, যোগেন্দ্রনারায়ণ রায়, ক্ষৌনিশ চন্দ্র, চুনীলাল বসু, দেবেন্দ্রনাথ ঘোষ, রাজেন্দ্রনাথ, দেবেন্দ্রনাথ মল্লিক, প্রমথনাথ মল্লিক, জলধর সেন, দীনেশচন্দ্র সেন, হরিসাধন দত্ত— এঁরা সব বৃটিশের পরমতর হিতৈষী বা অনুগত সাহায্যকারী; এঁরা প্রত্যেকেই উপাধি পেয়েছিলেন 'রায়বাহাদুর'।

রামাক্ষয় চট্টোপাধ্যায়

কৃষ্ণচন্দ্র ভঞ্জ, ঈশ্বরচন্দ্র সিং, কমলাকৃষ্ণ দেব, লক্ষীসর সিংহ, যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর, রামেশ্বর সিংহ, কালীকৃষ্ণ, রামচন্দ্র রায় প্রদ্যোৎ কুমার ঠাকুর, শ্রীশচন্দ্র নন্দী এঁরা সকলেই উপাধি পেয়েছিলেন 'মহারাজ'। সুঢল দেব, বিপিনকৃষ্ণ বসু, ব্রজেন্দ্রনাথ শীল, অতুলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, রাজকুমার ব্যানার্জী, প্রতুলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, তারকনাথ পালিত, নীলরতন সরকার, সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জী, শঙ্কর নায়ার, বিশ্বেশ্বর আয়ার, আর. এন. মুখার্জী, দেবপ্রসাদ সর্বাধিকারী, বদ্রীদাস গোয়েঙ্কা, রাজেন্দ্রলাল মিত্র, বিজয়চাঁদ সিংহরায় এঁরা ইংরেজি জানা সহযোগী। প্রত্যেকেই পেয়েছিলেন 'স্যার' উপাধি।

রমেশচন্দ্র দত্ত, স্যার গুরুদাস ব্যানার্জী, স্যার সি.ভি. রমন, স্যার যদুনাথ সরকার, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, স্যার দেবপ্রসাদ সর্বাধিকারী এঁরা প্রত্যেকেই 'সি. আই. ই.' অর্থাৎ Companion of the Indian Empire (ভারত সাম্রাজ্যের সহযোগী) উপাধি পেয়েছিলেন। মুসলিম বুদ্ধিজীবীদের 'স্যার', 'খানবাহাদুর', C.I.E. ইত্যাদি উপাধি পাওয়ার কথা এবং তাঁদের ইতিহাস প্রথমখণ্ডে আলোচনা করা হয়েছে।

এইসব 'স্যার' ইত্যাদি উপাধি প্রাপ্ত পণ্ডিতেরা সকলেই যে খুব পণ্ডিত ছিলেন তা নয়। এমন কিছু অপণ্ডিতও এই 'স্যারে'দের দলে ঢুকবার সুযোগ পেয়েছেন যাঁরা আসলেই মূর্খ। কিন্তু বৃটিশের বিশ্বাসভাজন হওয়া, বিশেষ করে বিপ্লবীদের দমিয়ে দেওয়া, লুকিয়ে

থাকা বিপ্লবীদের ধরিয়ে দেওয়া, অকথ্য অত্যাচার চালানো, অনাদায় কর আদায় করতে অকথ্য রোলার চালানোর বিনিময়েই হয়েছিল তাঁদের এই উপাধি। একটা উদাহরণ দিলে কথাটি তথ্যপূর্ণ হয়। মহারাজা জেনারেল স্যার প্রতাপ সিং ইংলণ্ডে গিয়ে এক সম্ভ্রান্ত বৃটিশ মহিলাকে ইংরেজিতে বলতে চেয়েছিলেন— প্রত্যেক মুহূর্তেই এই ইংলণ্ড আমার ভাল লাগছে। সুন্দর ঘাসের উপর সম্ভ্রান্ত বৃটিশ পুরুষ ও মহিলারা এই যে ঘোড়ায় চড়ে বেড়াচ্ছেন এটা আমার খুবই ভাল লাগছে। কিন্তু জেনারেল স্যার তো ইংরেজি বলতে পারতেন না, নিজের মতো করে যে ইংরেজি বলেছিলেন তা হুবহু এই— "Lekin, lady, I every time happy this England, horses gentlemen, ladies gentlemen and grass is gentlemen."

সপ্তম এডওয়ার্ডের অভিষেক উপলক্ষে দিল্লির দরবারে লর্ড কার্জন ও তাঁর স্ত্রী হাতিতে চড়ে গিয়েছিলেন। এটা বৃটিশের হিতাকাঙ্খী স্যার প্রতাপের খুব ভাল লাগেনি। তাই তিনি খুব বিনয়ের সঙ্গে ইংরেজি ঝেড়ে বলেছিলেন, "You eating knife and fork I eating knife and fork, I not knowing this knife and fork. Great Mogul he knowing how mount this elephant. You not knowing. You sitting how-dah in uniform with English lady. Great Mogul he mount properly, he dressed in white moslin and squat by himself on elephant's back. You sitting howdah, we laughing you not knowing."

এই দুটি ইংরেজি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ইংরেজি জানা ছাত্রদেরকে পড়তে দিলে তারাও হেসে গড়িয়ে পড়বে। আমি এক ঘণ্টা পর ভাত খেয়ে স্কুল যাব, এর ইংরেজি যদি কেউ এরকম লেখে— I one bell eat rice then I go school তা যেমন হবে ঠিক সেরকমের ইংরেজি হোল ঐ দুটি।

প্রথম খণ্ডে উল্লিখিত হয়েছে যে, বৌদ্ধ ও জৈন ধর্ম সাহেবদের বানিয়ে নেওয়া ইতিহাস মাত্র। যাদের বৌদ্ধ এবং জৈন বানিয়ে নেওয়া হয়েছিল তাঁরা এবং উদ্যোক্তাদের অনেকে বাঙালী ছিলেন। যেখানে ইংরেজদের রাজনৈতিক ক্ষমতা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে সেখানে ছক কষে ভবিষ্যতে প্রমাণ করার জন্য তাদের রেডিমেড ইতিহাসের ভিত্তিস্থাপন করা হয়েছে।

ভারতের সমগ্র অমুসলমানদের ইসলাম ধর্মের প্রতি স্বাভাবিক আকর্ষণ নষ্ট করে দেওয়ার জন্য বৃটিশের পরামর্শে ভারতের সহযোগীদের দ্বারা প্রচার করানো বা লেখানো হোল যে, ইসলাম ধর্ম একটা সাধারণ ধর্ম মাত্র। ভারতে বহু বড় বড় ধর্ম ছিল যেমন বৈদিক ধর্ম, হিন্দু ধর্ম, বৌদ্ধ ধর্ম, জৈন ধর্ম, বৈষ্ণব ধর্ম, বাউল ধর্ম, শৈব ধর্ম, তান্ত্রিক ধর্ম ইত্যাদি। পূর্বেই আলোচনা করা হয়েছে যে, অশোকের যেমন অস্তিত্ব ছিল না, তেমনই

জৈন বৌদ্ধ বলে কিছুই ছিল না। এসব কারসাজি আরম্ভ হয়েছে বৃটিশ আসার পর। একটি সুন্দরী মহিলাকে যেমন অশোক সাজানো হয়েছে, সেইরকম খুব লক্ষ্য করলে দেখা যাবে যে, মহাবীর এবং বুদ্ধের ছবি দুটি প্রায় একই। কিছু হিন্দুকে বেছে নিয়ে তাঁদেরকেই বৌদ্ধ এবং জৈন সাজানো হয়েছিল। তাঁরাও বৃটিশের তাবেদারি করতে নেমে পড়েছিলেন অভিনয়ে। কিন্তু ঠাকুর পূজার সনাতন মোহ ত্যাগ করতে না পেরে গণেশ লক্ষ্মী প্রভৃতি দেবদেবীর পূজা বাড়িতে ব্রাহ্মণ পুরোহিত ডেকে এনে করিয়ে নিতেন। অথচ জৈন এবং বৌদ্ধরা মূর্তি পূজার ঘোর বিরোধী এবং ঈশ্বরে অবিশ্বাসী। ঈশ্বরে অবিশ্বাসীদের কি করে ধর্মনেতা বানানো হয় সেও এক ভাববার কথা। একটি উক্তি, "জৈন ধর্ম সন্নাসীর ধর্ম। এই ধর্ম গৃহীর পক্ষে পালন করা সম্ভব নয়। এই জন্য জৈন মতাবলম্বী গৃহী হিন্দুগণ গণেশ লক্ষ্মী প্রভৃতি দেবতাকে ব্রাহ্মণ ডাকিয়া পূজা করান।... ভগবানের অস্তিত্বে জৈনগণ বিশ্বাসী নয়।" [দ্রঃ বাঙলা ও বাঙালীর ইতিহাস, প্রথম খণ্ড, ধনঞ্জয় দাস মজুমদার, পৃষ্ঠা ১২১]

যোগেশচন্দ্র রায়

হিন্দু ধর্ম থেকেই বৌদ্ধ ধর্ম তৈরি করা হয়েছে। এ সম্বন্ধে বিবেকানন্দ বলেন, "ভারতে বৌদ্ধ ধর্ম কোন আলাদা ধর্ম, তার আলাদা ধরণের মন্দির, আলাদা ধরণের পুরোহিত ছিল এমন কথা তোমরা ভেবনা। বৌদ্ধধর্ম সবসময়েই হিন্দু ধর্মের ভেতরেই।" [বিবেকানন্দ রচনা সমগ্র, নবপত্র প্রকাশন, ১৯৮৮, পৃষ্ঠা ৮৪১]

ঐতিহাসিক ভিন্সেন্ট স্মিথও অক্সফোর্ডের ইতিহাসের ৫৫ পৃষ্ঠায় লিখেছেন: "The Phrase 'Buddhist Period' found in many books is false and misleading."

আমরা সেলাই করা পোষাক মোটেই পরতে জানতাম না। কেউ ধর্মের নাম করে উলঙ্গ, কেউ অর্ধোলঙ্গ, কেউ শুধু কৌপীন পরা, খালি পা, মাথায় জটা আর বেশির ভাগ মানুষ মাথার চারিদিক মুণ্ডিত করে মাঝখানে চুলসহ টিকি রাখতেন। আশ্চর্যের কথা এটাই যে সাঁওতাল, কোল, ভিল, মুণ্ডার মত একটি জাতি বা গোষ্ঠী থেকে বাঙালীদেরকে বেছে নিয়ে সারা ভারতে তাদের ছড়িয়ে ছিটিয়ে প্রতিষ্ঠিত করে তাদের দিয়ে ভারতবাসীকে পিটিয়ে, কারাগারে দিয়ে, দ্বীপান্তরে পাঠিয়ে, ফাঁসি দিয়ে, গুলি করিয়ে ভারতবর্ষকে দাবিয়ে

নিজেদের প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠিত করে শোষণের মোটা অংশ নিয়ে চলে গেল বৃটিশ আর একটা ছোট্ট অংশ দিয়ে গেল আমাদের বাঙালীদের। পরিবর্তন হয়ে গেল আমাদের সমাজের, পরিবর্তিত হোল আমাদের পরিবেশ, পোষাক, গায়ের রং এমনকি চরিত্র পর্যন্ত অনেকখানি।

প্রথম খন্ডে আলোচনা করা হয়েছে ব্রাহ্ম ধর্ম সম্পর্কে। ওটি এমন একটি ধর্ম যেটি হিন্দু ধর্ম বিরোধী, খৃষ্টান ধর্ম-নিকটবর্তী অথচ খৃষ্টান ধর্ম নয়। প্রথমেই তৈরি করা হোল 'রাজা' উপাধিপ্রাপ্ত রামমোহনকে। তারপরেই আসরে নামানো হোল তাঁর সহধর্মী ও সহকর্মীদের। যেমন কেশবচন্দ্র সেন, প্রতাপচন্দ্র মজুমদার প্রমুখ। তাঁদের পাঠানো হোল দক্ষিণ ভারতে। প্রতাপচন্দ্রের প্রচারের প্রাবল্যে অন্ধ্রপ্রদেশ, তামিলনাড়ু ও মহারাষ্ট্রে হৈ চৈ পড়ে গেল। কিন্তু প্রতাপবাবুর মূল কর্মক্ষেত্র ছিল বোম্বাই (মুম্বই)।

বঙ্গবাসীকে দিয়ে সারা ভারতবর্ষকে বশে আনতে হলে যাদেরকে নেতা বানানো হবে তাদের কিছুটা শিক্ষিত হতেই হয়। সেইজন্য কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় তৈরি হবার আগে থেকেই বাড়িতে বাড়িতে গিয়ে বা তাদের গৃহভৃত্যের কাজ দিয়ে বা ছোট ছোট স্কুলের মাধ্যমে শিক্ষিত করার ব্যবস্থা চালু ছিল। ঐ সময়কার তথাকথিত শিক্ষিত, যারা স্কুল ফাইনাল বা ম্যাট্রিক পাশ ছিল না অথচ তাবেদারি গোলামি ও বেইমানিমূলক কাজ করতে স্বতঃস্ফূর্তভাবে সম্মত ও যোগ্য, তাদের জন্য বৃটিশ সরকার ব্যবস্থা করে ফেলল এবং ঠিক হোল যে, তারা ম্যাট্রিক পরীক্ষায় না বসেও ডিগ্রী পরীক্ষায় বসতে পারবে। [তথ্য : কলকাতা ইতিহাসের দিনলিপি, পৃ. ৭৫, ১ম খন্ড]

কৃষ্ণনগর কলেজ থেকেই এম. এ. এবং ল' পড়ানোর কথা তো আগেই বলা হয়েছে। এবার কলকাতা থেকে হুড়হুড় করে ডিগ্রী পাওয়া রেডিমেড নেতা বের হতে লাগলো। এবং তাদের ছড়িয়ে দেওয়া হোল বিভিন্ন দেশ প্রদেশে। উড়িষ্যার তখন নাম ছিল উৎকল। ১৯০১ সালে সেখানে যত বাঙালী পাঠানো হয়েছিল তার সংখ্যা দশ লাখ সাত হাজার ছশ' চল্লিশ। কর্ণেল হারকোট সাহেব গোটা উড়িষ্যা নিয়ন্ত্রণ করতে যাঁকে ডানহাত বানিয়েছিলেন তিনি হলেন বাঙালী নরেন্দ্রনাথ রায়। আর পূর্ণেন্দু নারায়ণ সিংহ বৃটিশকে খুশি করতে অসম্ভবকে সম্ভব করে পেয়েছিলেন 'রায়বাহাদুর' উপাধি।

মেদিনীপুর জেলাটিকে উড়িষ্যা থেকে টেনে এনে বাঙলার সঙ্গে জুড়ে দেওয়া হয় বাঙালীদের পরামর্শেই। পুরীর যত মঠ আছে তার মধ্যে অনেক মঠ বাঙালীদের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত। যেমন গোবর্ধন মঠ, রামানুজ মঠ, রামানন্দ মঠ, গুরুনানক ছাত্ত বা কাউলী মঠ, কবীর মঠ, মুলুকদাস মঠ, গঙ্গামাতা মঠ, জটিয়াবাবাজীর মঠ, বিদুর মঠ, রাধাকান্ত মঠ প্রভৃতি। এই বৈষ্ণব ধর্ম প্রচারের পিছনেও ছিল বিলেতি বুদ্ধি। বিজয়কৃষ্ণ নাকি বিরাট সাধক ছিলেন। [দ্রঃ ঐ, পৃ. ৪৯]

ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায়কে ডাকা হোত টি. এন. মুখার্জী বলে। লেখাপড়া বেশি জানতেন না। মাসিক পাঁচ টাকা মাইনের চৌকিদার ছিলেন। কর্মপটুতার জন্য হয়ে গেলেন উচ্চপর্যায়ের পুলিশকর্তা। মাইনে পাঁচ টাকা থেকে হয় মাসে ছশ' টাকা। স্যার উইলিয়াম হান্টার তাঁকে কৃষি ও বাণিজ্য বিভাগের উচ্চকর্মী হবার সুযোগ করে দেন। পরে কলকাতা মিউজিয়ামের সুপারিনটেনডেন্ট পদে তাঁকে অধিষ্ঠিত করা হয়। তিনি তাঁর সহোদর দাদা রঙ্গলাল বাবুর সঙ্গে সহযোগিতা করে বিশ্বকোষ সৃষ্টি করেন। বেশি লেখাপড়া না জেনে ইংরেজি পুস্তক Art Manufacture of India, Visit to Europe বইগুলো লিখে ফেললেন কি করে তাও ভাববার বিষয়।

বিজয়চন্দ্র মজুমদার

মিউজিয়াম বা যাদুঘর সম্পর্কে বলতে গেলে বলা যায়, এটিও একটি চক্রান্তাগার। প্রথম খন্ডে যে সমস্ত চক্রান্তাগারের কথা বলা হয়েছে তার দ্বারা শিক্ষিত লোকেদের প্রভাবিত করা যায়। কিন্তু নিরক্ষর ও অশিক্ষিত লোকদেরকেও সত্য ভুলিয়ে মিথ্যার দিকে আকর্ষিত করতে কিছু Practical জিনিসপত্র দেখিয়ে মানুষকে প্রভাবিত করতে ও ভুল বোঝাতে সৃষ্টি করতে হয় কলকাতার ইন্ডিয়ান মিউজিয়াম বা যাদুঘর। ১৮১৫ খ্রীষ্টাব্দে এশিয়াটিক সোসাইটির শাখা হিসাবে তৈরি হোল কলকাতা যাদুঘর। প্রস্তাবক ছিলেন ডঃ ন্যাথিয়ানেল ওয়ালিচ। প্রথমদিকে যাদুঘর বা মিউজিয়াম কী মানুষ তা বুঝতো না। চিড়িয়াখানার মতো মৃত জীবজন্তুতে সাজিয়ে আরও দর্শনীয় করা হোল। দর্শকের ভীড় হতে শুরু হোল। মানুষ বিশ্বাস করতে শিখলো পুরাতন সভ্যতার (!) কথা, নানা শিলালিপি, প্রস্তরযুগ, তাম্রযুগ ইত্যাদির কথা। ১৮৭৫-র ১ লা জুন গণনা করে দেখা হোল ১৭ ই মে থেকে ৩১ শে মে এই ১৫ দিনে যাদুঘর দেখেছিলেন ৫৮০১ জন মানুষ। ১৮৯৮-এর ৪ ঠা মার্চ দেখা গেল, ফেব্রুয়ারী মাসে ৪৬,১৬২ জন দর্শক যাদুঘর দেখেছেন। ১৮৯৯-এর মে মাসে ১৮,৪১২ জন দর্শক এসেছিলেন। ঐ বছরের অক্টোবরে যাদুঘর দেখেছেন ৪৩,২৬৪ জন। ডিসেম্বরে যান ৪৭,৮৩১ জন। ১৯০০ খৃষ্টাব্দের জানুয়ারিতে যান ৫৭,৫৯৫ জন। মার্চ মাসে ৩৩,০৫৫ জন, এপ্রিল মাসে ২৭,১২৫ জন নারী পুরুষ যাদুঘর দেখেছেন।

১৯০০ সালের ডিসেম্বরে মাত্র ২৩ দিনে ৬২,১৯৪ জন দেখেছেন, জুনে ২২ দিনে দেখেছেন ৫৩,০৭৭ জন, জুলাই মাসে ৫৭,৯০৩ জন, সেপ্টেম্বরে ৫০,৯৭৩, নভেম্বর মাসে ১১ দিনে ১৮,৪৪৮ জন, ডিসেম্বর মাসে ৫১,২৮৪ জন দেখেছেন। ১৯০২-এর জানুয়ারিতে ৫৯,১০৭ জন, মার্চে ৪২,৮২০ জন, এপ্রিলে ৩৪,৪৬৬ জন, জুলাই মাসে ৪১,৫৩৮ জন, আগস্টে৪০,৭৫৫ জন, অক্টোবরে ৪৮,৪৮১ জন, নভেম্বর মাসে ২১,৯২৭ জন এবং ডিসেম্বরে ৪১,২৪২ জন যাদুঘর দেখেন।

১৯০৩-এর জানুয়ারিতে ২১ দিনে ৫১,৩৭৮ জন আসেন। এপ্রিলে ২৯,৩৪৪, সেপ্টেম্বরে ৫০,৫৬৪ জন এবং ডিসেম্বরে ৪৬,১৬০ জন যান যাদুঘর দেখতে।

১৯০৪-এর জুনে ৪৪,৮৩০ জন, জুলাই মাসে ৫৭,৭৩০, আগস্টে ৪৯,৬৭১ জন, ঐ বছর পূজোর মাসে ১,০১,২৯১ জন, ডিসেম্বরে ৫২,২৪৭ জন দেখেন ঐ যাদুঘর।

১৯০৫-এর জানুয়ারিতে ৬৪,৩২৪, ফেব্রুয়ারিতে ২১ দিনে ৫০৬১ জন, এপ্রিলে ৩৯,৪৩৬ জন, আগস্টে৫১,৪৭৯ জন, সেপ্টেম্বরে ৫১,১৬৪, নভেম্বরে ২৬,৭০৪ এবং ডিসেম্বরে ৫৬,৩৯০ জন দর্শন করেন।

১৯০৬-এর জানুয়ারিতে ৫৮,৭৯৩, অক্টোবরে ৫৮,৮৬০, নভেম্বরে ৩১,৪৩৯, ডিসেম্বরে ৭১,০১৫ জন দেখেছেন এই যাদুঘর।

১৯০৭-এর জানুয়ারিতে ২২ দিনে ৭৮,৯১৬, জুনে ২১ দিনে ৪৬,৬০৩, ডিসেম্বরে ৫২,৬১৭ জন দেখেছেন।

১৯০৮-এর জুলাইয়ে ৪৩,৯৬৫, অক্টোবরে ৯৭,৬৯৪, ডিসেম্বরে ৩৮,১৪৮ জন দেখেছেন।

১৯০৯-এর অক্টোবরে ৮৯,০৫৪ জন দেখেছেন এই যাদুঘর।

১৯১৩-র জুলাই মাসে ৭২,৭৮০ জন দেখেছেন। ঐ বছরের সেপ্টেম্বরে ১,৫৮,০৯১ জন, নভেম্বরে ৩১,৪৬৮ জন এবং ডিসেম্বরে ৭৩,৩৪১ জন এসেছেন।

১৯১৪-র ফেব্রুয়ারিতে ৭০,৫১৫, মার্চে ৬৯,৭৮০, জুনে ৭২,০৭৪, জুলাইয়ে ৫৬,৮৩৫, সেপ্টেম্বরে ৯৯,৬৯৬ জন দেখেন ঐ যাদুঘর।

১৯১৫-র জুনে ৬৭,৪৫০ এবং জুলাইয়ে ৫৬,৯১৪ জন দেখেছেন। ১৯১৬-র জানুয়ারিতে ৭২,৯৭১, মে মাসে ২৮,০৫৩, জুলাইয়ে ৬২,৬৭৫, অক্টোবরে ১,০৪,২৩৩ জন এবং নভেম্বরে দেখেছেন ২৫,২৫৭ জন।

১৯১৭-র জানুয়ারিতে ৬৮,১৪৮, মে মাসে ৫৫,৩৬৬, জুলাইয়ে ৬০,২১৫, আগস্টে ৪৮,৯৭১ এবং ডিসেম্বরে ৮৩,০১৬ জনের আগমন ঘটেছে ঐ যাদুঘরে।

১৯১৮-র জানুয়ারিতে ৭১,৪২৬, ফেব্রুয়ারিতে ৬৭,৫৩৯ জন, মার্চে ৬৫,৯০৪, মে মাসে ২৯,৮৯২, জুলাইয়ে ৭১,০৬৮, নভেম্বরে ৪০,৬২৪ জন মানুষ দর্শন করেন যাদুঘরের।

প্রমথনাথ বসু

১৯১৯-এর জানুয়ারিতে ৭৪,৪২৬ এবং জুনে ৮০,৩০০ জন দেখেছেন কলকাতার যাদুঘর।

১৯২০-র এপ্রিলে ৬৭,১৯৬ এবং ডিসেম্বরে ৮১,৩৭৩ জন দেখেছেন ঐ মিউজিয়াম।

১৯২১-এর ফেব্রুয়ারিতে ৭৩,৯৭৪ আর সেপ্টেম্বরে ৭০,৩০৮ জন দেখেছেন কলকাতার এই যাদুঘর।

[তথ্যসূত্র : কলকাতা ইতিহাসের দিনলিপি, ডঃ নীরদবরণ হাজরা, পঃ বঃ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ]

শুধু কলকাতার যাদুঘর যদি এতো মানুষ দেখে থাকেন তাহলে সারা ভারতের অন্যান্য যাদুঘরগুলোতে প্রত্যেক বছর কি বিপুল সংখ্যক মানুষকে এই চক্রান্তের শিকার হতে হয় তা অনুমান করা যায় সহজেই।

জনসাধারণের মধ্যে যাদুঘরের প্রভাব সফল হচ্ছে দেখে বৃটিশ সরকার আরও অনেকগুলো যাদুঘর তৈরি করে ফেললো ভারতের বুকে। আজও নেহায়েত সাধারণ মানুষরা মনে করেন যে, যাদুঘর দেখা একটা তামাশা। কিন্তু তামাশা নয়, ওটা ছিল তমসাচ্ছন্ন চক্রান্ত।

প্রথম খন্ডে চক্রান্তাগারের আলোচনায় মিউজিয়াম বা যাদুঘর সম্বন্ধে আলোচনা ছিল না। মিউজিয়াম শব্দটির প্রকৃত অর্থ শিক্ষিতদের আড্ডা এবং অধ্যয়নের স্থান। বাংলায় যাদু মানে ইন্দ্রজাল, কুহক, মায়া, ভেল্কি, ভোজবাজি, বশীকরণ প্রভৃতি। অর্থাৎ মানুষকে ধোকা দিয়ে তার সঠিক বিবেক বুদ্ধির উপর আবরণ সৃষ্টি করে সত্যকে অসত্য এবং অসত্যকে সত্য বলে দেখানো বা শেখানো। এ ক্ষেত্রেও ঠিক তাই। সংবাদপত্র থেকে সঞ্চিত কিছুদিনের যাদুঘর দর্শনের খতিয়ান খুলে দেখা গেল ঐ ক'বছরে সরকারি ছুটি বা বন্ধের দিন বাদ দিয়ে মোট ৪৬,২৬,৪১৬ (ছেচল্লিশ লাখ ছাব্বিশ হাজার চারশো ষোল) জন মানুষকে যাদু বা ভেল্কি দেখানো হয়েছে।

কি করে এই রকম গুরুত্বপূর্ণ যাদুঘরের সর্বময় কর্তা হয়ে গেলেন ত্রৈলোক্য নাথ মুখোপাধ্যায়, তা অনুমান করা কঠিন নয়।

১৮৬৬-'৬৭ তে যখন উড়িষ্যায় মারাত্মক দুর্ভিক্ষ শুরু হয় তখন সরকারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ হবার সম্ভাবনায় তা নিয়ন্ত্রণ করার দায়িত্ব যাঁকে দেওয়া হয়েছিল তিনি বামাক্ষয় চট্টোপাধ্যায়। তিনি সক্ষম হয়েছিলেন কাজ উদ্ধার করতে এবং সেইসঙ্গে নিজেরও আখের গুছিয়ে নিতে। তিনিও ১৮৯৬ খৃষ্টাব্দে 'রায়বাহাদুর' উপাধিপ্রাপ্ত হন। তাঁর নিজ গ্রামে একটি দিঘি সংস্কারের নামে সরকারকে দরখাস্ত করলে, ঐ বাঙালী রায়বাহাদুরকে ৯,২০০ টাকা দেওয়া হয়; যে সময় মাসিক ১৫ টাকা রোজগার করে সাধারণ মানুষ সংসার চালাতেন।

নতুন একটি সঙ্গীতের ধারা প্রচলন করতে দায়িত্ব নিয়ে তা পালন করেছিলেন যিনি তিনি হচ্ছেন বাঙালী যোগেন্দ্রলাল চৌধুরী। এই ভাবে যোগেশচন্দ্র রায়, উপেন্দ্রনাথ মৈত্র, কালীপদ বসু প্রমুখ অধ্যাপকবৃন্দ কটক বা উড়িষ্যা গড়তে সাহায্য করেছিলেন। অধ্যাপক যোগেশবাবুকে ১৮৮৮ তে কলিকাতা মাদ্রাসা কলেজে বদলি করে বিশেষ শক্তি দেওয়া হয়েছিল। ক্রফ্‌ট্ সাহেব আবার কটকে ডেকে নিলেন তাঁকে। কারণ কটকের চক্রান্তাগারে সাহিত্য, পদার্থবিদ্যা, রসায়নে ইসলামী শব্দ বাদ দিয়ে সংস্কৃত শব্দ তৈরি করতে প্রয়োজন হয়েছিল তাঁকে। আবগারী বিভাগের জনৈক সাহেব বন্ধুর অনুরোধে বিলেতি মদ বাদ দিয়ে সস্তায় কোন দেশি মদ প্রস্তুত করার দায়িত্বও তাঁকে দেওয়া হয়। তিনি প্রথম সাদাসিধে গরীব মানুষের সর্বনাশ করতে চাল থেকে 'চুল্লু' মদ সৃষ্টি করেন। বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক প্রফুল্লচন্দ্র রায় প্রশংসা করেছেন তাঁর। তাছাড়া তিনিও ঐ সব যজ্ঞের সঙ্গে জড়িয়ে ছিলেন পূর্ণভাবে। 'স্যার' টাইটেল পেতে তাঁরও অসুবিধা হয়নি। স্যার প্রফুল্লচন্দ্র রায় যোগেশবাবুর 'শঙ্কু নির্মাণ', 'রত্নপরীক্ষা' পুস্তকের প্রশংসা করেন।

বাঙালী রাধানাথ দাসকে বর্ধমান বিভাগের স্কুল পরিদর্শকের পদ থেকে নিয়ে আসা হয়েছিল কটকে। সরকারের পক্ষ থেকে দমনকার্যে খ্যাতি লাভ করে হয়েছিলেন 'রায়বাহাদুর'। এমনিভাবে বাঙালী হরিবল্লভ বসুও সরকারের কাছ থেকে পুরস্কৃত হয়েছিলেন 'রায়বাহাদুর' হয়ে।

প্রথম খন্ডে আলোচনা হয়েছে যে, 'বেদ' 'আর্য' 'সংস্কৃত' 'পালি' 'তামিল' 'দ্রাবিড়' প্রভৃতিকে কেন্দ্র করে যে বিরাট চক্রান্ত এবং গবেষণা চলছিল তার একটা বিশেষ ঘাঁটি ছিল পুরী। পুরীর সঙ্গে নবদ্বীপের চক্রান্ত প্রক্রিয়ার যোগাযোগ ছিল নিবিড়। শ্রী জ্ঞানেন্দ্রমোহন দাস লিখেছেন, "আমি যখন কটকে যাই উড়িষ্যা যে তখন বাংলার শাসনতন্ত্রভুক্ত ছিল তাহা নহে, বাংলার প্রাদেশিক সাধনার সঙ্গেও অতি ঘনিষ্ঠভাবে সংযুক্ত ছিল ... তখন পুরী আর নবদ্বীপ 'এ ঘর ও ঘর' বলিয়া বিবেচিত হইত। সর্বদা লোক

যাতায়াত করিত ... সে সময়ের উড়িষ্যার চিন্তানায়কেরা সকলে না হউন অন্ততঃ অনেকেই বাংলা ভাষার অনুশীলন করিতেন এবং উড়িষ্যার স্কুলে অধিকাংশ স্থলে বাংলা ভাষাই শেখানো হইত।" [পৃ. ৪৫৪]

নীলমণি চক্রবর্তী

প্রসঙ্গত বলে রাখা ভালো যে, এই জ্ঞানেন্দ্রবাবুকেও কটকের কোন এক হাই স্কুলের প্রধান শিক্ষক করে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল।

মুসলমান আমল থেকে পঞ্জিকার যে ব্যবহার ছিল সেটাকে উল্টে দেবার জন্য ১৯০৪-এ বোম্বাইয়ে জ্যোতিষীদের একটি সভা হয়েছিল। তাতে যোগেশবাবু Hindu Almanac Reform (হিন্দু পঞ্জিকার সংস্কার) নামে একটি পুস্তক লিখে পাঠান। ঐ পুস্তকটিতে মুসলিম পঞ্জিকা প্রথার কবর রচনা করে পঞ্জিকার নতুন একটি রূপ দেওয়া হয়। সেটি লন্ডনের রয়াল এস্ট্রোনমিকাল সোসাইটিতে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। সেখানকার প্রভুরা অত্যন্ত খুশি হয়ে ঐ সোসাইটির সদস্য এবং আরও চারটি সোসাইটির সদস্য করে নেন তাঁকে। আর সাহেবদের গোড়াপত্তন করা বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের লাইফ মেম্বার বা আজীবন সদস্য করে নেবার আদেশ আসে। 'বাঙ্গালা ভাষা' 'বাঙ্গালা শব্দকোষ' সৃষ্টি, বিশেষ করে "বিজ্ঞানের পারিভাষিক শব্দ রচনায় যোগেশবাবু, আচার্য রায় এবং ত্রিবেদী মহাশয় প্রমুখ বিশেষজ্ঞগণের ন্যায় পরিষদ পত্রিকায় তাঁহার উদ্ভাবিত অসংখ্য শব্দ প্রকাশ করিয়া বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ লেখক এবং অনুবাদকের পথ অনেকটা সুগম করিয়া দিয়াছেন।" [পৃষ্ঠা ৬৫] বৃটিশ খুব খুশি হয়ে 'রায়সাহেব' উপাধিটিও দেয় ঐ বাঙালী বাবুকে। তাছাড়া অক্ষয়কুমার ঘোষ, যোগেন্দ্রনাথ বসু, জানকীনাথ বসু, গৌরীশঙ্কর রায় প্রভৃতি কলকাতা থেকে আমদানি হওয়া বাঙালী নেতারা কর্মরত ছিলেন ঐ উড়িষ্যায়।

গৌরীশঙ্কর রায় এবং জানকীনাথ বসু 'রায়বাহাদুর' উপাধি পেয়েছিলেন। জানকীনাথ বসুর পুত্র হচ্ছেন সুভাষচন্দ্র বসু। সুভাষবাবুকে সরকার কোন উপাধিই দেয়নি, বরং দিয়েছে কারাগারের যন্ত্রণা, লাঞ্ছনা ও প্রতারণার পুরস্কার। কষ্ট পাওয়া জেলখাটা সুভাষবাবুকে দেশের জনগণ উপাধি দিয়েছেন 'নেতাজী'।

কাশীনাথ চট্টোপাধ্যায়কে করা হোল দারোগাবাবু। তাঁর ছোট ভাই যাদব চন্দ্রকে দারোগা করে পরে পদ দেওয়া হোল ডেপুটি কালেক্টরের। তাঁরই স্বনামধন্য পুত্র বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট এবং বহু পদ ও উপাধিপ্রাপ্ত 'সাহিত্য সম্রাট'।

তখন বড় বড় জমিদার ছিলেন উপেন্দ্রনাথ রায়, মন্মথনাথ দে, যোগেন্দ্রনাথ বসু, হরেন্দ্র নারায়ণ রায়, রাধাকান্ত রায় প্রমুখ। সকলেই কলকাতার বাঙালী, কাজ করেছেন উড়িষ্যায়। চারুচন্দ্র মিত্র, মোহিনীমোহন চক্রবর্তী (ডিস্ট্রিকট ইঞ্জিনিয়র), শরচ্চন্দ্র বসু (সিভিল সার্জেন), হরিপদ সরকার (এ্যাসিস্ট্যান্ট সিভিল সার্জেন) এঁরা সকলেই উড়িষ্যায় হাজির হয়েছিলেন বাংলা থেকে। হেমেন্দ্রনাথ ঘোষাল ও তুলসীরাম ঘোষ ছিলেন অনারারী ম্যাজিস্ট্রেট। আগমন বঙ্গ থেকে।

বিজয়চন্দ্র মজুমদারকে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল বামড়ার রাজা স্যার সুঢল দেবের জ্যেষ্ঠপুত্র শচীদানন্দকে ইংরেজি পড়াবার। তিনি 'উড়িষ্যা ইন দ্য মেকিং' নামে একটি বই লিখলে সেটি লন্ডনে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। ১৯২৫ খৃষ্টাব্দে ঐ আজব বইটি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে পাঠ্য করার জন্য আশুতোষ মুখার্জীকে আদেশ দেওয়া হয়। স্যার আশুতোষ সঙ্গে সঙ্গে সেটাকে অধ্যাপনার বিষয় বলে স্বীকৃতি দিয়ে দেন।

কটকের সমস্ত স্কুলগুলোর ইন্সপেক্টর মধুসূদন রাও ছিলেন একজন 'রায়বাহাদুর' প্রাপ্ত বাঙালী নেতা।

রমেশচন্দ্র দত্ত উড়িষ্যা বিভাগের কমিশনার ছিলেন। ঐ বাঙালী সহযোগীকে সরকার C. I. E. উপাধি সেই সঙ্গে 'স্যার' উপাধিও দিয়েছিলেন।

বাঙালীর চরিত্রের অদ্ভুত চিহ্ন হিসাবে বলা যায়, সাধারণ ইংরেজি স্কুলগুলো শুধু উচ্চবর্ণের হিন্দু ছাত্রদের পড়ানোর জন্যই ছিল। আর অনান্যদের ('ছোটলোক'দের) স্কুলের নাম ছিল 'অনার্য বিদ্যালয়'—"বামড়া রজ্যে যে রাজ ইংরেজি বিদ্যালয় আছে, তথায় হিন্দু ছেলেরাই পড়িয়া থাকে। আর একটি স্কুল আছে, 'অনার্য বিদ্যালয়'। এখানে আদিম অনার্য জাতীয় ছেলেরা প্রাথমিক শিক্ষা পাইয়া থাকে। রাজ্যের সর্বত্রই এই প্রকার প্রাথমিক বিদ্যালয় বা পাঠশালা আছে।" [বঙ্গের বাহিরে বাঙালী, জ্ঞানেন্দ্র মোহন দাস, পৃ. ৮৪]

লন্ডন পাশ করা প্রমথনাথ বসু, যোগেশচন্দ্র দাস, কৃষ্ণচন্দ্র সিংহ ওরফে লালাবাবু, বিপিনবিহারী রায় প্রভৃতি বিখ্যাত বাঙালী ব্যক্তিরদেরও কর্মক্ষেত্র ছিল উৎকল বা উড়িষ্যায়। ১৯১১ খৃষ্টাব্দের একটি হিসাবে উৎকলে ১ লাখ ১৩ হাজার ভাগ্যবান বাঙালী আসেন বলে জানা যায়।

১৮৬১ খৃষ্টাব্দে লর্ড ক্যানিং বাহাদুরের সময় হতেই কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের তৈরি রেডিমেড নেতাদের হুড়হুড় করে মধ্যপ্রদেশে পাঠানো শুরু হয়। ১৮৮১ তে যখন লোক

গণনা হয়েছিল তখন দেখা গেছে নাগপুর বিভাগে ১৩৩, জব্বলপুর বিভাগে ৪৪৯, নর্মদা বিভাগে ১৮২, ছত্তিশগড় বিভাগে ১২৫৬ এবং সমগ্র মধ্যপ্রদেশে ২০২০ জন বাঙালীকে পাঠানো হয়েছিল সরকারের পক্ষ থেকে। ১৯১১-র লোকগণনায় দেখা গেল, ২৫৪০ জন বাঙালী বৃটিশ অধিকৃত মধ্যপ্রদেশ ও বেরারের অধিবাসী।

গোবিন্দচন্দ্র সেনমুন্সী

২৪ পরগণার টাকীর রামদেবের পুত্র রামকান্ত মুন্সী বড়লাট হেস্টিংস স্যার কর্ণওয়ালিশ ও স্যার জন শোরের কাছে উচ্চ পদে নিযুক্ত ছিলেন। রংপুর, দিনাজপুর, মালদহ প্রভৃতি জেলায় এমন কর্ম দেখালেন যে, "লাট হেস্টিংস বাহাদুর সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে দুইখানি তালুক, মণিমুক্তাখচিত শিরোপা, ব্যজন এবং হীরকখচিত কোষসহ তরবারি খিলাত দিয়াছিলেন।"

গোবিন্দ চন্দ্র সেন মুন্সী, ঈশ্বরচন্দ্র রায়বাহাদুর প্রভৃতি বাঙালী নেতারা ভালই আসর জমিয়েছিলেন সেখানে। এমনিভাবে গোবিন্দবাবু, শ্রীনাথ চট্টোপাধ্যায়, বীরেশ্বর দত্ত, কৈলাশ চন্দ্র ঘোষ, শ্রীনাথ হুড় বড়বড় কাজে নিয়োজিত হয়ে মুগ্ধ করেছিলেন ইংরেজ সরকারকে আর নিজেরাও লাখ লাখ টাকা রোজগার করেছিলেন। জিনিসপত্রের দর সস্তা ছিল বলে তাঁদের অবস্থা হয়ে গিয়েছিল আঙুল ফুলে কলাগাছ। মনে করিয়ে দেওয়া যেতে পারে যে, তখন এক নম্বর চালের দর ছিল এক টাকায় ২৮ সের, গরুর খাঁটি দুধ এক টাকায় চোদ্দ সের, এক নম্বর ঘি টাকায় তিন সের। একটি হিসাবে বলা যায়, প্রতিদিন পোলাও কোরমা আর ঘিয়ের খাবার খেয়ে সারামাসে তখন ছ'-সাত টাকা ব্যয় হোত মাত্র।

প্রথম স্বাধীনতা আন্দোলন বা বিকৃত নামে 'সিপাহী বিদ্রোহে'র সময় আমাদের বাঙালীরা যেভাবে ইংরেজকে রক্ষা করেছেন এবং দেশবাসীর পরিকল্পনাকে উল্টে দিয়েছেন তা বড় হৃদয় বিদারক। গোবিন্দবাবুর বৃটিশ সেবার কথা উদাহরণ স্বরূপ মনে করিয়ে দেওয়া যায় : "তিনি এই সময় ৪র্থ সংখ্যক মাদ্রাজ ক্যাভালরির কাপ্তেন সি. আর. স্টেনফোর্থকে বিপদ হইতে উদ্ধারলাভের পক্ষে যেরূপ সাহায্য করিয়াছিলেন সাহেব তাহা ভুলিতে না পারিয়া চার বৎসর পরে একখানি প্রশংসাপত্র লিখিয়া ছিলেন — "Govind Chandar Sen, ... in 1857, made himself generally useful to me during the time I

was at Sitabaldee in that year when the disturbance in the irregular cavalry was settled..."

গোবিন্দবাবু ইংরেজের এতই প্রিয়পাত্র ছিলেন যে, সিপাহী বিদ্রোহের বিপ্লবী নেতা কাদির খাঁন সহ আটশো জনের প্রাণদন্ড দেবার কথা হয়। শেষে কোর্ট মার্শাল ল' মকুব রেখে নাগপুরের রেসিডেন্ট ও সিভিল মিলিটারি কর্তা হিসাবে তাঁকেই দায়িত্ব দেওয়া হয় তিনি যা ভাল বুঝবেন তাই করবেন। "এই পত্রাদেশ অবগত হইয়া পুনর্বিচার আরম্ভ হয়।" যাঁদের ফাঁসি দেওয়া হয়েছিল তাঁদের নেতা কাদির খাঁনের জন্য বলা হয়েছে "ইঁহার শরীরে অস্ত্রাঘাত করিলে ক্ষত হইত না; কেবলমাত্র দাগ হইত এই ব্যক্তি ফাঁসি কাষ্ঠ হইতে ছয়বার দড়ি ছিঁড়িয়া ভূমিতে পড়ে। তথাপি তাহাকে সীতাবলদি হিল কোর্টের উপরে ফাঁসি দেওয়া হয়। এইরূপ করিয়া আরও ছয়জনের ফাঁসি দিয়া তাহাদের মৃতদেহ চুনপূর্ণ গর্তে ফেলিয়া ভস্ম করা হয়।"

হরিমোহন সেন, রামজীবন চক্রবর্তী, বিপিনকৃষ্ণ বসু বাহাদুর এঁরা সব সরকারের খাস ব্যক্তি ছিলেন। অবশ্য বিপিনবাবু সেজন্য স্যার, C. I. E. প্রভৃতি উপাধি পেয়েছিলেন এবং সেই সঙ্গে পেয়েছিলেন নাইট উপাধিও। যেসব নেতাদের নাম করা হয়েছে বা হচ্ছে তাঁরা বেশির ভাগই ব্রাহ্ম ধর্মাবলম্বী। তার মধ্যে দু একজন খৃষ্টধর্ম প্রকাশ্যেই গ্রহণ করেছিলেন। বেঙ্গল-নাগপুর রেলওয়ের কাজ শুরু হওয়ার পরেই তিনশো ঘর বাঙালী সেখানে উপস্থিত হন সগৌরবে। তারাদাসবাবু, ভূতনাথবাবু এবং বিহারীলাল বসু তিনজনেই প্রতিষ্ঠিত বাঙালী। ভূতনাথবাবুর সেবায় সন্তুষ্ট হয়ে সরকার তাঁকে দিয়েছিলেন 'রায়বাহাদুর' উপাধি। নাগপুর কলেজকে মনের মত করে চালাতে ও নিয়ন্ত্রণ করতে কৈলাস চন্দ্র দত্ত এবং আরও কিছু বাঙালী সহযোগী আনা হয়। তার মধ্যে একজন খৃষ্টীয় মিশনারী হেষ্টী সাহেবের সার্টিফিকেট প্রাপ্ত ব্রজেন্দ্রনাথ শীল। ব্রজেন্দ্রবাবুও পেয়েছিলেন 'স্যার' উপাধি। পরে তাঁকে মহীশূর ইউনিভার্সিটির ভাইস চ্যান্সেলর করে দেওয়া হয়। এইভাবে জ্যোতিষচন্দ্র মিত্র, মন্মথনাথ ভট্টাচার্য, রাজেশ্বর মিত্র প্রমুখ ব্যক্তিবৃন্দ কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের তৈরি করা নেতা ছিলেন।

জব্বলপুরে জল সরবরাহ, জব্বলপুর ও মান্ডালার মধ্যে রাজপথ নির্মাণ এবং ওয়াবোরা কয়লাখনির দায়িত্বে যাঁকে আনা হয়েছিল তিনি পূর্ববঙ্গীয় এবং কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত গোপালচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। ১৮৮২-তে তাঁকে আসামে বদলি করা হয়।

জ্যোতিষচন্দ্র মিত্র ব্যারিষ্টার ছিলেন। তিনিও কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত। তদানীন্তন ভাইস চ্যান্সেলর 'স্যার রিচার্ড নর্থ প্রমুখ প্রধান প্রধান রাজপুরুষদিগের ভুরি ভুরি প্রশংসা লাভ করেন।' জ্যোতিষচন্দ্র, মিঃ এল. পালিত উভয়েই কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের

প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত উপযুক্ত ব্যক্তি। জ্যোতির্ষচন্দ্র বিলেত ফেরা বাঙালী নেতা; বৃটিশকে মুগ্ধ করে 'একশত গিনির (স্বর্ণমুদ্রা) দুইটি বৃত্তি ও অন্যান্য বৃত্তিও লাভ করেন।' তিনি ছিলেন প্যারীচাঁদ মিত্রের নাতি। [দ্র: দি ইন্ডিয়ান ডেলি নিউজ, ৮.২.১৮৮৯]

বিপিনকৃষ্ণ বসুও প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত দামী নেতা হিসাবে মধ্যপ্রদেশে এসে হতে পেরেছিলেন এ্যাডিশনাল জুডিসিয়াল কমিশনার। সরকারকে খুশি করে তিনিও হয়েছিলেন 'স্যার'।

বিপিনকৃষ্ণ বসু

এইভাবে নাগপুর বিভাগ ছাড়াও ১৯১১-তে ভান্ডারায় আঠারো জন, বালাঘাট বিয়াল্লিশ এবং বরধায় পনেরো জন বাঙালীকে কলকাতা থেকে সাপ্লাই করা হয়েছিল। বালাঘাটের গভঃ স্কুলের হেডমাষ্টার এ. এল. মুখার্জী এবং সেই সঙ্গে সি. কে. চ্যাটার্জী খুব নাম কিনেছিলেন। মিঃ চ্যাটার্জী পেয়েছিলেন 'রায়বাহাদুর' উপাধি। নাগপুরে বাঙালীদের থিয়েটার এবং দুর্গাপূজোর প্রচলন করায় বেশি খুশি হয়েছিল সাহেবরা। তখনকার জব্বলপুরের যত নেতা ছিলেন সকলেই বাঙলা থেকে আমদানি করা। যেমন শ্রীনাথ বসু, নবীনচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, গিরিশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, বীরেশ্বর দত্ত, হরিপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায়, কালীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ। কালীবাবু খৃষ্টান ধর্ম গ্রহণ করেছিলেন।

অম্বিকা চরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাড়ীতেই দুর্গাপূজোর ব্যবস্থা হয়। এইভাবে বাঙলার দেবদেবীগণও সর্বভারতীয় হতে থাকেন।

আর এক বাঙালী হলেন দেবপ্রসাদ সর্বাধিকারী। প্রথম শ্রেণীর সহযোগী হওয়ায় পেয়েছিলেন 'স্যার' উপাধি। কৈলাসবাবু, জীবনচন্দ্রবাবু, শ্রীশ চন্দ্র রায় প্রভৃতি বাঙালী সহযোগীরা সরকারের কাছে নাম কিনেছিলেন। অর্থবৃদ্ধি হতে হতে সর্বশ্রেষ্ঠ ধনী ও জমিদাররূপে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিলেন গোকুল দাস। সরকারের শাসন ও শোষণে সাহায্য করে পেয়েছিলেন 'রাজা' উপাধি। সেই সময় জব্বলপুর কলেজের অধ্যাপক তড়িৎ কান্তি বক্সী বলেছিলেন, গোকুল দাসকে যদি জব্বলপুরের 'রাজা' বলা হয় তবে 'শ্রীশ বাবুকে কিংমেকার সহজেই বলা যায়'।

১৮৯৮-এ প্যারীচাঁদ মিত্র এখানে এসে বহু খনির স্বত্বাধিকারী বা মালিক হন। লন্ডন ফেরত বাঙালী মিঃ ই. দত্ত ১৯১৫-তে জব্বলপুরে আসেন এবং প্রতিষ্ঠিত হন। জীবনদাস

ও বল্লভদাস শুধু প্রতিষ্ঠিতই হননি, 'রায়বাহাদুর' উপাধিও পেয়েছিলেন। মোহনচন্দ্র স্কুল কলেজে না পড়েই কাজ চালাবার মত বিদ্যে শিখে অতিরিক্ত এ্যাসিস্ট্যান্ট কমিশনার পদ লাভ করেন। হরিদাস গোস্বামী এখানে এসে ডেপুটি পোষ্টমাষ্টার হন। উমাচরণ মুখোপাধ্যায়, সাধারণ মানুষ যাঁকে 'মামা' বলতেন, খুব গাঁজা সেবন করতেন। খুব অল্প লেখাপড়া জেনেই ডেপুটি কমিশনার অফিসে ক্লার্ক হতে পেরেছিলেন তিনি। এখানকার হাসপাতালগুলোতে বাঙালী যে সমস্ত ডাক্তার আমদানি করা হয়েছিল তাঁরা হলেন ডাঃ রাধানাথ, ডাঃ উপেন্দ্রমোহন, 'রায়বাহাদুর' উপাধিপ্রাপ্ত বিখ্যাত ডাঃ সুরেন্দ্রনাথ বরাট প্রমুখ। অধ্যাপক হিসাবে যাঁদেরকে নিয়ে আসা হয়েছিল তাঁরা বেশির ভাগই ছিলেন বাঙালী। যেমন, কৈলাসচন্দ্র দত্ত, অপূর্বচন্দ্র দত্ত, হরিধন বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ। কোর্টের উকিল যাঁরা এখানে ছিলেন তাঁদের বেশিরভাগই আগত বঙ্গদেশ থেকে। যেমন, ব্রজেন্দ্রনাথ, কুঞ্জবিহারী, শরৎ চন্দ্র মুখার্জী, পি. সি. দত্ত প্রমুখ। শরৎ চন্দ্র সান্যাল সেশন জজ ছিলেন এবং ছিলেন 'রায়বাহাদুর' প্রাপ্ত ব্যক্তি।

যাঁর হাতে দিল্লির দরবারের বন্দোবস্তের ভার দিয়েছিল ইংরেজ সরকার, তিনি হচ্ছেন গঙ্গারামবাবু। 'রায়বাহাদুর' উপাধি সহ অনেক শংসাপত্রও পেয়েছিলেন তিনি।

মধ্যপ্রদেশ গিয়ে জজ হয়েছিলেন গোবিন্দদেব মুখোপাধ্যায়। স্যার এ্যান্টনি মধ্যপ্রদেশের উন্নতি ও বিচার বিভাগের সংস্কারের জন্য একজন সুযোগ্য জজ কলকাতা হাইকোর্ট থেকে চেয়ে পাঠালে তাঁকেই পাঠানো হয়। এঁর বাবাও ছিলেন বিখ্যাত ব্যক্তি ভূদেব মুখোপাধ্যায়। যিনি ছিলেন লেখক এবং বৃটিশের পরামর্শদাতা। বৃটিশের সহযোগী বলেই পেয়েছিলেন C. I. E. উপাধি।

কিরণচন্দ্র মিত্র, অধ্যাপক তড়িৎকান্তি বক্সী, দেবেশ্বর মুখোপাধ্যায়, কৈলাসচন্দ্র দত্ত, সত্যেন্দ্রনাথ বসু, সুরেন্দ্রনাথ বরাট— মধ্যপ্রদেশ গড়ার পিছনে এঁদের অবদান ছিল যথেষ্ট। এখানে বাঙালী ছেলেদের হিন্দি ভাষা শেখাবার স্রোত এনে দিয়েছিলেন তাঁরা। ভারতের রাজভাষা যে হিন্দি হয়েছে তার প্রধান পরামর্শদাতা ছিলেন ঐ বাঙালী ভূদেবচন্দ্র মুখোপাধ্যায়।

১৯২৪-এ বাঙালীদের একটি সম্মেলন হয়েছিল রায়পুরে। তাতে কোথায় ক'ঘর বাঙালী স্থায়ী হয়েছিল তার মোটামুটি হিসাব পাওয়া গেছে। নরসিংপুরে দু'ঘর, বালাঘাটে দু'ঘর, ইটারসিতে দু'ঘর, দ্রুগে তিন ঘর, খান্ডবা ও অমরাবতীতে পাঁচ ঘর করে, সাগরে ছ'ঘর, দামোতে ও রায়গড়ে চার ঘর করে, রাজনন্দ গাঁয়ে দু'ঘর, কাটনীতে দশ ঘর, রায়পুরে ষাট ঘর, জুকেহীতে সাত ঘর, জব্বলপুরে ১৩৬ ঘর, আর নাগপুরে চারশো ঘরের বেশি বাঙালী গিয়ে ঘাঁটি গেড়েছিলেন তখন।

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ১৮৫৭-তে সৃষ্টি হয়। তার পূর্বে অল্পশিক্ষিত, অর্ধশিক্ষিত এবং প্রকৃত শিক্ষিত লোক তৈরির ব্যবস্থা নানাভাবে করা হোত। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় তৈরি হয়ে যাবার অর্থই হোল সারা ভারতবর্ষের গোলাম তৈরি করার কারখানার রূপায়ণ। স্বামী বিবেকানন্দ এটা উপলব্ধি করে তাঁর স্বভাবসিদ্ধ ভঙ্গিতেই বলেছিলেন— "কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কুড়ি বছরের বেশি হোল মেয়েদের জন্য ওর দরজা খুলে রেখেছে। আমার মনে আছে, যে বছর আমি বি. এ. পরীক্ষা পাস করি সে বছর কয়েকজন ছাত্রীও ঐ পরীক্ষা পাস করে। বিদেশী প্রবর্তিত স্কুল কলেজগুলোর উদ্দেশ্য অনেক কেরানী, পোষ্টমাষ্টার, টেলিগ্রাফ অপারেটর প্রভৃতি তৈরি করে অল্প অর্থের বদলে প্রয়োজনের উপযুক্ত একদল কাজে পটু চাকর পাওয়া। এটাই হোল শিক্ষার আসল রূপ।"

ভূতনাথ দে

[দ্রষ্টব্য বিবেকানন্দ রচনাসমগ্র, পৃ. ৬৯০]

বিবেকানন্দের এই কথা বাস্তবিকই সত্য। কারণ বাঙালী গোলাম ও চাকরদের যে বেতন দেওয়া হোত তাতে তাঁরা হঠাৎ ধনী হলেও ঐ পদে ইংরেজ যাঁরা কাজ করতেন তাঁদের বেতন ও সুযোগ সুবিধা ছিল বহু বেশি।

১৮৫৭ খৃষ্টাব্দে কলকাতা ডাকঘরের হিসাব অফিস ভেঙে তার একটা অংশ নাগপুরে নিয়ে যাওয়া হয়। সঙ্গে সঙ্গে সরকারের অনুগ্রহে পাঁচশত বাঙালীকে সেই অফিসের কাজে নাগপুরে আসতে হয়। শুধু তাই নয়, সরকার ঐ বাঙালীবাবুদের জন্য বাংলা ভাষা শেখবার স্কুলও গড়ে দেন। সেই স্কুলকে মিডল স্তর পর্যন্ত উন্নীত করা হয়। বাঙালী সহযোগী স্যার বিনয়কৃষ্ণ বসুর ভূমিকাও ছিল গুরুত্বপূর্ণ। জব্বলপুরের স্কুলগুলোতে বাঙলা শেখার ব্যবস্থা ছিল না। বাঙালীবাবুদের প্রার্থনার প্রেক্ষিতে ১৯০১ সালে সুব্যবস্থা হয়ে যায়। সেইসঙ্গে একটি উল্লেখযোগ্য বাংলা লাইব্রেরিও সৃষ্টি হয়। এর নেতৃত্বে ছিলেন কিরণকৃষ্ণ মিত্র, অধ্যাপক অপূর্ব দত্ত ও রায়বাহাদুর ডাঃ সুরেন্দ্রনাথ বরাট। মধ্যপ্রদেশের সমস্ত স্কুলে বাংলা ভাষাও অন্যতম ভাষা হিসাবে গৃহীত হোল। 'বাঙালীদের বাস হিসাবে হেড কোয়ার্টার জব্বলপুরের পরই সাগরের উল্লেখ' করতে হয়। সাগরেও হুড়হুড় করে বাঙালী কর্মী আমদানি হয়। '১৮৫৭ অব্দে এখানে সিপাহী বিদ্রোহ অতিশয়

ভীষণভাব ধারণ করিয়াছিল।' স্যার হিউরোজ বাঙালীবাবুদের সাহায্যে বিপ্লবীদের কঠিনভাবে দমন করতে পেরে খ্যাতিলাভ করেন। আদিত্যরাম ভট্টাচার্য, কুঞ্জবিহারী গুপ্ত, কালীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়, ঈশানচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, কৈলাস চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি বাঙালীবৃন্দ প্রতিষ্ঠিত হয়েছিলেন সেখানে। হরিনাথ দে, রায়বাহাদুর ভূতনাথ দে এবং রায়বাহাদুর তারাদাস বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ রেকর্ড সৃষ্টি করেছিলেন সেখানে। রায়বাহাদুর নগেন্দ্রনাথ দে খৃষ্টান হয়ে গিয়েছিলেন প্রকাশ্যেই। বাকী যেসব বাঙালীবাবুদের পরিচয় দেওয়া হোল বা হচ্ছে তাঁরা অধিকাংশই ব্রাহ্ম ধর্মের বলে পরিচয় দিতেন। মজার কথা হোল, ব্রাহ্ম বা খৃষ্টান হলেও ভিতরে ভিতরে তাঁরা অনেকেই হিন্দু ধর্মের প্রতি প্রীতি রেখে হিন্দু ধর্মীয় আচার নিজ পরিবার ও পরিবেশের মধ্যে পালন করে যেতেন।

জ্যোতিপ্রসাদ মুখার্জী, ইঞ্জিনিয়ার হরিনাথ চক্রবর্তী, নগেন্দ্রনাথ দে প্রভৃতি বাঙালী বাবুরা ছিলেন যথেষ্ট নামকরা ব্যক্তি। 'রাজা' প্যারীমোহন মুখোপাধ্যায় ১৯০০ খৃষ্টাব্দে দেশলাইয়ের যে কারখানা করেছিলেন, অল্প বেতনের রেলের সিগনালার অমৃতলাল বসু নামে এক কর্মচারী তার দায়িত্ব নেন। চাকরি ছেড়ে দিয়ে বেঙ্গল নাগপুর রেলওয়েতে কন্ট্রাকটারি করে প্রায় দু'লক্ষ টাকা উপার্জন করেন। এবং সেই সমস্ত উপার্জন এই কারখানায় নিয়োগ করেন। এইভাবে ডাঃ এল. চৌধুরী, ব্যারিষ্টার রায়বাহাদুর এইচ. মিত্র, হরিদাস চ্যাটার্জী, সত্যপ্রসন্ন মিত্র, প্যারীলাল ব্যানার্জী, কুঞ্জলাল গাঙ্গুলী, মর্তন্ডরাম মজুমদার, ডাঃ পি. এন. সেন প্রভৃতি বাঙালী ইংরেজী শিক্ষিত ব্যক্তিরা এখানে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিলেন পূর্ণভাবে।

আর এক বিখ্যাত বাঙালী হরিদাসবাবু। ইনি চিনি তৈরি ও খেজুর চাষ করে বিরাট ব্যবসায়ী হন। তাঁর ব্যবসায় একটার নাম দিয়েছিলেন হরিদাস চ্যাটার্জী এন্ড কোম্পানী। আর খেজুর ও চিনি ব্যবসার নাম দিয়েছিলেন ডেট এন্ড কেন সুগার কোম্পানী। তিনি সে বাজারের লক্ষ লক্ষ টাকার মালিক ছিলেন। স্বামী বিবেকানন্দ হরিদাসবাবুর বাড়ীতে একমাস অবস্থান করেন। স্বামীজী একমাস কী করেছিলেন কেন সেখানে ছিলেন— এ আলোচনার স্থান এটা নয়। বেটুল নামক স্থানে মারাঠী, হিন্দি, গোন্ড ও কর্কী ভাষা প্রচলিত ছিল। এখানে ১৯১১-তে ১০২ জন বাঙালী পাঠানো হয়েছিল।

বেরারে ১৯১১-তে ১৫৪ জন বাঙালী ছিলেন। জ্যোতমলে ৩২ জন বাঙালী ছিলেন। দক্ষিণ পাটনা, শোনপুর ও বামড়ায় ১৬৪ জনকে আনা হয়েছিল। রায়গড়েও ছিলেন ৪২ জন। ১৯১৬-তে ইংরেজের আদেশে নিজাম গভর্নমেন্ট রাজ্যের ধর্মগুলোর মধ্যে ব্রাহ্ম ধর্মকেও অন্তর্ভুক্ত করেন। তখন নিজাম রাজ্যভুক্ত অজন্তা গুহাগুলো বৌদ্ধধর্মের মহাতীর্থ। প্রত্নতাত্ত্বিক, চিত্রশিল্পী, ঐতিহাসিকদের সন্ধানভান্ডার ও মহামিলন স্থান এই অজন্তার

প্রচার কাজ শুরু হয়ে গেল। অসিতকুমার হালদার ও নন্দলাল বসুর মত চিত্রকর ও শিল্পীদের দু-দুবার পাঠানো হোল সেখানে। ১৯০১-এ ১৯৪ জন বাঙালী পৌঁছে গিয়েছিলেন। বাঙালীর আধিক্যে হায়দ্রাবাদের এক স্থানের নাম হয় বাঙালীগোড়া। এই গোড়া 'গড়' শব্দ থেকেই তৈরি।

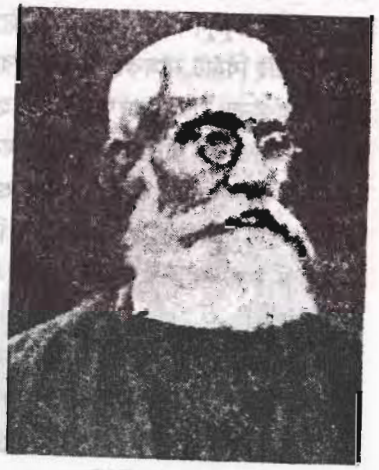

হরিদাস চট্টোপাধ্যায়

নিজাম বাহাদুরের মন্ত্রীর নাম সালারজঙ্গ। তাঁকে ইংরেজরা আগেই বশ করে ফেলেছিল। সালারজঙ্গকে এই আঁতাতে রাজী হবার জন্য দেওয়া হয় 'স্যার' উপাধি। যাঁকে দিয়ে স্যার সালারজঙ্গ বা নিজামকে প্রভাবিত করা হোত সেই বিখ্যাত বাঙালী হলেন গোবিন্দবাবু। ঝাঁসীর রাণী লক্ষ্মীবাঈ গোবিন্দবাবুকে অনেক বুঝিয়ে ছিলেন যে তিনি যেন ইংরেজবিরোধী হয়ে বিপ্লবী দলে যোগ দেন। রাণী তাঁকে ২২ ভরি সোনার গহনাও দিয়েছিলেন। শেষ সিদ্ধান্তে তিনি বলেছিলেন যে, কোম্পানীর 'নিমক খাইয়া অন্য দলে যাওয়া সঠিক হইবে না'।

আর এক বাঙালী নেতা হলেন মধুসূদনবাবু। সিপাহী বিদ্রোহের আগুন যখন দাউ দাউ করে জ্বলছিল, মধুসূদনবাবুর হাতে তখন ছিল সরকারের প্রচুর অর্থ। সিপাহী বিদ্রোহের বিপ্লবী নেতারা তাঁর বাড়ি আক্রমণ করে টাকাপয়সা নেবার চেষ্টা করলে তিনি সেসব জীবন পণ করে রক্ষা করেছিলেন এবং ছাদ থেকে লাফ দিয়ে পালিয়েছিলেন। বিপ্লবীদের ভয়ে সারাদিন লুকিয়ে রাত্রে স্ত্রীলোকের পোষাক পরে হাঁটাপথে পালিয়ে গিয়ে লর্ড গফ্ ও জেনারেল হ্যাভলকের সৈন্যদলে মিলিত হন। জেনারেল মধুসূদনবাবুকে বলেছিলেন— 'এ দুর্দিনে আপনার রাজভক্তি ও সাহস আমাদের মনে থাকবে।' অবশ্য পরে তাঁকে প্রাপ্য পুরস্কার হিসাবে ডিস্ট্রিক্ট ইঞ্জিনিয়ার পদে বহাল করেছিল সরকার। তাঁরই সহপাঠী বন্ধু মন্নুলালকে সালারজঙ্গ কর্তৃক ডেকে আনিয়ে নিজাম রাজ্যের সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের প্রিন্সিপ্যাল পদে বসানো হয়েছিল।

১৮৮৭-তে ইন্টারন্যাশনাল এগজিবিশন হয় কলকাতায়। নিজামের সপরিবারে যাওয়া এবং থাকা খাওয়ার দায়িত্ব পড়েছিল মধুসূদনবাবুর উপর। তিনি পাইকপাড়ার রাজা ইন্দ্রচন্দ্রের প্রাসাদ ভাড়া করে নিজামের থাকা খাওয়ার ব্যবস্থা করেছিলেন। ঐ উপলক্ষে

মধুসূদনবাবু হিসাব দিয়েছিলেন সে বাজারের দেড় কোটি টাকা মাত্র। 'কানপুরে তাঁহার হস্তে যখন ইংরেজ সরকারের প্রচুর অর্থ ছিল তখন জনৈক বন্ধু এবং অন্যান্য দুই একজন লোক তাঁহার হস্তে ন্যস্ত বিপুল অর্থ আত্মসাৎ করিবার ইঙ্গিত দিয়াছিলেন।' কিন্তু ইংরেজভক্ত মধুসূদনবাবু উত্তর দিয়েছিলেন, 'দাদা টাকার চেয়ে বিশ্বাসের দাম অনেক বেশি।' এই বিরাট নামকরা ইংরেজের বিশ্বস্ত বাঙালীবাবুর বাড়ীতেই '১৮৯২ অব্দে স্বামী বিবেকানন্দ হায়দ্রাবাদ আসিয়া তাঁহার বাসায় অবস্থিতি করিয়াছিলেন।' বৃটিশের ঐ রকম বিশ্বাসভাজন ব্যক্তিকে চাকরির বয়স শেষ হবার পরও চাকরিতে বহাল রাখা হয় এবং ৭৩ বছর বয়সে পেনসন পেতে শুরু করেন। বৃটিশের দালাল নিজাম বাহাদুরের কর্মচারী স্যার সালারজঙ্গের সহায়তায় নিজামের ফালকনামা প্যালেস, ফখ্‌রুল মুলকের শৈলাবাস, চারমিনারের নবশ্রী ও মুসী নদীর উপর প্রশস্ত সেতু তৈরিতে তাঁর ইতিহাস মিশে আছে।

সরোজিনী নাইডুর বাবা ডাঃ অঘোরনাথ চট্টোপাধ্যায়। ঐ বিলেত ফেরা বাঙালীকে মধুসূদনবাবুর পরামর্শে সালারজঙ্গের সহায়তায় হায়দ্রাবাদ রাজ্যে শিক্ষার উন্নতি করার জন্য নিযুক্ত করা হয়েছিল। অঘোরনাথের আদি নিবাস বর্ধমান জেলার পাটুলী গ্রাম।

ডাঃ নিশিকান্ত চ্যাটার্জী বিলেত থেকে ফিরে এসে ইংরেজের সুদৃষ্টিতে পড়ার ফলে ১৮৮৩-র ২২শে ফেব্রুয়ারি যখন কলকাতায় ফেরেন তখন তাঁকে সম্মান জানানোর ব্যবস্থা করা হয়। অভ্যর্থনার দায়িত্বে যাঁরা ছিলেন তাঁরা হলেন আনন্দমোহন বসু, রজনী রায়, রাজেন্দ্রলাল মিত্র, রেভারেন্ড কৃষ্ণমোহন ব্যানার্জী, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জী, ব্রাহ্ম নেতা কেশব সেন ও জোড়াসাঁকোর ঠাকুর পরিবারের অনেকে। ডাঃ পি. কে. রায়ের বাড়িতে তাঁর থাকার ব্যবস্থা করা হয়। ঢাকা থেকেও ইংরেজ প্রেমিকরা অনেকে এসেছিলেন। সেখানে ইংরেজি ও দেশীয় গান বাজনা ও নানারকম খানাপিনা সেইসঙ্গে থিয়েটারের গান এমন জাঁকজমকের সঙ্গে হয়েছিল যে ইংরেজ জজ্ মিঃ ব্রাট স্বয়ং বাজনার তালে তালে নেচেছিলেন।

নিশিকান্তবাবু দশটি ভাষায় পন্ডিত ছিলেন। লর্ড রিপন বাহাদুর তাঁকে পররাষ্ট্র বিভাগে খুব বড় পদ দেবার জন্য স্টেট্ সেক্রেটারিকে পত্র লিখে পাঠিয়েছিলেন। সেই সময় ইংরেজ বিরোধী বিপ্লবী মাওলানা চেরাগ আলির একটি উর্দু বইয়ের ইংরেজিতে অনুবাদ করে দিয়েছিলেন এবং তাঁর সংগৃহীত তথ্যভান্ডার থেকে কিছু তথ্যও সরবরাহ করে বইটিতে যোগ করেছিলেন তিনি। অনুবাদের পর নাম হয় A Histoary of Zageers। এই কথা প্রকাশ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তাঁর কাজে জবাব হয়। তাঁর সমস্ত উন্নতির মই কেড়ে নেওয়া হয়। সবচেয়ে আশ্চর্যের কথা হোল, এত বড় একটা পান্ডিত্যের স্বীকৃতি

এবং তাঁর ইতিহাস দেশীয় বাবুরা কিভাবে ভুলে গেলেন? যদি বৃটিশের ভয়েই তা হয়েছিল মনে করা যায় তাহলে দেশ স্বাধীন হবার পরে কাগজের উপর সামান্য কালি ছড়িয়েও কি নিশিকান্তবাবুকেঅমর করা যেত না?

ত্রৈলোক্যনাথ শীল, নন্দলাল শীল, সিদ্ধমোহন মিত্র প্রভৃতি বাঙালী বাবুরা হায়দ্রাবাদে সুপ্রসিদ্ধ হয়েছিলেন। ভাগ্যবান সিদ্ধমোহন মিত্র আরবী ফারসী বই-এর উদ্ধৃতি দিয়ে কোরআন হাদীসের অংশ যোগবিয়োগ করে মুসলমানদের গো হত্যার বিরুদ্ধে একটি গ্রন্থ তৈরি করেন। ভারতে হিন্দু মুসলমানের ভবিষ্যৎ লড়াইয়ে কাজে লাগবে বলেই হয়তো বিলেতে সেটির প্রশংসা হয় এবং রয়াল এশিয়াটিক সোসাইটিতে স্থান পায়।

মধুসূদন চট্টোপাধ্যায়

ডাঃ বরোদাচরণ মিত্র, এস. কে. মুখার্জী, কালীদাস দত্ত, কালীচরণ চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতি বাঙালীরা হায়দ্রাবাদের বিখ্যাত বাবু ছিলেন। এইভাবে বোম্বাই এবং গোয়াতেও প্রচুর পরিমাণে বাঙালী সহযোগীদের পাঠানো হয়েছিল।

মারাঠী লুন্ঠনকারী অখ্যাত শিবাজীকে বিখ্যাত করার গোড়াপত্তন যিনি করেছিলেন তিনি বাঙালী পন্ডিত সত্যচরণ শাস্ত্রী। বাঙলার দেবদেবীগণ বাঙালীদের সঙ্গেই ছড়িয়ে পড়তে থাকেন। ষষ্ঠী এবং দুর্গাপূজো বাঙালীদের মাধ্যমেই মহারাষ্ট্রে পৌঁছেছে।

ইংরেজরা ভারতে সর্বপ্রথম কুঠী স্থাপন করে সুরাটে। ধর্মানন্দবাবু যখন সুরাটে উপস্থিত হন তখন তিনি বলেন, "পবিত্র মন্দিরের দ্বারদেশে গিয়া দেখিলাম কেহ প্রণাম করিতেছে কেহ হাতজোড় করিয়া দন্ডায়মান আছে। কেহ পুষ্প নিক্ষেপ করিতেছে, কেহ স্তোত্র আবৃত্তি করিতেছে, কেহ নাচিতেছে কেহ গাহিতেছে ইত্যাদি। ... ইত্যবসরে উঁকি মারিয়া দেখিলাম একটি গৃহে শ্রী গৌরাঙ্গের এবং আর একটি গৃহে শ্রীকৃষ্ণ-রাধিকার যুগল মূর্তি বর্তমান। দুইটি মূর্তি অতীব মনমোহন। মহাপ্রভুর মূর্তির সম্মুখে অনেকগুলি হস্তলিখিত গ্রন্থ বস্ত্রাচ্ছাদিত হইয়া রক্ষিত আছে; একখানি বড় পুস্তকের আবরণের উপরে বাঙ্গালা ভাষায় বড় বড় অক্ষরে 'ভক্তমাল' এবং আর একখানি অনতিবৃহৎ গ্রন্থের কাপড়ে 'শ্রী চৈতন্যমঙ্গল'— এই কথাগুলি লেখা আছে। গুজরাট মন্দিরে বাঙ্গালাগ্রন্থ ও বাঙ্গ

লা অক্ষর দেখিয়া অত্যন্ত বিস্ময়ান্বিত হইলাম। ... একজন হিন্দুস্থানী বৈষ্ণব কহিলেন, মহাশয়! যাঁহার চরণ কৃপায় জগাই মাধাই উদ্ধার হইয়াছিল সেই করুণানিধি শ্রীশ্রী গৌরচন্দ্রের এই মন্দির এবং এই সম্পত্তি। সম্মুখস্থ উদ্যানটিও তাঁহার। এই মন্দির একটি বাঙালী বৈষ্ণবীর আশ্চর্য কীর্তি।" [তথ্য, ঐ, পৃ. ২১৭] অতএব ব্রাহ্ম, বৈষ্ণব, বৌদ্ধ, জৈন প্রভৃতি ধর্ম ও মতবাদের গোড়ায় বাঙালীবাবুদের ভূমিকা এক দুর্বোধ্য বিস্ময়।

বোম্বাইয়ের বিখ্যাত হিন্দু ধর্মপ্রচারক হিসেবে যাঁর খুব নামডাক তিনি হচ্ছেন শ্রী বিশ্বরূপ। তিনিও বাঙালী এবং বাঙালী শ্রী গৌরাঙ্গর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা। গুজরাটে একটি মন্দিরের নাম 'গৌড়ীয় গদি'। কেউ কেউ এটাকে 'মাঈজী কা আখড়া' বলে থাকেন। এ সবই বাঙালী বাবুদের কীর্তি।

১৮১৮ খৃষ্টাব্দে সুরাট ইংরেজের হাতের মুঠোয় আসে। "তখন হইতে চাকরী সূত্রে এখানের বাঙালীর প্রবাসবাসের সূত্রপাত হইয়াছে। মধ্যে মধ্যে চিকিৎসা, বিচার ও পূর্তাদি বিভাগে বিশিষ্ট উচ্চপদস্থ বাঙালীরও আবির্ভাব হইয়া থাকে। তন্মধ্যে বাবু ভূতনাথ চক্রবর্তীর নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।"

এইভাবে কালদগী, আহমেদাবাদ, ভরোচ, সুরাট, হায়দ্রাবাদ, নাসিক, ধারবার ও পুনা প্রভৃতি স্থানে বাঙালীরা এসে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিলেন ইংরেজের সহায়তায়।

পন্ডিতরা বলেন "শূর্পনখার নাসাচ্ছেদন হইতে স্থানের নাম নাসিক।" টলেমি তাঁর ভূগোলে নাসিকের উল্লেখ করেছিলেন। "কথিত আছে সত্যযুগে ইহার নাম ছিল পদ্মনগর। ত্রেতায় ছিল ত্রিকন্টক। দ্বাপরে জনস্থান এবং কলিতে নাসিক। বাল্মিকীর রামায়ণে অবশ্যই জনস্থানই বর্ণিত হইয়াছে।" আধুনিক গবেষকদের অনেকে মনে করেন এই সব ধর্মীয় কাহিনী বাঙালী বাবুদের দ্বারা বাঙলার বাইরেই ইংরেজের সহায়তায় বিশেষ পরিকল্পনায় প্রস্তুত হয়েছে।

নাসিক থেকে ত্রিশ মাইল উত্তরে কালিকাতীর্থ আশ্রমের তীর্থস্থান বলে সুনাম আছে। সেটির উদ্যোক্তা ও প্রতিষ্ঠাতার নাম গৌরস্বামী। তিনিও বাঙালী। আহমাদনগরে প্রতি বৎসর জুন মাসে যাঁকে কেন্দ্র করে মেলা বসে সেই সাধু বা সন্ন্যাসী 'বাবা বাঙালী'র নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তিনিও বাঙালী।

"সেন্সস রিপোর্ট হইতে জানা যায়, বোম্বাই প্রদেশের রাজধানী ও বাণিজ্য স্থানগুলিতেই অধিক বাঙালীর বাস।" ১৯১৫ খৃষ্টাব্দের যে তথ্য জ্ঞানেন্দ্রমোহন দাস তাঁর পুস্তকে দিয়েছেন তাতে দেখা যাচ্ছে ১৭১৯ জন বাঙালীকে সেখানে পাঠানো হয়েছিল। ১৮৮১-তে ৬৩৪ জন বাঙালী ছিলেন সেখানে। ঐ সময় "পশ্চিম কর্নাট বিভাগে একজন, দাক্ষিণাত্য বিভাগে তিনজন, কোঙ্কন বিভাগে আট জন, গুর্জর বিভাগে সতেরো জন, সিন্ধু

বিভাগে সাতষট্টি জন এবং বোম্বাই শহরে পাঁচশত আটত্রিশ জন বাঙালী বাস করিতেছিলেন।"

সরকারের চোখে কাজের লোক হিসাবে বাঙালী তৈরি করার কারখানা ছিল কলকাতাতেই। যেমন সংস্কৃত কলেজ, হেয়ার স্কুল, এ্যাঙ্গলো হিন্দু স্কুল, হিন্দু স্কুল, হিন্দু মেট্রপলিটন কলেজ, হিন্দু বেনেভোলেন্ট ইনস্টিটিউশন প্রভৃতি। ঐ সমস্ত স্কুল কলেজের বেশিরভাগই বর্তমান, হয় পুরনো নামে অথবা নাম পরিবর্তন করে। আর কৃষ্ণনগর কলেজের কথা তো আগেই বলা হয়েছে। এবার একটি উদ্ধৃতি : "যখন বোম্বাইয়ের জনসাধারণের মধ্যে ইংরেজী শিক্ষা প্রচলনের পরামর্শ চলিতেছিল, তখন বঙ্গদেশে মহাত্মা ডেবিড্ হেয়ার, ডি. এল. রিচার্ডসন ও ডিরোজিওর শিষ্যমন্ডলী শিক্ষা সমাপ্ত করিয়া কর্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন।

ডা. অঘোরনাথ চট্টোপাধ্যায়

তখন হেয়ার স্কুল ও হিন্দু কলেজ হইতে বাঙালী ছাত্রগণ গবর্নমেন্ট কর্তৃক সাদরে গৃহীত হইয়া নানা বিভাগীয় কর্মে ও দূরদূরান্তে প্রেরিত হইতেছিলেন।" এমনকি যে বছর বঙ্গে কমিটি অব পাবলিক ইনস্ট্রাকশান স্থাপিত হয় সেই বছর অর্থাৎ ১৮২৩ সালে বোম্বাইয়ের গভর্নর মাননীয় মিঃ এলফিনস্টোন ১৩ই ডিসেম্বর তারিখের মিনিটে যা লেখেন তা হোল, "A great deal appears to have been performed by the Education Society in Bengal, and it may be expected that the same effects should be produced by the same means at this residency. But the number of Europeans here is so small and our connection with the Natives so recent, that much greater exertions are requisite on this side of India than on the other."

[দ্র: History of English Education in India by Syed Mahmood, 1895, p. 36]

অমৃতলাল চক্রবর্তী সম্পাদক ছিলেন শ্রী বেঙ্কটেশ্বর সমাচারের। তিনিও বাঙালী। সিন্ধুতে আগত স্বামী ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়, নন্দলাল সেন দুজনেই বাঙালী। বোম্বাই

প্রবাসী অশোক কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় সংবাদপত্রে লিখেছিলেন, 'আমরা বোধহয় তিনশতের উপর বা আরও অধিক বাঙালী এখানে আছি।" ওখানে কালীপূজো করার জন্য কালীবাটী প্রতিষ্ঠা এবং পূজোর দিনে সমস্ত বাঙালী একজায়গায় একত্রিত হওয়ার ব্যবস্থা করেছিলেন তাঁরা। মণিমাণিক্যের ও বাদ্যযন্ত্রের বিখ্যাত দোকান যাঁর ছিল তিনি বাঙালী অক্ষয় কুমার মিত্র। তাছাড়া বোম্বাইয়ের প্রখ্যাত মণিমাণিক্য ব্যবসায়ী এবং অলঙ্কার নির্মাতা চন্দ্রকুমার দাসও বাঙালী। বাঙালী বিশ্বনাথ চট্টোপাধ্যায় মোতিবাজারে মূল্যবান পাথর ও গহনার বিরাট দোকান করেছিলেন। কল্লোদেবী রোডের বসু কোম্পানী, এসপ্লানেড রোডের মজুমদার কোম্পানী ও গ্রান্ড রোডের দত্ত কোম্পানী ইত্যাদি সবই আগত বাঙালীদের প্রতিষ্ঠান।

বোম্বাইয়ের জনসাধারণকে নিয়ন্ত্রিত করতে সরকারের অনুগত অথবা কড়াহাতে শায়েস্তা করতে অনেক নিষ্ঠুর বিলেতি সিভিলিয়ান সাহেব আমদানি করতে হোত। কিন্তু এত সাহেব সিভিলিয়ান পাওয়া যাবে কোথায়? তাই ভারতবর্ষের প্রথম বাঙালী সিভিলিয়ান তৈরি করা হোল যাঁকে তিনি ঠাকুর পরিবারের কবি রবীন্দ্রনাথের ভাই সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর। "ব্রহ্মানন্দ কেশব চন্দ্র সেন যে বৎসর বোম্বাই প্রদেশে ব্রাহ্মধর্মের বীজ বপন করিয়া যান, সেই বৎসরেই ভারতের সর্বপ্রথম সিভিলিয়ান মিঃ সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর এখানকার বিচারক পদে বৃত হইয়া আগমন করেন এবং ইহার অব্যবহিত পরেই স্বনামখ্যাত বাগ্মী প্রতাপচন্দ্র মজুমদার মহাশয় ধর্মপ্রচারে বহির্গত হইয়া এ প্রদেশে ব্রাহ্মমন্দিরের ভিত্তিশিলা নিহিত করেন। তাহার ফলে আহমেদাবাদে ব্রাহ্মসমাজ, সাতারায় য়ুনিয়ন ক্লাব, জ্ঞানসমাজ, ১৮৬৭ অব্দে বোম্বাইয়ে প্রার্থনা সমাজ ও রামমোহন আশ্রম এবং হায়দ্রাবাদ প্রভৃতি স্থানে ব্রাহ্ম সমাজ প্রতিষ্ঠিত হয়। প্রার্থনা সমাজ মহামতি রাণাডে কর্তৃক স্থাপিত হইলেও ইহার প্রথম আচার্য ছিলেন বাঙালী।"

অনেক বাঙালীর নাম উল্লেখ করা হোল এবং হচ্ছে। কিন্তু এঁরা বেশিরভাগই হিন্দুধর্ম ত্যাগী ব্রাহ্ম ধর্মাবলম্বী। ব্রাহ্ম ও হিন্দু ধর্মের পার্থক্যের সবিশেষ আলোচনা প্রথম খণ্ডে করা হয়েছে।

অপ্রিয় তিক্ত কথা হলেও সত্য যে, আমাদের গোটা বঙ্গদেশে মহিলারা যে পোষাক পরতেন তা ভদ্রসমাজের উপযুক্ত ছিলনা। সত্যেন্দ্রনাথের স্ত্রী জ্ঞানদানন্দিনী প্রথম মহিলা যিনি তাঁর স্বামীর সঙ্গে সমুদ্র পার হয়ে ইংলন্ড গিয়েছিলেন, তিনি পার্শী রমণীদের শাড়ী ও পোষাক পরিচ্ছদ দেখে বঙ্গের মহিলাদের জন্য নতুন পোষাকের উদ্ভাবন করেন। পার্শী জাতি এসেছিল পারস্য বা মুসলিম রাষ্ট্র ইরান থেকে। সুতরাং ইসলাম ধর্মের প্রভাব তাদের উপর পড়েছিল বলেই উলঙ্গ অর্ধোলঙ্গ পোষাক তাদের ভূষণ ছিলনা।

তাদের শাড়ীর সঙ্গে ব্লাউজ, অন্তর্বাস, সায়া, জুতো এবং মোজা পরার রীতি ছিল। শ্রী দাসও লিখেছেন, "পার্শী রমণীদের সুবেশ দর্শনে বঙ্গমহিলার পরিচ্ছদের প্রতি তাঁহার দৃষ্টি পতিত হইল। সুতরাং পার্শী শাড়ীর সংস্করণ করিয়া তাঁহার (সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের) স্ত্রী এক নূতন পরিচ্ছদের উদ্ভাবন করিলেন। এবং তদবধি এই রীতি বঙ্গমহিলার আদর্শ পরিচ্ছদ বলিয়া গৃহীত হইল।" ব্রাহ্মধর্মাবলম্বী সিভিলিয়ান সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর বলেছিলেন, "আমি তো বোম্বাইকেই নিজের দেশ মনে করি। এদেশ আমার হাড়ে মাসে জড়িত।"

ডা. নিশিকান্ত চট্টোপাধ্যায়

চারুচন্দ্র দত্ত, মেজর বি. ডি. বসু, জ্যোৎস্নানাথ ঘোষাল (C. I. E.), ডাঃ ডি. এল. রায়, পঞ্চানন বন্দ্যোপাধ্যায়, শিশির মৈত্র প্রভৃতি ইংরেজী শিক্ষিতরা সকলেই ছিলেন বাঙালী। বিখ্যাত ব্যক্তি অধ্যাপক বি. কে. মুখার্জী স্বেচ্ছায় খৃষ্টান হয়ে গিয়েছিলেন।

বোম্বাইয়ে যাঁরা পত্র পত্রিকার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন তাঁরা হলেন সতীশ চন্দ্র সেন, এন. আর. ভট্টাচার্য, অমৃতলাল চক্রবর্তী প্রভৃতি নামকরা প্রবাসী বাঙালী। পুনার একটি হোস্টেলের নামই ছিল 'পুনা বাঙালী ছাত্র নিবাস'। ধরণীধর দাস মোরাদাবাদে আর দীননাথ হাজরা জব্বলপুরে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিলেন। ক্ষেত্রমোহন ঘোষ, ভবধর চট্টোপাধ্যায়, জ্যোতিন্দ্রনাথ বসু, বনমালী দাস, চন্দ্রকুমার সরকার, স্যার রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ বাঙালী প্রবাসী ছিলেন পুনায়। বনবিভাগের ডিভিশনাল অফিসার হয়ে আসেন হরিপদ মিত্র। তিনি ছিলেন ধনী এবং মানী ব্যক্তি। স্বামী বিবেকানন্দ আমেরিকা যাবার পূর্বে বহুদিন যাবৎ তাঁর বাড়ীতে ছিলেন। কী করছিলেন, কেন ছিলেন সে আলোচনা এখানে নিষ্প্রয়োজন।

১৭৯৯ খৃষ্টাব্দে মহীশূর যুদ্ধে হায়দার আলির পুত্র টিপু সুলতান নিহত হবার পরই মহীশূর বৃটিশের হাতে আসতে শুরু হয় আর তখন থেকেই সেখানে বাঙালী আমদানিরও ব্যবস্থা হয়— ইউরোপীয় আদর্শকে কেন্দ্র করে মহীশূরে একটি বিশ্ববিদ্যালয় হয়। তবুও আগত বাঙালীরা তাদের কাজকর্ম, চালচলন ও পোষাক পরিচ্ছদে বাঙালীত্ব বজায় রাখতে পেরেছিলেন— "ডাক্তার স্যার রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর কিছুদিন মহীশূর প্রবাসে থাকিয়া এ

বিষয়ে বিশেষভাবে লক্ষ্য করিয়াছিলেন। তিনি ১৩২৬ সালের বৈশাখে শান্তিনিকেতনে নববর্ষের উপদেশ প্রসঙ্গে মহীশূর সম্বন্ধে তাই বলিয়াছেন ... ভারতলক্ষ্মী যে মৈসুর হইতে বিদায় লইয়া যান নাই তাহার প্রধান কারণ, দুই তিন পুরুষ ধরিয়া এখানকার রাজারা দেশী শিক্ষা পাইয়া আসিয়াছেন। স্যার শেষাদ্রি আয়ারের মত মন্ত্রী ও শিক্ষকের হাতে ইঁহারা মানুষ হইয়াছেন।''

জ্ঞানশরণ চক্রবর্তী ছিলেন সুযোগ্য বাঙালী দেওয়ান বাহাদুর। অধ্যাপিকা কুমুদিনী খাস্তগীর মহীশূরের প্রবাসিনী হন সরকারের ইঙ্গিতেই। মাদ্রাজের অবসরপ্রাপ্ত একাউন্ট্যান্ট জেনারেল কৃষ্ণলাল দত্তকে বিশেষ গোপন কাজের জন্য কলকাতা থেকে মহীশূরে আনানো হয়েছিল। ''কৃষ্ণলাল দত্ত মহাশয় কিছুদিনের জন্য মৈসুর দরবারের কোন বিশেষ কার্যের ভার লইয়া তথায় অবস্থিতি করিয়াছিলেন। এবং কার্য সুসম্পন্ন করিয়া প্রশংসার্জন করিয়াছিলেন।''

ব্রজেন্দ্রনাথ শীল পদ পেয়েছিলেন মহীশূর বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলরের। 'রাজতন্ত্রপ্রবীণ' এবং 'স্যার' উপাধিও পেয়েছিলেন তিনি। ডঃ রাধাকুমুদ মুখোপাধ্যায়ও একজন নামকরা আগত বাঙালী। রামকৃষ্ণ মিশনের সন্ন্যাসীদের প্রতিষ্ঠিত মঠ সাধনাশ্রম সেবা সমিতি উল্লেখযোগ্য। এগুলোর প্রবর্তক স্বামী বিবেকানন্দই। মহীশূরের জেলে বন্দীদের ধর্মকথা শেখাবার দায়িত্ব দিয়ে যাঁকে নির্বাচন করা হয়েছিল তিনি বাঙালী সোমানন্দ স্বামী।

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়া শশিপদ বন্দ্যোপাধ্যায়ের পুত্র এলবিয়ন ব্যানার্জী খৃষ্টান হয়ে গিয়েছিলেন। অবশ্য সরকার থেকে নানা পুরস্কারে পুরস্কৃত হয়ে 'টাইগার ইন দ্য সার্ভিস' এবং 'স্যার' উপাধি পেয়েছিলেন। কিছুদিন ইউরোপ ভ্রমণ করে এসে কাশ্মীরের প্রধানমন্ত্রিত্ব দেওয়া হয়েছিল স্যার এলবিয়নকে। বাঙ্গালোরে মাদ্রাজ হতে স্বামী রামকৃষ্ণানন্দকে পাঠানো হয় একটি কেন্দ্র স্থাপনের জন্য। সেইসঙ্গে সৃষ্টি হয় বেদান্ত সভা। পরে সেটার ভার পেয়েছিলেন স্বামী আত্মানন্দ ও স্বামী বিমলানন্দ। তারপর স্বামী বোধানন্দ এসে দায়িত্ব নিলে এবং পরে আমেরিকা গেলে স্বামী আত্মানন্দ আবার কার্যভার নেন। ১৯০৬ খৃষ্টাব্দে স্বামী অভেদানন্দ বাঙ্গালোরে এসে ভিত্তি স্থাপন করেন মঠের।

মহীশূরে রামকৃষ্ণ মিশনের পক্ষ থেকে একটি টেম্পল তৈরি করে তার ভিতরে রামকৃষ্ণ ও বিবেকানন্দের চিত্তাকর্ষক মূর্তি স্থাপন করা হয়। আর সেখানে প্রত্যেক রবিবারে রামনাম কীর্তনের ব্যবস্থা চালু হয়। এই রামনাম কীর্তন দাক্ষিণাত্যের বহু স্থানে প্রচারিত ও প্রচলিত হয়েছিল।

বৈজ্ঞানিক ও প্রত্নতাত্ত্বিক গবেষণার উদ্দেশ্যে বাঙালী মনমোহন গাঙ্গুলী এই মঠে এসে পৌঁছেছিলেন। ওখানে উল্লেখযোগ্য নেতৃত্বে ছিলেন স্বামী বিশুদ্ধানন্দ। তিনি

প্রখ্যাত চিত্রশিল্পী ও সঙ্গীতজ্ঞ। মাদ্রাজে বিবেকানন্দ মেমোরিয়াল হোম বাঙালীদেরই কীর্তি। মহীশূর বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলর ইংরেজের প্রাচ্য বিষয়ক গবেষণার একজন সহযোগী ছিলেন। বৃটিশ মিউজিয়ামে বহু বইপুস্তক হস্তলিপির আকারেই ছিল; ১৯১০ পর্যন্ত সেগুলো ছাপা হয়নি। এসবই শীল মশাই জানতেন। ১৯১১-তে যখন লন্ডনে 'ইউনিভার্সাল রেসেস কংগ্রেস' অনুষ্ঠিত হয়, তার সভাপতি হয়েছিলেন বাঙালী স্যার ব্রজেন্দ্রনাথ শীল। 'প্রাচীন হিন্দুদের বৈজ্ঞানিক জ্ঞান ছিল'— এর উপর একটি আজগুবি তত্ত্ব ও তথ্যে সাজানো পুস্তক লিখে বৃটিশকে মুগ্ধ করেছিলেন তিনি। বিশ্ববিদ্যালয় সরকারের কেমনভাবে কি কি কাজে লাগতে পারে, শুধু শিক্ষার প্রচার ও প্রসারই নয়, শাসন শোষণে বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূমিকা কী, তা প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে প্রয়োগ করে ও করিয়ে সরকারের কাছে প্রমাণ করতে পেরেছিলেন তিনি। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়টি আশুতোষ মুখার্জীর তত্ত্বাবধানে থাকলেও তাঁকে শীল মশাই-এর পদাঙ্ক অনুসরণ করতে হয়েছে। বৈজ্ঞানিক আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের 'হিন্দুদের রসায়ন বিদ্যা' সম্বন্ধে ইংরেজি পুস্তকটিতেও স্যার ব্রজেন্দ্রনাথ শীলের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ প্রভাব বিদ্যমান— ''পরলোকগত আশুতোষ মুখোপাধ্যায় কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কাজ করিবার সময় নানা বিদ্যা বিষয়ে যেরূপ জ্ঞানের পরিচয় দিতেন, তাহার অনেকটা শীল মহাশয়ের সহিত পরামর্শের ফল। আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় মহাশয়ের প্রাচীন হিন্দুদের রসায়ন বিদ্যা সম্বন্ধে যে ইংরেজি পুস্তক আছে তাহার একটি বিস্তৃত অংশ শীল মহাশয়ের লেখা।'' [শ্রী দাস, ঐ, পৃ. ২৭০]

জ্ঞানশরণ চক্রবর্তী

লর্ড বেন্টিঙ্ক ১৮৩৪ খৃষ্টাব্দে দখল করা কুর্গের রাজাকে রাজ্যচ্যুত করে একজন কমিশনারের হাতে সেখানকার শাসনভার দিয়েছিলেন। কুর্গ যখনই বৃটিশের হাতে এল তখনই বাঙালীদের হয়ে গেল পোয়াবারো। হুড়হুড় করে বাঙালী এনে তাদেরকে দিয়ে শাসন শোষণের কাজ চালানো হোল প্রচন্ড উদ্যমে। কয়েক বছরের মধ্যেই দেখা যায় সেখানে বাঙালী পৌঁছেছিলেন ১৩,২৬৩ জন।

মাদ্রাজের অবস্থাও ঠিক ঐরকমই। সারা ভারতবর্ষের প্রধান ঘাঁটি হিসাবে বাংলার পরই স্থান ছিল মাদ্রাজের। মাদ্রাজে বাঙালীদের তৈরি করা আখড়া ছিল প্রচুর। যেগুলো

বাঙালী বৈষ্ণব ও গোস্বামীদের কীর্তি। বাঙালীরাই প্রথমে মাদ্রাজে আলুর প্রচলন করে। সেইজন্য অন্ধ্রপ্রদেশে আলুকে তখন 'বাঙ্গালা দুম্‌পলু' বলা হোত। প্রথম বাঙালী পাঠানো হয় ৪৬ জন। ১৮৯১ খৃষ্টাব্দে সংখ্যাটা দাঁড়ায় ১১৭৩-তে। তখনকার ভিজিগাপাটাম শহরে ইস্ট কোস্ট ট্রেডিং কোম্পানী নামে যে বিরাট ব্যবসা ছিল তার মালিক ছিলেন বাগবাজারের বাঙালী অতুলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

বিখ্যাত বাঙালী শিল্পী প্রমোদকুমার চট্টোপাধ্যায় 'মছলিপত্তন অন্ধ্রজাতীয় কলাশালা'র প্রিন্সিপ্যাল ছিলেন। শিল্পী অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের শিক্ষা ও দীক্ষাপ্রাপ্ত ছিলেন তিনি। বঙ্গের প্রভাব সারা ভারতবর্ষে ছড়িয়ে দেওয়ার কাজে অন্যভাবে বললে বলা যায়, ভারতীয় প্রাচীন নারী পুরুষের পোষাক পরিচ্ছদ সংস্কৃতি ইত্যাদির চিত্র অঙ্কনের ব্যাপারে নেপথ্যে ছিল ইংরেজের এক বিশ্বজোড়া পরিকল্পনা। তারই একটি কেন্দ্র বাঙালী প্রমোদবাবুর দ্বারা পরিচালিত হয়েছিল। প্রখ্যাত শিল্পী নন্দলাল বসু ও অসিত কুমার হালদার ছিলেন অবন ঠাকুরের শিষ্য। প্রমোদবাবু সেখানে 'সারদা' নামে একটি মাসিক পত্রিকা নিজের আঁকা সরস্বতীর মূর্তিসহ প্রকাশ করেন। ঐ ছবিটি অশ্লীল বলে হৈ হৈ কান্ড হয়। সমস্ত পোষ্টমাষ্টার ও ডাককর্মীরা ওটা বিলি করতে ঘৃণা এবং অস্বীকার করেন। পোষ্টমাষ্টার জেনারেল প্রচ্ছদের অশ্লীলতার জন্য ইংরেজিতে যা লিখেছিলেন তার ভাবার্থ এই : প্রচ্ছদপটটি কেবল নগ্নতার ভাবমাত্রই প্রকাশ করছেনা বরং এতে অতিরঞ্জিত স্থূল অমার্জিত রুচি প্রকাশিত হয়েছে যা কখনোই প্রকৃত আর্টের সীমার ভিতর আসতে পারেনা।

সেই সময় মাদ্রাজ আদিয়ার ব্রহ্ম বিদ্যাশ্রমের প্রিন্সিপ্যাল কলারসজ্ঞ ডঃ জে. এইচ. কজিন্স সাহেবের হাতে পড়ে ঐ পত্রিকার একটি কপি। ১৯২৩-এর ১১ই সেপ্টেম্বর কজিন্স সাহেব ইংরেজিতে যে মন্তব্য করেছিলেন তার সারমর্ম হোল, তিনি ঐ অশ্লীল চিত্রের প্রশংসায় পঞ্চমুখ। তার একটি অংশ হচ্ছে : যেখানে স্বর্গীয় পবিত্রতা ছাড়া অন্য কিছু প্রকাশ করার প্রয়াস নেই, এবং যেখানে সুমার্জিত দৃষ্টি ও সংযম দৃষ্টি অন্তর্মুখী করিয়া তোলে, সেখানে অতিরঞ্জিত অমার্জিত স্থূল অশ্লীলতা দেখতে পাওয়া বড় আক্ষেপের কথা। সাহেব শিল্পীর এই বাণী প্রকাশ হবার সঙ্গে সঙ্গে ডাকবিভাগ, অন্ধ্রের জনসাধারণ এক কথায় সকল ভারতবাসীর দৃষ্টিভঙ্গী বিদ্যুৎগতিতে পরিবর্তিত হয়। সঙ্গে সঙ্গে শিল্পী প্রমোদবাবু দুর্নামের পরিবর্তে সম্মানিত হতে থাকেন দারুণভাবে। [পৃ. ২৮০]

দক্ষিণ বেজওয়ারায় (বা বর্তমান বিজয়ওয়াড়ায়) বাঙালীদের জন্য একটি পাড়া তৈরি হয়ে গিয়েছিল। নেলোর জেলায় রেলওয়ে পোলগুলো পরিদর্শন করার জন্য সুপারভাইজার পদে এসেছিলেন বাঙালী অশ্বিনী কুমার সেন। মাদ্রাজ নগরে 'বাঙালী পাড়া' 'বাবুবাজার' 'শম্ভুচন্দ্র দাস রোড' প্রভৃতি নামগুলো প্রচুর পরিমাণে বাঙালী আসার

প্রমাণ দেয়। কবি মাইকেল মধুসূদন দত্তও মাদ্রাজে আসেন। তিনি পূর্বেই খৃষ্টান হয়ে খৃষ্টান মহিলাকে বিবাহ করেছিলেন। ১৮৯১ খৃষ্টাব্দের একটি হিসাবে দেখা যায় সেখানে ছিল ১২৭৩ জন বাঙালীর উপস্থিতি। ১৮৯২ খৃষ্টাব্দে স্বামী বিবেকানন্দ মাদ্রাজে আসেন। ইউরোপ থেকে ফিরে পাঁচবছর পর এখানে ধর্মোপদেষ্টার স্থায়ী বাসস্থান করবার প্রয়োজন হয় এবং স্বামী রামকৃষ্ণানন্দকে বাছা হয়। স্বামী বিবেকানন্দের চেষ্টায় 'ব্রহ্মবাদিন' মাসিক পত্রও প্রকাশিত হয় এখান থেকে।

এলবিয়ন বন্দ্যোপাধ্যায়

ব্রজেন্দ্রলাল মিত্র, হরেন্দ্রলাল ঘোষ, হরিপদ ঘোষ, বিলাতফেরা ডাক্তার সুরেন্দ্রনাথ ধর, রমণীমোহন ঘোষ, রায়বাহাদুর কালীপ্রসন্ন সেন, ইঞ্জিনিয়ার সতীশচন্দ্র মজুমদার, নন্দলাল শীল প্রভৃতি মাদ্রাজের বিখ্যাত সব ব্যক্তিই ছিলেন বাঙালী। বি. সি. সান্যাল, ইন্দুপ্রকাশ বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রভাত বন্দ্যোপাধ্যায়, সিভিলিয়ান মিঃ এ. দত্ত, মিঃ এম. ঘোষ, মিঃ আর. কে. ব্যানার্জী এঁরা সকলেই বাঙালী। চিঙ্গলপুট জেলার সেন্ট টমাস মাউন্টের বাঙালী বাজার বাঙালী উপনিবেশের স্মৃতি বহন করে। দুর্লভ গোস্বামী নামের এক বিখ্যাত বাঙালীর ইতিহাস অস্বীকার করা যায় না; যাঁর ডাক নাম ছিল দুলু গোঁসাই।

মাদ্রাজের বরোদা কলেজের ভাইস প্রিন্সিপ্যাল হয়ে যিনি আসেন তিনি বাঙালী ঋষি অরবিন্দ ঘোষ। রাজনৈতিক কারণে জেল হয়। মুক্তির পর আশ্রম করেন পন্ডিচেরিতে। ১৭৯৯ খৃষ্টাব্দে তাঞ্জোর ইংরেজদের হাতে আসে। প্রথম খন্ডে আলোচনা করা হয়েছে কল্পিত সাহিত্য, ইতিহাস প্রভৃতির চক্রান্তাগার বিষয়ে অনেক কথা। সমগ্র ভারতবর্ষের যেখানে যেখানে ঐ চক্রান্তের কাজ চলছিল তারমধ্যে বহির্বঙ্গের তাঞ্জোর অন্যতম। ঐ জেলার সরস্বতীমহল পুস্তাকাগারটি একটি দর্শনীয় স্থান। এখানে শুধু ১৮,০০০ সংস্কৃত হস্তলিখিত পুস্তক এবং ৮,০০০ তালপত্রে লেখা পুঁথি আছে। এগুলো প্রকৃতই প্রাচীন কিনা তা এখানে বলা নিষ্প্রয়োজন। ১৮৯১ খৃষ্টাব্দের একটি হিসাবে দেখা যায় ঐ সময় এখানে বাঙালী আমদানি হন ৩৫৪ জন।

ঐ বছরে কানাড়ায় আগত মোট বাঙালী ছিলেন ১০৬ জন। বাঙালী চৈতন্যদেবের

ত্রিবাঙ্কুরে আগমন উল্লেখযোগ্য। ১৯১১-তে এখানে ২৬ জন, পদ্মনাভপুরে ১ জন, ত্রিবান্দ্রমে ১০ জন ও কুইলনে ১৫ জন বাঙালী প্রবাসী হন। ১৯০১ খৃষ্টাব্দের সেন্সাস অনুযায়ী দেখা যায়, দক্ষিণভারতে ইংরেজ সরকারের করুণায় ৪২৪৫ জন ভাগ্যবান বঙালী এসে বসবাস করেন। কোচিনে ২ জন, মহীশূরে ২০ জন, হায়দ্রাবাদে ৬৬ জন, ত্রিবাঙ্কুরে ৯৮ জন, মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সিতে ৬২৬ জন বোম্বাই প্রেসিডেন্সিতে ১৬৭৫ জন, আর মধ্যপ্রদেশে ছিলেন ২৭৪৮ জন ভাগ্যবান বাঙালী।

সিংহলে এত বেশি বাঙালী পাঠানো হয়েছিল যার সঠিক হিসাব দেওয়া মুশকিল। তবে মহামহোপাধ্যায় পন্ডিত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী বলেন—"এখন যাঁহারা সিংহলে বাস করেন, এককালে তাঁহারা বাঙালী ছিলেন।"

১৭৯৬ খৃষ্টাব্দে ইংরেজ সমগ্র সিংহল দখল করে। সিংহলের কোন প্রকৃত ইতিহাস তখনও পর্যন্ত ছিলনা। ইংরেজ অধিকারের দু বছরের মধ্যে সাহেব মিঃ টার্নার একটি ইতিহাস সৃষ্টি করে ফেলেন যেটার নাম দেন EPITOME OF THE HISTORY OF CYLON আর রটিয়ে দিলেন 'মহাবংশ' গ্রন্থ অবলম্বন করে সেটি লিখেছেন তিনি। মহাবংশ বলে কোন সঠিক ইতিহাস গ্রন্থই পৃথিবীতে সৃষ্টি হয়নি।

ডাঃ গুডিভ চক্রবর্তী, শশিভূষণ মুখোপাধ্যায়, মহামহোপাধ্যায় সতীশচন্দ্র ও রায়বাহাদুর শরৎচন্দ্র দাস ছিলেন বাঙালী। ১৮৯৭ খৃষ্টাব্দে ইউরোপ থেকে ফিরে স্বামী বিবেকানন্দ এখানে পদার্পণ করেন। জাফনার হিন্দু কলেজ প্রাঙ্গনে স্বামীজী বক্তব্য রাখেন। এই হিন্দু কলেজ নামটি যে কলকাতার অনুকরণে বাঙালীবুদ্ধি প্রসূত তাতে সন্দেহ নেই। অজয়নাথ ঘোষ, ভূপেশচন্দ্র দাস, হেমেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, প্রভাতচন্দ্র সর্বাধিকারী প্রমুখ প্রতিষ্ঠিত ভাগ্যবানেরা সকলেই ছিলেন বাঙালী। সুধাংশুনাথ বসু, অধ্যাপক যামিনীকুমার ঘোষ, প্রবোধচন্দ্র সেন, রমেশচন্দ্র সেন, অধ্যাপক মনীন্দ্রভূষণ গুপ্ত সকলেই ছিলেন বাঙালী, যাঁরা এখানে হয়েছিলেন প্রতিষ্ঠিত।

আধুনিক ইতিহাসবিদদের অনেকের মতে জৈন ও বৌদ্ধ ধর্ম পরিকল্পিত ধর্ম। আসামের কথা বলতে গিয়ে বলা যায় যে, "মণিপুরে বৌদ্ধ ও বৈষ্ণব ধর্ম বাঙালীর অবদান। বৌদ্ধধর্মের পরে বৈষ্ণব ধর্ম যখন পূর্বাঞ্চলে প্রাধান্যলাভ করিতেছিল, শান্তিপুরের গোস্বামীরা তখন মণিপুর রাজবংশ ও মণিপুরীদের ক্ষত্রিয় জাতিতে পরিণত করিয়া বৈষ্ণবধর্মে দীক্ষিত করিয়াছিলেন।"

১৮২৫ খৃষ্টাব্দের ২রা ফেব্রুয়ারি আসাম ইংরেজদের অধিকারে আসে। আর ইংরেজদের অধিকারে আসা মানেই হোল, আমাদের কাঙালী বাঙালী জাতির ভাগ্য খুলে যাওয়া। ১৮৯১ খৃষ্টাব্দের সেন্সাস রিপোর্ট অনুযায়ী দেখা যাচ্ছে ১ লক্ষ ৫৮ হাজার ৮৪১

জনকে সেখানে পাঠানো হয়েছে। দশ বছর পর ১৯০১-এর হিসাবে দেখা যাচ্ছে আরও ৭৯ হাজার ৪৪৬ জনকে পাঠানো হয়েছে। তার দশ বছর পরের হিসাবে দেখা যায় যে, আরও ২ লাখ ৭৪ হাজার ৮৪৩ জন বাঙালীকে বঙ্গ থেকে পাঠানো হয়েছিল আসামে।

প্রমোদকুমার চট্টোপাধ্যায়

আসামের কামাখ্যা গৌহাটি জেলার অন্তর্ভূক্ত। কামাখ্যার অদূরে যে বিখ্যাত ভুবনেশ্বরী মন্দির আছে সেখানে বাঙালী স্বামী অভয়ানন্দ কাটিয়েছিলেন একটানা ১৯/২০ বৎসর। তার আশপাশের এলাকায় বাংলা ভাষার খুবই প্রচলন ছিল। 'বাঙ্গালা স্কুল, পাঠশালা বহুদিন হইতেই এখানে স্থাপিত ছিল।' এখানকার সরকারি বিদ্যালয়গুলোতেও ব্যবস্থা ছিল বাংলা ভাষা শিক্ষার। মন্দিরের আশপাশে বাস করতেন হাজার ঘরেরও বেশি বাঙালী। এইভাবে কাছাড়েও বাঙালীদের প্রভাব ইংরেজের করুণায় ছড়িয়ে পড়েছিল। লুসাই সংলগ্ন লামডিঙ-এ চা বাগানের মালিক প্রতিপত্তিশালী বেণীমাধব বন্দ্যোপাধ্যায় ছিলেন বাঙালী। সেই সময়কার আসামের রাজপথগুলো বাঙালী কন্ট্রাক্টর দ্বারা তৈরি। সুদীর্ঘ আসাম-বেঙ্গল রেলপথও বাঙালীদের দ্বারা তৈরি। "উচ্চশিক্ষাসুলভ বৃত্তিগুলোতে শিক্ষা, চিকিৎসা, ওকালতি এবং ব্যবসায় বাণিজ্য ও গবর্নমেন্টের চাকরির ক্ষেত্রে বাঙালিরই প্রায় একাধিপত্য ছিল।" [পৃ. ৩৭৯]

গোয়ালপাড়ায় শ্মশানঘাট -অবধূত-যোগাশ্রম উল্লেখযোগ্য। এই আশ্রম বাঙালীদের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত। স্বামী হরিহরানন্দ অবধূত, স্বামী শচ্চিদানন্দ অবধূতরাও ছিলেন বাঙালী। গৌরীপুরের শম্ভুচন্দ্র লাহিড়ী, গোয়ালপাড়ার জয়নারায়ণ শর্মা, শ্যামলনাথ চট্টোপাধ্যায়, বি. এল. দে, রামনাথ দত্ত, রামপদ বন্দ্যোপাধ্যায়— এঁরা সকলেই ছিলেন বাঙালী। গৌহাটির উকিল কালীচরণ সেন ও উপেন্দ্রনাথ সেন মালিক ছিলেন কামরূপ জেলার বিস্তৃত জমিদারির। ছোটলাট বাহাদুর উপেন্দ্রনাথের আনুগত্য ও কর্মকুশলতায় মুগ্ধ হয়ে 'রায়বাহাদুর' উপাধি দিতে ইচ্ছা করলে তিনি তা পছন্দ করেন নি—"কিন্তু কৃতজ্ঞ গবর্নমেন্ট পরবর্তী সুযোগে সম্রাট পঞ্চম জর্জের অভিষেক উপলক্ষে সম্মানের নিদর্শনপত্র 'সার্টিফিকেট অব অনার' দিয়া তাঁহার সম্বর্ধনা করিয়াছিলেন।"

ধুবড়ির বিখ্যাত উকিল পিয়ারীমোহন দত্ত। উনিও সরকারের রায়বাহাদুর উপাধিপ্রাপ্ত ব্যক্তি। ডিব্রুগড়ের উমেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, স্বামী নিগমানন্দ, স্বামী মুক্তানন্দ, কল্যাণীপ্রসন্ন বসু সকলেই ছিলেন বাঙালী। শিলং বাজারের মধ্যস্থলে যে কো-অপারেটিভ্ স্টোর, তা বাঙালীদেরই কীর্তি।

১৯০১-এ চেরাপুঞ্জি অঞ্চলে মার্শম্যানের সঙ্গী হয়ে একজন বাঙালী খাসিয়া দেশের বহু সিপাহীকে খৃষ্টান করার কীর্তি দেখান। তিনি পূর্বেই খৃষ্টান হয়েছিলেন এবং তাঁর বাবা মুকুন্দচন্দ্র পালও খৃষ্টান ধর্ম গ্রহণ করেন।

বুদ্ধদেব ও চৈতন্যদেবের জীবনী, রামায়ণ মহাভারত প্রভৃতি খাসিয়া ভাষায় যিনি প্রচার করেছিলেন তিনি বাঙালী নীলমণি চক্রবর্তী। অথচ অদ্ভুত আশ্চর্য কথা হোল, তিনি ছিলেন ব্রাহ্মধর্মের লোক। ঐ নীলমণিবাবুই ১৮৮৯-এ মস্মই ও শেলাতে দুটি ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। আর ব্রাহ্মসঙ্গীতগুলো খাসিয়া ভাষায় অনুবাদ করে বাংলা সুরে গাইতেন ও গাওয়াতেন। তিনি সংকীর্তনে ঢোল বাজানোর পরিবর্তে খোল বাজানোর নিয়ম প্রচলন করেন। পাঁচটি স্কুল আর পঞ্চাশ মাইলের মধ্যে ১৪ টি ব্রাহ্মসমাজ, চারটি ঔষধ বিতরণ কেন্দ্র, একটি হাসপাতাল, নারী সভা, সঙ্গীতসভা, নীতি বিদ্যালয়, বিতর্কসভা প্রভৃতি বহু প্রতিষ্ঠান ও অনুষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন ঐ নীলমণিবাবু। তারপরে তাঁর স্বাস্থ্যভঙ্গের কারণে বিনোদবিহারী রায়ের হাতে দিয়েছিলেন ঐ দায়িত্ব।

শিবনাথ দত্ত, সুরেশচন্দ্র মুখার্জী, অতুলচন্দ্র ভট্টাচার্য, মিঃ স্যামুয়েল রায় এঁরা সকলেই বাঙালী। আর্থিক স্বার্থের জন্য নিজের ধর্ম ত্যাগ করে, কেউ হয়েছিলেন ব্রাহ্ম কেউ হয়েছিলেন খৃষ্টান।

ঠিক এইভাবে ব্রহ্মদেশের অবস্থাও তাই। পূর্বেই বলা হয়েছে বৌদ্ধ ও জৈন ধর্ম সম্বন্ধে। ব্রহ্ম দেশে নাকি বহু বৌদ্ধ ছিল। প্রচারটা এইভাবেই হয়েছে। কিন্তু আসল সত্য এটাই যে, বঙ্গ থেকে বাঙালীরা গিয়েই বৌদ্ধ শরবত পরিবেশন করেছেন— "যদিও অনেকে মনে করেন সিংহল হইতে ব্রহ্মে বৌদ্ধ ধর্ম আসিয়াছে, কিন্তু আমাদের মনে হয় ইহার চেয়ে বাঙ্গালা দেশ হইতেই যে এই দেশে বৌদ্ধ ধর্ম আসিয়াছে ইহাই সঙ্গত।" [পৃ. ৪০২]

ব্রহ্ম দেশের 'স্বাবলম্বী' পত্রিকার মর্ম উপলব্ধি করে বলা যায় যে, সে দেশে ব্রাহ্মণেরা সকলেই বাংলা থেকেই রপ্তানিকৃত। ১৯০১-এর সেন্সাসে ব্রহ্মদেশে বাঙালী যান ১ লক্ষ ৫৭ হাজার ৩৪ জন। ১৯২১-এ ৩ লক্ষ ১০ হাজার ৩৯ জন বাঙালী সেখানে ছিলেন বলে জানা যায়। 'স্বাবলম্বী' পত্রিকার মতে বাংলা থেকে ভাগ্যবান বাঙালী গিয়েছিলেন পাঁচ লাখ। [দ্রষ্টব্য ঐ, পৃ. ৪০৩]

"পেগুর অন্তর্গত সুধর্ম সদ্ধর্ম নগর আধুনিক থাতোঁ [Theyton] পূর্বে বৌদ্ধবিদ্যার পীঠস্থান ও বাঙালী-বৌদ্ধ উপনিবেশ ছিল। দশম শতাব্দীতে এশিয়া বিখ্যাত বঙ্গের গৌরব শ্রীজ্ঞান দীপঙ্কর এখানে আসিয়াছিলেন।" তিনি এসেছিলেন বঙ্গের তমলুক থেকে। অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে ইংরেজদের অবির্ভাব হয় ব্রহ্মদেশে। তার সঙ্গে সঙ্গেই খুলে যায় বাঙালীদের ভাগ্য— "ক্রমে তথায় ইংরেজাধিকার বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে আধুনিক যুগের বাঙালীদের নিকট ব্রহ্মের দ্বার উন্মুক্ত হয়। ... এদিকে ইংরেজ বাহাদুর হিন্দু কালা পল্টন (কালো সৈন্য) ও দেশীয় কর্মচারীবর্গ সঙ্গে লইয়া ভারতের চতুর্দিকেই রাজ্য বিস্তার করিতে করিতে ব্রহ্ম সীমান্ত পর্যন্ত অধিকার করেন। এই সকল দেখিয়া শুনিয়া ব্রহ্মের রাজা ও প্রজা সকলেই পার্শ্ববর্তী বাঙালীদের সাহসহীন, খর্বদেহ, কালা বিদেশী, জাতমানার দল বলিয়া ঘৃণা করে ও ইংরেজকে সাত সমুদ্র তের নদীর পারের মুষ্টিমেয় দ্বীপের লোক, অতদূর হইতে পরের দেশে আসিয়া, রাজাদের সিংহাসনচ্যুত করিবার এবং যাহাতে তাহাদের কোনই হাত নেই সেসব রাজ্য অধিকার করিবার তাহাদের কিসের মাথাব্যথা ইত্যাদি বলিয়া নিন্দা করিতে থাকে।"

ডা. গুডিভ চক্রবর্তী

বৃটিশের বর্মা অধিকারের পর ভাগ্যবান বাঙালীদের স্রোত আসতে শুরু হয়। বাঙালীরা রেঙ্গুনে প্রতিষ্ঠা করেন কালীবাড়ি, পালন করেন দুর্গোৎসব, করেন ব্রহ্মময়ী সেবক সমিতি ইত্যাদি। এইভাবে বাঙালীরা বিস্তার করেন তাঁদের আধিপত্য। কামাখ্যানাথ গুপ্ত, বি. বি. চট্টোপাধ্যায়, ডঃ জে. ব্যানার্জী, ডঃ এফ. আর. সেনগুপ্ত, এডভোকেট এম. ব্যানার্জী, এডভোকেট বি. মুখোপাধ্যায়, পোষ্টমাষ্টার কে. সি. চক্রবর্তী, জেল সুপার বিপিনবিহারী চক্রবর্তী, উকিল এইচ. গুহ, এ্যামেথিন জেলার সিভিল সার্জন ডাঃ এম. এল. বসু, উকিল এস. সি. গুহ, উকিল বি. কে. হালদার, পোষ্টমাষ্টার এস. পি. ঘোষাল, পূর্ত বিভাগের সাব ডিভিশনাল অফিসার এন. বি. রায়, চিফ জেলার মিঃ মুখার্জী, জেনারেল কন্ট্রাক্টর বি. বি. মুখার্জী, উকিল এস. মুখার্জী, জরিপ বিভাগের একস্ট্রা এ্যাসিস্ট্যান্ট সুপার ডি. এল. ব্যানার্জী, সাব এ্যাসিস্ট্যান্ট সুপার পি. সি. সেনগুপ্ত, উকিল শরৎশশী মুখার্জী, ব্যারিস্টার এস. মুখার্জী, এ. সি. মুখার্জী, এল. কে. মিত্র, পি. এন. বোস, কে. ব্যানার্জী এবং এল. এম.

মুখার্জী এঁরা সকলেই প্রতিষ্ঠিত সরকার অনুগত ভাগ্যবান বাঙালী। বিখ্যাত ব্যবসায়ী জে. এল. নন্দী এন্ড সন্স উল্লেখযোগ্য বাঙালী প্রতিষ্ঠান। শ্রীযুক্ত দীননাথ সান্যাল ও চুনীলাল বসু মহাশয়দ্বয় বাঙালী ছিলেন ও উঠেছিলেন চরম শিখরে এবং পেয়েছিলেন বৃটিশের আনুগত্যের চিহ্ন 'রায়বাহাদুর' উপাধি।

শুধু রেঙ্গুন শহরে বাঙালী আনানো হয়েছিল ২৬ হাজার ৯৩২ জন। ইনসিনে ৫ হাজার ৯২৭ জন, হান্তাউড়িতে ৭ হাজার ৮৬৬ জন, থারাউড়িতে ২ হাজার ৫৬০ জন, পেগুতে ৬ হাজার ১৬৭ জন, প্রমে ১ হাজার ১৩৬ জন এবং বেসিনেওতে ৫ হাজার ২৫৩ জন ভাগ্যবান বাঙালী আনানো হয়েছিল। আর একবার মনে করিয়ে দেওয়া যায় যে, বৃটিশ সরকারের পক্ষ থেকে নির্বাচিত ও নির্ধারিত এই বাঙালী ভাগ্যবানদের মধ্যে মুসলমান জাতি, হরিজন, আদিবাসী প্রভৃতিরা ছিলেন না, তাঁরা ছিলেন উপেক্ষিত প্রায়।

ব্যারিস্টার লক্ষ্মীচন্দ্র সেন, ব্যারিস্টার নির্মলচন্দ্র সেনরা ছিলেন সেখানে পূর্ণভাবে প্রতিষ্ঠিত। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর জাপান যাওয়ার সময় তাঁদের বাড়ির অতিথি হয়েছিলেন এবং তাঁকে দেওয়া অভিনন্দন পত্রটি তিনি স্বয়ং পাঠ করেছিলেন। কালীদাস মুখোপাধ্যায়, উকিল দেবেন্দ্রনাথ পালিত, অক্ষয়কুমার দে, ইঞ্জিনিয়ার অহিনচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, এ্যাকাউন্ট্যান্ট জেনারেল মন্মথনাথ ভট্টাচার্য, উপেন্দ্রলাল মজুমদার, অঘোরনাথ চ্যাটার্জী, শশিভূষণ নিয়োগী, এটর্নী মিঃ এ. সি. ধর এঁরা সকলেই ছিলেন সেখানকার ধনী এবং মানী বাঙালী প্রবাসী। মিঃ ধর ব্রহ্মদেশের মেয়েকে বিয়ে করে পুত্রের নাম রেখেছিলেন উইলিয়াম ধর। ইঞ্জিনিয়ার হরিসুন্দর রায়, জ্ঞানেন্দ্রনাথ দে, শিবনাথ রক্ষিত, জয়চন্দ্র দত্ত, শশিকুমার ঘোষ এঁরা ছিলেন বড় বড় কন্ট্রাকটর; টাকা কামিয়েছিলেন বিনা বাধায়। রেঙ্গুন বিদ্যাসাগর রিডিং রুম, ইন্ডিয়ান সেমিনারি, বেঙ্গল একাডেমি, রেঙ্গুন ব্রাহ্মসমাজ, শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন সেবাশ্রম ও দুর্গাবাড়ি সব বাঙালীদেরই অবদান। তাছাড়া বেঙ্গল ক্লাব, বাঙালী যুবকসমিতি, বেঙ্গল স্পোর্টিং ক্লাব, চট্টল বৌদ্ধ সমিতি, বেঙ্গল সুহৃদ সম্মিলনী, বেঙ্গল কো-অপারেটিভ ক্রেডিট সোসাইটি, রেঙ্গুন মহিলা সমিতি, বাঙ্গালী বালিকা বিদ্যালয়, বাঙালী সমবায় ঋণদান সমিতি, আর্য সঙ্গীত বিদ্যাপীঠ, আর্য সঙ্গীতালয়, বঙ্গনাট্য সমাজ, বাংলা সাহিত্য সম্মেলন উল্লেখযোগ্য। এছাড়া রেঙ্গুন থেকে তিনটি বাংলা মাসিক ও সাপ্তাহিক কাগজ বের হোত সেগুলোও নিঃসন্দেহ বাঙালীদের গৌরব। অবশ্য শেষের দিকে মুসলমানেরা সরকারি প্রচেষ্টায় নয়, নিজস্ব প্রচেষ্টায় ভাগ্য অন্বেষণে অনেকেই ব্রহ্মদেশে পৌঁছেছিলেন। তাঁরাও নিজেদের মধ্যে সীমিত ক্ষমতায়, সরকারি সাহায্য সহযোগিতা ছাড়াই তৈরি করেছিলেন খাদেমুল ইসলাম স্কুল, মোসলেম সমিতি, বেঙ্গল মহমোডান এসোসিয়েশন প্রভৃতি প্রতিষ্ঠান। মুসলমানরা বেশিরভাগই কাঠ, পরিবহন প্রভৃতি ব্যবসা, শ্রমিক ও শ্রমিক-ঠিকাদার হিসাবে কাজ করতেন।

আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ সম্বন্ধে দেশের লোক জানেন যে, দীর্ঘমেয়াদী কয়েদীদের বন্দী রাখা হোত সেখানে। পূর্বে ছিল অস্বাস্থ্যকর স্থান, মশাগুলো হতো মাকড়সার মতো বড়, একহাত লম্বা এক ইঞ্চি মোটা বিছে, ভাইপার নামক বিষধর সাপে পরিপূর্ণ। অধিবাসীরা ছিল নিগ্রোদের মত কালো, বুনো, উলঙ্গ এবং মানুষ-খাদক। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি ক্যাপ্টেন আর্চিবল্ড ব্লেয়ারকে পাঠান। তারও পূর্বে দীনেমারেরা বাস করার চেষ্টা করেছিলেন কিন্তু বাঁচতে পারেননি। ব্লেয়ারের নাম অনুসারে সেখানকার এক স্থানের নাম হয় পোর্ট ব্লেয়ার। সিপাহী বিদ্রোহের নেতা বাছা বাছা ২৭০ জন বিপ্লবীকে প্রথমে সেখানকার জেলে পাঠানো হয়। একবার আন্দামান দ্বীপপুঞ্জ বাস করার অযোগ্য বলে পরিত্যক্ত হয়। কিন্তু ইংরেজ সিদ্ধান্ত নেয় যে তাদের শত্রু বন্দীদের জন্য ঐ জায়গাই উপযুক্ত। "সিপাহী বিদ্রোহের পর ১৮৫৮ অব্দের মাঘ মাসে ভারত গবর্নমেন্ট এই দ্বীপপুঞ্জে দন্ডিতদের নির্বাসন উপযোগী স্থান পুনঃপ্রতিষ্ঠার জন্য ডাঃ ওয়াকারকে পাঠাইয়া দেন। তাঁহার সঙ্গে গিয়াছিলেন একজন বাঙালী ওভারসিয়র, দুইজন বাঙালী ডাক্তার ও নৌবাহিনীর জনৈক কর্মচারীর পরিচালনাধীন ৫০ জন রক্ষীসেনা।" ওয়াকার সাহেবের অত্যাচারে বিপ্লবী কয়েদীরা জেল থেকে পালিয়ে যেতেন কিন্তু আন্দামানের উলঙ্গ নরমাংসভোজী বুনোদের হাতে নিহত হতেন এবং খাদ্যে পরিণত হতেন তাঁরা। আন্দামানের পরিবেশ বাসের উপযুক্ত করার জন্য ক্যাপ্টেন হার্ডটন আপ্রাণ চেষ্টা করে পরিস্থিতির পরিবর্তন করেন। বাঙালী ডাক্তার দীননাথ দাস চিকিৎসক হিসাবে সেখানে সুনাম অর্জন করেছিলেন। ক্রমে সেখানে হাসপাতাল, লাইব্রেরি, স্কুল-কলেজ, অনাথ আশ্রম প্রভৃতি হতে লাগল। ১৯১৪ খৃষ্টাব্দে ইংরেজ সরকার ঐ ডাক্তার দাসকে 'রায়বাহাদুর' খেতাব দেন। বাঙালীর ভাগ্য আবার ফিরতে লাগলো। ১৯০১-এর সেন্সাস হিসাবে দেখা যায় ১৪৪১ জন বাঙালী উপস্থিত হন সেখানে। সার্জন ডাঃ বি. চক্রবর্তী, ডাঃ কে. জি. মুখার্জী, ডাঃ বি. মন্ডল এঁরা সকলেই ছিলেন বাঙালী।

শ্রী জ্ঞানেন্দ্রমোহন দাসের লেখা থেকে অনেক উদ্ধৃতি দেওয়া হোল। কেন তাঁর লেখা বইয়ের উপর গুরুত্ব দিলাম এ প্রশ্ন অবান্তর নয়। ১৯১৫-তে বইটি প্রকাশিত। ঐ সময়কার ছোট বড় বিখ্যাত বিশেষ পত্রিকাগুলো বইটির উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেছেন। তারমধ্যে কয়েকটি পত্রিকার নাম উল্লেখ করছি। আনন্দবাজার প্রশংসা করেন ২.৩.১৩২২-এ, 'প্রবাসী' ১৩২২-এর আষাঢ়ে। 'বঙ্গবাসী' পত্রিকায় প্রকাশিত হয় ১১.৩.১৩২২ তারিখে। 'সঞ্জীবনী'-তে ৯ই আষাঢ় প্রশংসা করা হয়। 'বসুমতী' ঐ বছরের আশ্বিনে এবং 'হিতবাদী' ৩১শে ভাদ্র প্রশংসা প্রকাশ করে। 'দর্শক'-এ বের হয় ১০ই ভাদ্র, ১৩২২। 'ভারতবর্ষ', 'উদ্বোধন' এবং 'তত্ত্বমঞ্জুরী'-তেও উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করা হয়। ইংরেজী পত্রিকার মধ্যে 'দি বিহার হেরাল্ডে' ৩১শে জুলাই ১৯১৫, 'দি পাইওনীয়র'

এ ২১শে নভেম্বর ১৯১৫, 'অমৃতবাজার পত্রিকা'য় ১৪ই সেপ্টেম্বর ১৯১৫, 'দি বেঙ্গলী'-তে ৫ই জুন ১৯১৫, 'দি স্টার অব উৎকলে' ঐ বছরের ৫ই জুলাই প্রশংসা প্রকাশিত হয়। এছাড়া আরও অনেক পত্রপত্রিকা তাঁর পুস্তকের সমালোচনায় প্রশংসা ব্যক্ত করে। তাছাড়া কলকাতা হাইকোর্টের প্রাক্তন বিচারপতি স্যার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় ৮ই আগস্ট ১৯২৫-এ যে প্রশংসাপত্রটি দিয়েছিলেন তা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। তাঁর একটি বাক্য তুলে ধরছি—"ইহা বঙ্গ ভাষায় একখানি অপূর্ব গ্রন্থ, ভারতের ইতিহাসের একটি অত্যুজ্জ্বল অধ্যায়, বাঙ্গালা সাহিত্য ভান্ডারের একটি অমূল্য রত্ন এবং বাঙালী মাত্রেরই একখানি অবশ্য পাঠ্যপুস্তক।"

আর একটি শুভেচ্ছা পত্রে স্বামী শ্রী ব্রহ্মানন্দ ভারতী ঢাকা থেকে লিখেছিলেন, "এই পুস্তকখানা এমন মনোমুগ্ধকর ভাষায় ও ভঙ্গীতে লিখিত হইয়াছে যে আমি ইহা পড়িতে আরম্ভ করিয়া ছাড়িতে পারি নাই।"

১৯১৫ -তে দেশ স্বাধীন হবার পূর্বেই, এই সব মন্তব্যগুলো গভীর দৃষ্টি দিয়ে ভাবলে দেখা যাচ্ছে সাম্প্রদায়িকতা কি পরিমাণে তার শিকড় চালিয়েছিল সর্পিল গতিতে।

আমরা পূর্বেই বলেছি যে, বাংলা তথা ভারতের ইতিহাস বলে যেটি সৃষ্টি হয়েছে সেটি সাম্রাজ্যবাদীদের চক্রান্তের সৃষ্টি করা বেলুন মাত্র। সরকার তার নিজের স্বার্থেই বাংলার মানুষকেই কাজে লাগিয়ে তৈরি করেছিল একটা মনগড়া ইতিহাস। 'বাঙালী' পত্রিকার দু-একটি বাক্য তুলে ধরছি—"বাঙালী এখন বাধ্য হইয়া— ভক্তিতে, প্রয়োজনে, কালধর্মে, প্রতিবেশ প্রভাবে, আত্মরক্ষার সহজাত সংস্কারের প্রেরণায় মাতৃপূজা সর্বাঙ্গ সম্পূর্ণ করিবার জন্য দেশে বিদেশে উপকরণ সংগ্রহ করিতেছে। যে যাহা পাইতেছে মা'র মন্দিরে কুড়াইয়া আনিতেছে। ইঁটের টুকরা, পাথরের মূর্তি, সোনা, রূপা, তামার টাকা পয়সা, শিলালিপি, তাম্রশাসন, পুরাতন দলিল, প্রাচীন পুঁথি, কিংবদন্তী, জনশ্রুতি, উপকথা, গল্প— যে যাহা পাইতেছে তাহাই দেশ মাতৃকার প্রাঙ্গণে পুঞ্জীভূত করিতেছে।"

একটু পূর্বে 'দর্শক' পত্রিকার উল্লেখ করা হয়েছে। তার কয়েকটি বাক্য তুলে ধরা হচ্ছে। যা একটি সাঙ্ঘাতিক, মারাত্মক, দুষ্প্রাপ্য দলিল। আধুনিক ইতিহাস গবেষকদের অনেকের মতে তথাকথিত 'সিপাহী বিদ্রোহে' সারা ভারতবর্ষে প্রচন্ড শক্তিসম্পন্ন মুসলমান জাতি সেই সঙ্গে দলিত নিপীড়িত হরিজন আদিবাসী সাঁওতাল প্রভৃতি ভারতবাসীর সৃষ্টি করা ঐ বিপ্লব সাম্রাজ্যবাদী ব্রিটিশকে কোণঠাসা করে ফেলেছিল। ঐ ১৮৫৭-তেই তাদের পাততাড়ি গুটিয়ে নিয়ে চলে যেতে হোত। কিন্তু সরকারের তৈরি করা ঐ বাবুশ্রেণী, ভদ্রলোক রাজা মহারাজা, বিদ্যাবিনোদ, প্রিন্স, রায়বাহাদুর, স্যার ও নাইট প্রভৃতি উপাধিপ্রাপ্ত বহু বিশ্বাসঘাতক ঘরের শত্রু বিভীষণ হয়ে ঐ বিপ্লবকে ব্যর্থ করে দিয়েছিল; নেতাদের

ধরিয়ে দিয়েছিল এবং তাঁদের গোপন পরিকল্পনা জানবার জন্য হিতাকাঙ্খী হয়ে ভিতরে ঢুকে সমস্ত সংবাদ ও তথ্য সরকারকে জানিয়ে তারা নিজেদের আখের গুছিয়ে নিয়েছিল, বৃটিশকে টিকিয়েও রেখেছিল। যদি ওটুকু না হোত তাহলে ১৯০ বছর পূর্বেই ভারত স্বাধীন হয়ে যেত— কোটি কোটি টাকা, সোনা রুপো, মণি মানিক্য, হীরে জহরত ভারতেই থেকে যেত, লক্ষ লক্ষ মানুষ প্রাণে বাঁচত, আর সবচেয়ে বড় কথা হোল, ভারতবর্ষ টুকরো টুকরো না হয়ে অবিভক্ত হয়ে বিরাজ করত পৃথিবীতে।

'দর্শক' পত্রিকার মন্তব্য—"প্রত্যেক বাঙালীরই এই পুস্তকখানি পাঠ করা উচিৎ। যখন সিপাহী বিদ্রোহ উপস্থিত হইয়া দেশে মহামারী ব্যাপার সংঘটিত হইয়াছিল, যখন অল্প সংখ্যক ইংরাজ কর্মচারীগণ বিদ্রোহীগণের ক্রোধাগ্নিতে পতিত হইয়াছিল সেই সময়ে নিরস্ত্র মসিজীবী বাঙালী কিরূপে আত্মরক্ষা করিয়া সেই বিপদ সময়ে মনিবের জীবন রক্ষা করিয়াছিলেন, কিরূপে আপনার জীবনকে বিপন্ন করিয়া বিদ্রোহীগণের মধ্যে গুপ্তভাবে থাকিয়া তাহাদের ষড়যন্ত্রের কথা রাজকর্মচারীগণের গোচর করিয়াছিলেন, কিরূপে সরকারী কর্মচারীগণকে সাহায্য করিবার জন্য বিদ্রোহীগণের বিষনজরে পতিত হইয়াছিলেন, বাঙালী হিন্দু যাহার নিমক খায় প্রাণ দিয়াও কিরূপে তাহার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রদর্শন করিতে হয় তাহার জাজ্বল্যমান প্রমাণ এই গ্রন্থে প্রকাশিত হইয়াছে। সামান্য কেরানী সরকারী কার্য করিবার জন্য বিদ্রোহীগণ কর্তৃক নগর অবরুদ্ধ ও লুণ্ঠিত হইলেও কিরূপে দুর্জয় সাহসে সেই আক্রান্ত স্থানে থাকিয়া তথাকার সকল সংবাদ বিশ্বস্ত কর্মচারী দ্বারা দূরদেশে প্রেরণ করিতেন, কিরূপে বিদ্রোহীগণ কর্তৃক ধৃত হইয়া তাহাদের নেতার সমক্ষে বিচারার্থ প্রেরিত হইয়া বুদ্ধিবলে তথা হইতে দূরদেশে পলায়ন করিয়া পুনরায় দৌত্য কার্যে নিযুক্ত হইয়াছিলেন, এই সকলের ঐতিহাসিক সত্য তথ্যগুলিও এই গ্রন্থে স্থান পাইয়াছে। কিরূপে স্বীয় ধৈর্য, শৌর্য, বীর্যবলে আবশ্যকমত বিদ্রোহীগণের উদ্দেশ্য বিফল করিয়া বহু শ্বেতাঙ্গ রাজ কর্মচারী নরনারীর ও শিশুগণের জীবন রক্ষা করিয়াছিল এবং এই সকল সম্বন্ধে উচ্চ রাজপুরুষগণ লিখিত ইতিবৃত্তও এই গ্রন্থে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে।" [দ্রষ্টব্য : 'দর্শক', ১০ই ভাদ্র, ১৩৩২ সাল]

সিপাহী বিদ্রোহের বিপ্লবীদের সঙ্গে বৃটিশের লড়াইকেই আমরা 'সিপাহী বিদ্রোহ' বলি। কিন্তু অপ্রকাশিত সত্য তথ্য হোল, বাবু শ্রেণী, রাজা মহারাজা, স্যার, নাইটের দলও প্রত্যক্ষভাবে লড়াই করেছেন বিপ্লবীদের বিরুদ্ধে, বিপ্লবীদের গ্রাম ও বস্তিতে আগুন জ্বালিয়ে দিয়েছেন এবং যতটা সম্ভব তাদের ধনসম্পত্তি লুঠ করে বৃটিশের হাতে তুলে দিয়েছেন। যেমন লর্ড ক্যানিং-এর সময় পিয়ারী মোহন ব্যানার্জী নিবিড় পরিকল্পনা তৈরি করেছেন বৃটিশের স্বপক্ষে, বিপ্লবীদেরকে আক্রমণ করে আগুন জ্বালিয়ে দিয়েছেন তাদের গ্রামের পর গ্রাম, লুঠ করেছেন এবং বৃটিশের দেওয়া ধন্যবাদ ও উৎসাহব্যঞ্জক বাণীগুলো তাদেরকে

শুনিয়েছেন নিয়মিত। 'দি পাইওনিয়র' পত্রিকায় বইটির প্রসঙ্গে লিখতে গিয়ে লেখা হয়েছিলো— "... Peary Mohun Banerjee and numerous others. The last named gentle man was described by Lord Canning in his despatch as a ' fighting munsiff ' and rendered conspicuous services to the Government during the Sepoy Mutiny. He not only held his own defiantly, but he planned attacks, burnt villages, wrote English despatches thanking his subordinates and displayed a capacity for rule and a fertility of resource."

১৯১৫-তে ছাপা একটা পুরনো বস্তাপচা সংবাদ চালাবার এটা একটা ব্যর্থ প্রয়াস বলে হয়তো মনে করবেন কিছু পাঠক। কিন্তু সব পুরনো বস্তুই মূল্যহীন নয় বরং অনেক সময় তা খুবই দুর্লভ ও মহামূল্যবান হয়ে ওঠে। আমাদের দেশের কচি কাঁচারা এ সব চাপা পড়া কথা না জানলেও এখনো কিছু বৃদ্ধ ও জ্ঞানবৃদ্ধ রয়েছেন যাঁরা জানেন সম্পূর্ণ ব্যাপারটি। ১৯১৫-র কথা ছেড়ে দিয়ে ১৯৯৯-এর ১৩ই আগস্ট-এর 'ভারতে সর্বাধিক প্রচারিত প্রথম শ্রেণীর বাংলা দৈনিক আনন্দবাজার পত্রিকা'র সম্পাদকীয় পৃষ্ঠায় বিখ্যাত বুদ্ধিজীবী সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের একটি লেখাকে কেন্দ্র করে শ্রী প্রদীপ কুমার দাসের যে লেখাটি প্রকাশিত হয়েছে তার কিছু অংশ তুলে ধরছি এখানে। এতেও প্রমাণ হবে বাঙালীর ইংরেজপ্রীতি, আর সন্ধান পাওয়া যাবে সেই সময়কার সত্য এবং তথ্যপূর্ণ ইতিহাসের :

"ইংরেজ এদেশে না এলে কলকাতা শহরটাকে কি আমরা পেতাম? ভারতবর্ষের মধ্যে কলকাতাই বোধহয় একমাত্র শহর যেটা একান্তভাবে ইংরেজের সৃষ্টি। আজকের ভারতবর্ষ বা ইণ্ডিয়ার জন্মই হোতনা ইংরেজ না এলে, যদিও আমরা বলি ইংরেজ ভারত ভাগ করেছে। ভারত বলে যে ভূখণ্ড ছিল সেটা ইংরেজ আসার আগেই খণ্ড খণ্ড সার্বভৌম দেশে বিভক্ত ছিল। ইংরেজ না এলে বর্তমান কালে বঙ্গদেশ, কলিঙ্গ দেশ, মারাঠা দেশ, রাজপুতানা— কত কী দেশ পাওয়া যেত! ... বাঙালীদের সার্বিক উন্নতি ইংরেজ আমলেই। যার শুরু ইংরেজের কলকাতা শহর শুরুর সঙ্গে সঙ্গে, অবনতি শুরু ইংরেজ এ দেশ ছেড়ে যাবার পর থেকেই। সেই আমলেই বাঙালী লাহোর থেকে কন্যাকুমারী পর্যন্ত রাজত্ব করেছে। মাষ্টারি, ডাক্তারি, ওকালতিতে আমাদের একচেটিয়া অধিকার ছিল। ওড়িশা এবং বিহারের বহু স্থানে বাংলা ছিল শিক্ষার মাধ্যম। ইংরেজ আমলেই ভারতবর্ষে তিনটি নোবেল প্রাইজ এসেছিল। আর সবকটাই কলকাতাতে বসে কাজ করার সুবাদে।"

বাঙালী দর্পণ

বঙ্গের কদর্য চরিত্রের ব্রাহ্মণদের কথা স্বামী বিবেকানন্দ যেভাবে বলে গেছেন তা তদানীন্তন দলিল হিসেবে যথেষ্ট। ব্রাহ্মণদের পর কায়স্থ সম্প্রদায়ের জন্য নীরদ সি. চৌধুরী একটি সংস্কৃত শ্লোক তুলে দিয়ে তার অর্থ করেছেন : "যে কায়স্থ কানে কলম গুঁজিয়া বসিয়া আছে তাহাকে বিশ্বাস করিবে না, বরঞ্চ গোক্ষুর সাপকে বিশ্বাস করিবে, বনের ব্যাঘ্রকে বিশ্বাস করিবে।" তারপর লিখেছেন, "আমাকে যাহারা ঘাঁটাইতে আসেন তাঁহারা যেন এই সংস্কৃত শ্লোকটি ভুলিয়া না যান।"

আমার মনে হয় 'কৃষ্ণ সর্পেষু'র অর্থ গোক্ষুর না হয়ে কেউটে হলে ভাল হোত। লেখক এত বড় মাপের বুদ্ধিজীবী যে তাঁর বিপক্ষে বলতে সংকোচ আসে স্বাভাবিক ভাবেই। তাঁর সম্পর্কে সামান্য পরিচয় দিলে তাঁর লেখার গুরুত্ব উপলব্ধি করা সহজ হবে।

তিনি আন্তর্জাতিক স্তরের বুদ্ধিজীবী লেখক। ১৯৭০ থেকে লন্ডনেই ছিলেন সেখানকার নাগরিক হয়ে। অক্সফোর্ড থেকে পেয়েছেন ডি. লিট.। ডাফ্ কুপার স্মৃতি পুরস্কার পেয়েছেন ১৯৬৬-তে। ১৯৯৩-এ ইংলন্ডের রাণীর কাছ থেকে পেয়েছেন C.B.E. উপাধি। ১৯৮৯-এ পেয়েছেন ভারতের আনন্দ পুরস্কার। ১৯৯৭-এ পশ্চিমবঙ্গ সরকারের পক্ষ থেকে পেয়েছেন বিদ্যাসাগর পুরস্কার। তিনি চারটি ভাষায় দক্ষতা রাখতেন বিশেষভাবে— বাংলা, ইংরেজি, জার্মান ও ফ্রেঞ্চ। ইংরেজ লেখকদের বক্তব্য, তাঁর মতো ইংরেজি লেখা সে দেশের অনেকের পক্ষেই সম্ভব নয়। যেহেতু তিনি ইংলন্ডের প্রবাসী তাই সত্য তথ্য ও তত্ত্ব প্রকাশ করতে ভারত সরকার ও ভারতের কোন সংস্থা, গোষ্ঠী ও ব্যক্তিকে ভয় করেন নি মোটেই। তাঁর লেখায় তা প্রমাণিত।

নীরদ চৌধুরী নিজে বাঙালী হয়েও বাঙালী চরিত্রের মূল্যায়ন করতে যে সাহসিকতা দেখিয়েছেন সে সাহস সাহসই, তা সৎসাহস হোক বা দুঃসাহস।

সিরাজুদ্দৌলার পতনের পর ব্রিটিশ মীরজাফরের কাছে নবাবীর বিনিময়ে এবং যুদ্ধ বাবদ ক্ষতিপূরণের জন্য এককোটি টাকা দাবী করে। কায়স্থ দেওয়ান রায়দুর্লভ হিসাব করে দেখে নিলেন, মোট আছে দেড় কোটি টাকা। তা তিনি সরিয়ে ফেলে শতকরা ৫ টাকা কমিশনের পরিবর্তে প্রয়োজনীয় টাকা যোগাড় করতে পারবেন বলে জানান মীরজাফরকে। ক্লাইভকে বাধ্য হয়ে ঐ কমিশন মেনেই টাকা নিতে হয়। অথচ ঐ রায়দুর্লভ ছিলেন সিরাজুদ্দৌলার অত্যন্ত বিশ্বস্ত (?) এবং ক্লাইভের ভাষায়

'Principal Minister'।

ইংরেজদের ঔরসজাত একটি সম্প্রদায় সৃষ্টির কথা পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে। নীরদবাবু বাঙালীদের জন্য লিখেছেন, "শুনিয়াছি খচ্চর পিতার নাম শুনিতে চাহে না; উহার কারণ তাহার অশ্বীমাতা গর্দভের ঔরসে তাহার জন্ম দান করে। বর্তমান যুগের শিক্ষিত বাঙালীর পিতা হিসাবে ইংরেজ যে গর্দভ জাতীয় ছিল তাহা বলা চলে না, তবুও এই অনিচ্ছা কেন? ইহার প্রকৃত কারণ আবিষ্কার করিতে হইবে।" [আমার দেবোত্তর সম্পত্তি, পৃ. ৪১]

নীরদবাবু লিখেছেন নিজের জীবনের একটি ঘটনা। একটি ট্রেনের কামরায় পাজামা শেরওয়ানি পরা দুজন মুসলমান ভদ্রলোক উঠলেন। লেখক তখন বঙ্গের 'শনিবারের চিঠি' পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন। পিপাসা পাওয়ায় নীরদবাবু ট্রেনে কমলালেবু কিনলেন এবং খেলেনও। তখন পাশে বসা বাঙালী ভদ্রলোকেরা তাঁর পরিচয় নিয়ে জানলেন যে, তিনি বনগ্রামের চৌধুরী বংশের সম্ভ্রান্ত বাঙালী হিন্দু। তখন তাঁরা জানালেন যে, মুসলমানদের সামনে জলপান করলে ধর্মে ক্ষতি হয়। কামরায় মুসলমান ছিল। কমলালেবুতে জল থাকে। তাহলে কি করে তা খাওয়া সম্ভব? শেষে একজন বাঙালী ক্ষুব্ধ স্বরে বলেন, "বনগ্রামের চৌধুরী হয়েই আপনি যদি এরকম দৃষ্টান্ত দেখান, তাহলে সাধারণ লোকে কি না করবে? ১৯২৭ সন, তখন মহাত্মা গান্ধী অস্পৃশ্যতার বিরুদ্ধে আন্দোলন করিতেছেন।" [পৃ. ১৩৬]

বাঙালীদের রুচির পরিচয় দিতে গিয়ে তিনি বলেছেন, পাঁচ-ছ বছরের মেয়েরা সকলের সামনে উলঙ্গ হয়ে ঘুরে বেড়াত। কোমরে একটি ঘুনসী থাকতো মাত্র।

যে ইতিহাসের বিস্তৃত আলোচনা করা হোল তাতে জানা গেল যে, ইতিহাসের আধুনিক বিরাট বেলুনটি প্রকাশিত হয়েছে বাবু সমাজ সৃষ্টির সাথে সাথে। নীরদবাবুও লিখেছেন, "যাহা হউক, রামায়ণ-মহাভারত পড়া কথাতে ফিরিয়া আসি। তখন আমাদের কাছে রামায়ণ মহাভারত প্রাচীন ভারতের একমাত্র ইতিহাস ছিল।"

তিনি আরও লিখেছেন, "আমি যে যুগে জন্মিয়াছিলাম তখন বাঙালীর জীবনে অতি উগ্র একটা আর্যামি ছিল, উহার প্রকাশ দেখা যাইত নব হিন্দুত্বে।... ইংরেজের অধীনতা হইতে মুক্ত হইবার জন্য যখন এইরূপ প্রচেষ্টা চলিতেছিল, ঠিক তখনই মনে মনে ইংরেজ হইবার চেষ্টা ও উদ্যম কি দেশদ্রোহিতা নয়? এই প্রশ্নের উত্তর দিতেই হইবে, এবং এই অধ্যায়ের শেষে নিশ্চয় দিব। আপাততঃ শুধু ইহাই বলিয়া রাখি যে, এই প্রচেষ্টা যদি দেশদ্রোহিতা হয় তবে একা আমিই দেশদ্রোহী নই, প্রতিটি শিক্ষিত বাঙালীই দেশদ্রোহী হইয়াছিলেন।" তিনি আরও বলেছেন, "তখন বাঙালীর মধ্যে সেকসপীয়ার পূজা দুর্গাপূজার চেয়ে কম প্রচলিত ছিল না।" [পৃ. ১৪৬, ১৪৯]

বাঙালীদের স্বামী স্ত্রীর প্রেম এমন পর্যায়ে ছিল যা এখনকার সঙ্গে মিলবেনা। মৌলিক ভালবাসা বলতে যা বোঝায় সেটি তখন ছিল প্রায় অনুপস্থিত। জীবনসাথী, সহযোগিনী স্ত্রী যখন গুরুতর অসুস্থ হোত তখন তাকে রেখে আসা হোত তার বাপের বাড়িতে। স্বামী তার স্ত্রীর জন্য খরচ করতে ছিল অত্যন্ত কুণ্ঠিত। [তথ্য : ঐ, পৃ. ২৫৩-৫৪]

নিজের স্বার্থের জন্য হিন্দু ধর্ম ত্যাগ করে ব্রাহ্ম হওয়া আবার স্বার্থের জন্যই হিন্দু ধর্মে ফিরে আসা তখন একটা নিয়ম হয়ে গিয়েছিল। এ সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। লেখকের বংশও ঐ অভিযোগে অভিযুক্ত।

অধিকাংশ বাঙালী প্রাচীন আর্য সভ্যতা, প্রাচীন ইতিহাস ও সংস্কৃতির কথা প্রচার করলেও লেখক লিখেছেন, "এই সাহিত্যের চর্চা আরম্ভ হয় ১৮১৭ সনে হিন্দু কলেজ প্রতিষ্ঠিত হইবার ফলে।... অবশেষে ১৮৫৭ সনে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইবার পর বাঙালী মনের নতুনরূপ সম্পর্ণরূপে আত্মপ্রকাশ করিল। ইহাকে বাঙালী জীবনের রিনেসেন্স বলা যাইতে পারে। আসলে এই পরিবর্তনকে একটা মানসিক রিভল্যুশানই বলা যেতে পারে।" [নীরদ চৌধুরী : আত্মঘাতী বাঙালী, পৃ. ১৫]

ইংরেজ পরিচালিত ইতিহাস যজ্ঞ বা সাহিত্য যজ্ঞ যা চালানো হয়েছিল তখনকার কলেজগুলোতে, সেখানে বিলেতি দেশী দুরকম অধ্যাপক একসঙ্গে কাজ করতেন। কিন্তু কোন দলই কোন দলের কথা ঠিকমত বুঝতে পারতেন না।

চৈতন্যপ্রভুর প্রশংসা বিশেষভাবে প্রচারিত। তাঁর বৈশিষ্ট্য ছিল তিনি ছিলেন অহিংসবাদী। লেখক প্রমাণ করেছেন যে, তিনি ছিলেন হিংস্র বা জঙ্গী। কারণ "কাজীর বাড়ি আক্রমণ করেছিলেন ও উত্তেজনার বশে শান্তিপুরের ভাষা ভুলিয়া শ্রীহট্টের ভাষায় গর্জন করিলেন, 'তোরে মাইরা ফেলাইমু'।" [ঐ, পৃ. ১৭]

নীরদবাবু লিখেছেন, "পক্ষান্তরে ইতিহাসের দিক হইতে অসত্য ও ভিত্তিহীন একটা ধারণাই উদ্ভূত ও প্রচলিত হইয়াছিল। সেটা এই— বাঙালী প্রাচীন হিন্দু সভ্যতার উত্তরাধিকারী, সেই সভ্যতা বাঙালী জীবনে অটুট ছিল।"

তিনি লিখেছেন, "প্রাচীন হিন্দু সভ্যতার এই রূপান্তর কবে আরম্ভ হয় তাহার কাল নিরূপণ আমি এখনও করিতে পারি নাই। কিন্তু এ বিষয়ে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই যে, মুসলমান আধিপত্য প্রতিষ্ঠাই ইহার প্রধান কারণ।... অন্ততঃ একথাটা অস্বীকার করিবার উপায় নাই যে, মুসলমান যুগই হিন্দু জনসমষ্টির মধ্যে অগণিত লৌকিক ধর্ম, লৌকিক আচার, লৌকিক সাহিত্য ও লৌকিক সঙ্গীত ইত্যাদির সৃষ্টিকাল। ইহার ফলে আমরা যে গ্রাম্য সংস্কৃতির সৃষ্টি করিয়াছিলাম, তাহাই বৃটিশ যুগের প্রাক্কালে আমাদের একমাত্র সম্বল ছিল।"

"এমনকি হিন্দু কলেজ প্রতিষ্ঠিত হইবার পরেও, অর্থাৎ ১৮১৭ সন হইতেও সেক্স্‌পীয়ার পড়াকে যেমন, তেমনি মদ গোমাংস খাওয়াকেও পাশ্চাত্যভাবাপন্ন হওয়ার অঙ্গ বলিয়া অনেকেই মনে করিত।" [পৃ. ৪৪]

এইরকম ভন্ড সমাজ সংস্কারকদের কথা রবীন্দ্রনাথও জানতেন। তাই তিনি তাঁর বইতে লিখেছেন, "তখনকার দিনে কলেজে আমরা দুজনেই এক জুড়ি ছিলুম— দুজনেই মস্ত কালাপাহাড়— কিছুই মানতুম না— হোটেলে খাওয়াটাই একমাত্র কর্তব্য কর্ম বলে মনে করতুম। দু'জনে কতদিন গোলদিঘিতে বসে মুসলমান দোকানের কাবাব খেয়ে তারপর কী রকম করে আমরা হিন্দু সমাজের সংস্কার করব রাত দুপুর পর্যন্ত তারই আলোচনা করতুম।" [দ্রষ্টব্য : ঐ, পৃ. ৪৪]

লেখক বঙ্কিমের কথা বলতে গিয়ে বলেছেন, বঙ্কিম লিখে গেছেন—"কোন কোন তাম্রশ্মশ্রু ঋষির মত্ এই যে, যেমন বিধাতা ত্রিলোকের সুন্দরীগণের সৌন্দর্য তিল তিল সংগ্রহ করিয়া তিলোত্তমার সৃজন করিয়াছিলেন, সেইরূপ পশুবৃত্তির তিল তিল করিয়া সংগ্রহপূর্বক এই অপূর্ব নব্য বাঙালী চরিত্র সৃজন করিয়াছেন। শৃগাল হইতে শঠতা, কুক্কুর হইতে তোষামোদ ও ভিক্ষানুরাগ, মেষ হইতে ভীরুতা, বানর হইতে অনুকরণ পটুতা ও গর্দভ হইতে গর্জন— এই সকল একত্র করিয়া দিঙমন্ডল উজ্জ্বলকারী, ভারতবর্ষের ভরসার বিষয়ীভূত এবং ভট্ট মোক্ষমূলরের আদরের স্থল নব্য বাঙ্গালীকে সমাজাকাশে উদিত করিয়াছেন।" [দ্রষ্টব্য : ঐ, পৃ. ৪৫]

বিশ্বখ্যাত বিবেকানন্দের উক্তি দিয়ে লেখক তুলে ধরেছেন আমাদের দেশের তখনকার পোষাক পরিচ্ছদ এবং চালচলনের ছবি—"মেয়ে মদ্দে কৌপীন পরা। বুদ্ধদেবের বাপ কপনী পরে বসেছেন সিংহাসনে, তদ্বৎ মা-ও বসেছেন— বাড়ার ভাগ এক পা মল ও এক হাত বালা; কিন্তু পাগড়ি আছে। সম্রাট ধর্মাশোক ধুতী পরে চাদর গলায় ফেলে, আদুড় গায়ে একটা ডমরু আকার আসনে বসে নাচ দেখছেন। নর্তকীরা দিব্য উলঙ্গ; কোমর থেকে কতকগুলো ন্যাকড়ার ফালি ঝুলছে। মোদ্দা পাগড়ি আছে— নেবুটেবু সব ঐ পাগড়িতে।" [লেখক উদ্ধৃত করেছেন স্বামী বিবেকানন্দের 'প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য' থেকে, দ্রঃ ঐ, পৃ. ৪৯]

লেখক লিখেছেন, "১৯২০ পর্যন্ত হিন্দু পরিবার আধুনিক হইলেও উহার বিবাহিতা মেয়েরা কখনোই জুতা পরিত না।" লেখক তাঁর মায়ের জন্য লিখেছেন, গাড়িতে তাঁর মায়ের পায়ের জুতোর দিকে তাকিয়ে লোকে জিজ্ঞাসা করতো—'আপনারা?' তাঁর "মাকে বাধ্য হইয়া বলিতে হইত 'আমরা ব্রাহ্ম'। নহিলে বেশ্যা বলিয়া মনে করিবার সম্ভাবনা ছিল"।

"বাঙালী পুরুষ ইংরেজ রাজত্বের আগে একমাত্র মুসলমান নবাবের কর্মচারী হইলে মুসলমানী পোষাক পরিত, উহা অন্দরে লইয়া যাওয়া হইত না। বাহিরে বৈঠকখানার পাশে একটা ঘরে থাকিত। সেখানে চোগা চাপকান ইজার ছাড়িয়া পুরুষেরা ধুতি পরিয়া ভিতরের বাড়িতে প্রবেশ করিত। তাহার প্রবেশদ্বারে গঙ্গাজল ও তুলসীপাতা থাকিত। ম্লেচ্ছ পোষাক পরিবার অশুচিতা হইতে শুদ্ধ হইবার জন্য পুরুষেরা গায়ে গঙ্গাজল ছিটাইয়া মাথায় একটা দুইটা তুলসীপাতা দিত।" [ঐ পৃ. ৫০]

বাঙালী চরিত্র চিত্রিত করতে শ্রী চৌধুরী লিখেছেন, গৃহিণীর দু তিনটি ছেলেপুলে হওয়ার পরেও স্ত্রীকে চিনতে পারতো না তার স্বামী—"তিন ছেলের মা হইবার জন্য যতটুকু প্রেমের প্রয়োজন হয় তাহা অবশ্য পাইয়াছিলেন। ... প্রথমতঃ তখনও গোঁড়া পরিবারে স্বামী স্ত্রীর সাক্ষাত দিনের বেলায় হইত না। স্ত্রী ঘরের কাজ শেষ করিয়া রাত্রি নয়টা দশটা নাগাদ গিয়া শুইয়া থাকিতেন। মশার জন্য মশারি থাকিত, তাহা ভারী হইত— 'নেটে 'র হইত না। বাহিরে পিলসুজের উপর প্রদীপ টিমটিম করিয়া জ্বলিত। কাছে একটা লম্বা কঞ্চে থাকিত। স্বামী দশটার পর বাহির বাটী হইতে আসিতেন ও শয়নঘরে ঢুকিয়া বিছানার কাছে গিয়া সেই কঞ্চে দিয়া দীপ নিবাইয়া স্বস্থান অধিকার করিতেন। সুতরাং পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়ের মধ্যে প্রধান যেটি, অর্থাৎ চক্ষু, সেটা দিয়া স্ত্রীকে উপলব্ধি করার সুযোগ হইত না, অন্য চারটি অর্থাৎ কর্ণ, জিহ্বা, নাসিকা ও ত্বক মাত্র দিয়া হইত। স্ত্রীরও তদ্রুপ। ... এই অসুবিধা ছাড়া একটা বিশেষ ধরণের স্ত্রী আচারের জন্যও আমাদের অঞ্চলে ঘরে আলো রাখা হইত না। তখন সেখানে সম্পন্ন গৃহস্থেরও পাকা বাড়ী ছিলনা। আটচালাগুলির বেড়া হইত দরমার, তাহাতে ফাঁক বা ছিদ্র থাকিত। রাত্রিতে কৌতুহলী জায়েরা ও ননদেরা ঐসব জায়গায় চক্ষু রাখিয়া দাম্পত্য প্রেম কিরূপ তাহা দেখিতে চাহিত। সুতরাং বুদ্ধিমান স্বামীরা শয্যায় প্রবেশ করিবার আগেই প্রদীপ নিবাইত, পত্নীকে লজ্জা নিবারণের জন্য মুষ্টিচূর্ন ছুড়িয়া নিবাইতে হইত না।" [পৃ. ৭২-৭৩]

"বাঙালীর মধ্যে মাতৃভক্তি লইয়া শুধু বাড়াবাড়ি নয়, ভন্ডামি আছে। উহার সবচেয়ে ঘৃণ্যরূপ দেখা যাইত একটি প্রচলিত উক্তিতে— সেটি বিবাহ করিতে যাইবার আগে মাকে বলা—'মা তোমার জন্য দাসী আনতে যাচ্ছি'। বিবাহের ও নরনারীর প্রেমের ইহার অপেক্ষা গুরুতর অবমাননা কল্পনা করা যায় না। ইহার মধ্যে ভন্ডামি কোথায় ছিল বলিতেছি। পুত্র রাত্রির জন্য বেশ্যা চান, তাই মাকে দাসী আনিয়া দিবার ভান করেন; মাতা চান দাসী। তাই পুত্রকে বেশ্যা যোগাড় করিয়া দেন।" [ঐ, পৃ. ৮০]

"আমাদের সমাজে তখনকার দিনে সম্বন্ধের বিবাহে অসুখ প্রধানতঃ হইত বধূর রূপ না থাকিলে। পুত্র রূপসী বধূ চায়, পিতা বংশ বা টাকার খাতিরে রূপহীনার সহিত তাহার

বিবাহ দিতেন। রূপ সম্বন্ধে আপত্তি সে যুগের পিতাদের বোধগম্যই হইত না। তাঁহারা মনে মনে বলিতেন, 'তোকে কে রূপের পেছনে যেতে মানা করেছে। তা চাস্ তো বেশ্যাবাড়ি আছে, পরস্ত্রী আছে এমনকি ঘরেও বৌদিদিরা আছে। তাদের নিয়ে যা কিছু কর না, আমি কি তা দেখতে যাচ্ছি ?'' [ঐ, পৃ. ১০৪-১০৫]

তখন ছোট ছোট কচি মেয়েদের বিয়ে হোত, আর জামাইটি হোত অনেকক্ষেত্রেই যুবক। সুতরাং জামাতার যৌনক্ষুধা ঐ ছোট মেয়ে মেটাতে সক্ষম নয় বলে শাশুড়িরাই অনেকক্ষেত্রে সে দায়িত্ব পালন করতেন। সেজন্য শাশুড়িরা জামাতার সামনেও ঘোমটা দিতেন, সম্ভ্রমের সঙ্গে কথা বলতেন এবং 'তুমি' না বলে 'আপনি' বলতেন। নীরদ চৌধুরী তাই লিখেছেনও—''তবে সেকালে অনেক সময়েই শাশুড়ি ও জামাতার বয়স প্রায় সমান সমান হইত, বধূ হয়ত হইত এগারো বারো বছরের। তাই যেসব শাশুড়িরা আচরণ সম্বন্ধে অবহিত হইতেন তাঁহারা জামাতার সম্মুখেও ঘোমটা দিয়া থাকিতেন, এবং কথা কহিলেও অত্যন্ত সম্ভ্রমের সহিত বলিতেন। আমার দিদিমাকে এইরূপ দেখিতাম। কিন্তু সকল শাশুড়ি এক চরিত্রের হইতেন না, তখন আগুনের খাপরার যত প্রগলভা নায়িকাতুল্যা শাশুড়ির কাছে কচি স্ত্রী মুগ্ধা নায়িকার মতও হইত না, নিতান্ত কাঁচা পেয়ারার মত হইত।'' [পৃ. ১২১-১২২]

তারপর লেখক বিভূতিবাবুর সমপাঠীর উল্লেখ করে একাধিক ঘটনা লিখে প্রমাণ করেছেন যে, তখন শাশুড়ি জামাইয়ের যৌন সম্পর্কের একটা নিয়ম বা রেওয়াজ ছিল।

লেখক নিজের জন্য প্রচন্ড সাহসিকতার সঙ্গে লিখেছেন—''আমার নিজের বিবাহের সময় আমার বয়স ও আমার স্ত্রীর বয়সের মধ্যে বারো বৎসরের পার্থক্য ছিল, এবং আমার আর আমার শাশুড়ির মধ্যে পার্থক্য ছিল তেরো বছরের। সুতরাং বিভূতিবাবুর সমপাঠীর মত চরিত্র আমার হইলে সহজেই উভচর হইতে পারিতাম। বিভূতিবাবু যে ইতিহাস দিলেন তাহা আমাদের কালেও ঘটিতে পারিত।'' [ঐ, পৃ. ১২২]

বাঙালী জমিদার বাবুদের বার্ধক্যের চিত্র অঙ্কন করতে গিয়ে লিখেছেন, ''রাজা বাহাদুর তখন অশীতিপর বৃদ্ধ। তাহা ছাড়া বাতে পঙ্গু। সুতরাং তিনি তাঁহার যুবা বয়সের রক্ষিতার বাড়িতে যাইতে পারেন না। তাই প্রায় প্রতি সন্ধ্যায় বৃদ্ধা রক্ষিতা তাঁহার বাড়িতে আসিয়া রাত্রি দ্বিপ্রহর পর্যন্ত পদসেবা করিয়া নিজের বাড়িতে ফিরিয়া যাইতেন। মনে রাখিতে হইবে সম্ভ্রান্ত বাঙালী গৃহস্থ তখনকার দিনে প্রৌঢ় হইবার পর আর অন্তঃপুরে ঘুমাইতেন না। ব্যাপারটা শুনিয়া বুঝিলাম, ইংরেজি শিক্ষার গুণে রক্ষিতার বেলাতেও সতীত্বের আদর্শ স্থাপিত হইয়াছে। প্রৌঢ় স্বামী পত্নীকে অবহেলা করিলেও উপপত্নীকে ভোলেন নাই। কারণ পত্নী তাঁহার পিতার দান, উপপত্নী স্বেচ্ছাবৃত প্রণয়িনী।'' [ঐ, পৃ. ১২৬]

লেখকনিজের জন্য লিখেছেন, ''সেজন্য আমি সারা জীবনেও দেশে কোন থিয়েটার দেখি নাই। আমার বাল্যকালে অভিনেত্রীরা বেশ্যা বলিয়া থিয়েটারের প্রতি ব্রাহ্মপন্থীদের ঘোর আপত্তি ছিল।''

ব্রাহ্ম ও রক্ষণশীল হিন্দুরা অনেকক্ষেত্রে ভিন্নমুখী হলেও নারীর প্রতি ব্যবহার প্রায় একই রকম করতেন। লেখক লিখেছেন, ''কিন্তু তিনটি ব্যাপারে না ব্রাহ্ম, না নব্য রক্ষণশীল বাঙালী কেহই ঢিলা দিতে প্রস্তুত ছিলেন না। এই তিনটি এই— স্ত্রীলোক ঘটিত অনাচার, অর্থঘটিত অসততা ও মদ্যপান।'' [ঐ,পৃ. ১৬৪]

ধর্মে দ্বিচারিতার কথা পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে। ব্রাহ্ম লেখক নীরদবাবু নিজের জন্য লিখেছেন, ''গ্রামের পৈতৃক বাড়িতে ধূমধাম করিয়া দুর্গাপূজা হইত। তাহাতে যোগ দিবার জন্য প্রতি বৎসর কিশোরগঞ্জ শহর হইতে পৈতৃক নিবাস বনগ্রামে যাইতাম— বলির পাঁঠার তত্ত্বাবধান করিতাম, পাঁঠা এবং মহিষ বলি দেখিতাম।'' [ঐ, পৃ. ১৬৫-৬৬]

ব্রাহ্ম পুরোহিতরা এই দ্বিচারিতা পছন্দ করতেন না। তাই এক ব্রাহ্ম পুরোহিতের প্রার্থনার কথা উল্লেখ করে লিখেছেন, ''তিনি অন্যান্য প্রার্থনার মধ্যে ঈশ্বরের কাছে এই প্রার্থনাও করিলেন,— হে ভগবান, যাহারা দুর্গাপূজার ছুটির সময় গ্রামে গিয়া দুর্গার প্রতিমাকে প্রণাম করে আর শিলং-এ আসিয়া তোমার উপাসনা করিতে চায় তাহাদের মাথায় কুঠার মারো, কুঠার মারো, কুঠার মারো। কিন্তু ইহা সত্ত্বেও শিক্ষিত হিন্দুরা দুই কুলই রাখিয়া দুর্গাপূজা ও ঈশ্বরের আরাধনা করিতে লাগিল।'' [ঐ,পৃ. ১৬৭]

বাঙালী বঙ্কিমচন্দ্র বাঙালীর চরিত্র জেনে শুনেই লিখেছেন, ''আমরা একটি জমিদার দেখিয়াছি। তিনি জাতিতে ব্রাহ্মণ এবং অত্যন্ত হিন্দু। তিনি অতি প্রত্যুষে গাত্রোত্থান করিয়া কি শীত কি বর্ষা প্রত্যহ প্রাতঃস্নান করেন এবং তখনই পূজাহ্নিকে বসিয়া বেলা আড়াই প্রহর পর্যন্ত অনন্যমনে নিযুক্ত থাকেন। পূজাহ্নিকের কিছুমাত্র বিঘ্ন হইলে, মাথায় বজ্রাঘাত হইল, মনে করেন। তারপর অপরাহ্নে নিরামিষ শাকান্ন ভোজন করিয়া একাহারে থাকেন— ভোজনান্তে জমিদারি কার্যে বসেন। তখন কোন্ প্রজার সর্বনাশ করিবেন, কোন্ অনাথা বিধবার সর্বস্ব কাড়িয়া লইবেন, কাহার ঋণ ফাঁকি দিবেন, মিথ্যা জাল করিয়া কাহাকে বিনাপরাধে জেলে দিতে হইবে, কোন্ মোকদ্দমার কি মিথ্যা প্রমাণ প্রস্তুত করিতে হইবে, ইহাতেই তাঁহার চিত্ত নিবিষ্ট থাকে, এবং যত্ন পর্যাপ্ত হয়। আমরা জানি যে, এ ব্যক্তির পূজায়, আহ্নিকে, ক্রিয়াকর্মে, দেবতা ব্রাহ্মণে আন্তরিক ভক্তি, সেখানে কপটতা কিছু নাই। জাল করিতেও হরিনাম করিয়া থাকেন। মনে করেন এসময় হরি স্মরণ করিলে এ জাল করা অবশ্য সার্থক হইবে।'' এরপর শ্রীনীরদচন্দ্র লিখেছেন— ''এরপর

বঙ্কিম এইসব বলিয়া প্রশ্ন করিলেন, 'এ ব্যক্তি কি হিন্দু ?' এ যে হিন্দু সে বিষয়ে সন্দেহ নাই, কারণ সে সময়ে হিন্দুত্বে ঐহিক ও পারত্রিক ব্যাপার সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র হইয়া গিয়াছিল। ... বঙ্কিমের এই রচনার তারিখ ১৮৮৪।" [ঐ,পৃ. ১৭৪-৭৫]

বাঙালীদের মধ্যে দুরকমের মানুষ ছিলেন। একতরফে অনুন্নত অশিক্ষিত মূর্খ জনগণ, আর অন্য দিকে কাজ চলা গোছের আধাশিক্ষিত, ইংরেজ শাসকের কর্মচারি বা সাহায্যকারী সম্প্রদায়। প্রথমদিকে ইংরেজরা যাঁদেরকে ফোর্ট উইলিয়ম প্রভৃতি কলেজের প্রফেসর বলে চালিয়েছে তাঁরা অনেকে ছিলেন নামমাত্র পন্ডিত। তাঁরা ছাত্রদের সঙ্গে কেমন আচরণ করতে হয় জানতেন না। ছাত্রদের সামনে নিজেদের মধ্যে যা আলোচনা করতেন তা মোটেই শিক্ষকসুলভ ছিল না। কোন ক্ষেত্রে ছাত্রদের তিরস্কার করার প্রয়োজনে এমন সব কথা বলতেন তা আজকের সভ্য সমাজে অকল্পনীয়। যেমন : "পন্ডিতদের দ্বিতীয় উদ্দেশ্য ছিল, ছাত্রদের সঙ্গে বদ রসিকতা করা— কোনও সময় প্রচ্ছন্নভাবে, কোনও সময় খোলাখুলি। ছাত্রেরা অধ্যাপকের উক্তি মাথা নিচু করে শ্রদ্ধা সহকারে শুনিত।... আশ্চর্যের কথা এই, রাগিলেও পন্ডিত মহাশয়েরা এই অধঃপতিত কাম হইতেই ভর্ৎসনার পারিপাট্য সাধন করিতেন। কলিকাতায় এক পন্ডিত মহাশয় রাগিলেই বলিতেন, 'তো ছোঁড়াদের যা অবস্থা তাতে তো বিছানার চাদর কেচে জল খাইয়ে দিলে ছুঁড়িদের পেট হয়ে যাবে'।" [দ্রষ্টব্য শ্রী নীরদচন্দ্র চৌধুরী : বাঙালী জীবনে রমণী, পৃ. ৪৭]

১৮৩১-এর ৫ই নভেম্বর সম্বাদ সুধাকর পত্রিকায় যে সম্পাদকীয় প্রকাশিত হয়েছিল তাতে স্বচ্ছল পরিবারের ছবি আঁকতে সক্ষম হয়েছিলেন সম্পাদক—

"ইঙ্গরেজি বিদ্যা শিক্ষা করণাশয়ে তিনি স্বদেশ পরিত্যাগ পূর্বক কলিকাতায় উপনীত হইয়া সুযোগক্রমে এতন্নগরস্থ কোন প্রধান ব্যক্তির ভবনে বাসা করিলেন। দিবা অবসানে যখন ঐ বিপ্রসন্তান সায়ংসন্ধ্যা করিয়া বসিয়াছিলেন তখন প্রথমতঃ বাটীর বৃদ্ধ কর্তা, তৎপরে তাঁহার জ্যেষ্ঠ ও মধ্যম পুত্র ও পরে তাঁহার কনিষ্ঠ পুত্রও, ইহারা একে একে তাবৎই বাটী হইতে বহির্গমন করিলেন, তৎপরে দুইজন দৌবারিক ও অন্য কোন কোন চাকর অন্দর মহলে প্রবেশ করিয়া নিশাবসান করিল, যাবৎ কর্তা ও তাঁহার পুত্রেরা বাহিরে যামিনী যাপন করিয়া প্রাতঃকালে গৃহে প্রত্যাবর্তন করিলেন।... যদিও উপরিউক্ত বৃত্তান্ত পাঠ করণান্তর অস্মদাদির ইঙ্গরেজ পাঠকেরা মনে মনে হাস্য করিয়া হিন্দু দিগের প্রতি ঘৃণা জন্মিলেও অসঙ্গত হয়না, তথাচঐ রূপ রীতি চরিত্র এই রাজধানীর মধ্যে এতাদৃক চলিত হইয়াছে যে এক্ষণে প্রায় অনেক বিশিষ্ট লোকেরা ইহাতে আশ্চর্যজ্ঞান করিবেন না।" [ঐ, পৃ. ৫২]

"বঙ্কিমচন্দ্র লিখিয়াছিলেন, 'স্ত্রীলোকদিগের উপর যেরূপ কঠিন শাসন, পুরুষদিগের উপর সেরূপ কিছুই নাই। কথায় কিছু হয় না; ভ্রষ্ট পুরুষের কোন সামাজিক দন্ড নাই।

একজন স্ত্রী সতীত্ব সম্বন্ধে কোন দোষ করিলে সে আর মুখ দেখাইতে পারে না; হয়ত আত্মীয়স্বজন তাহাকে বিষ প্রদান করেন; আর একজন পুরুষ প্রকাশ্যে সেইরূপ কার্য্য করিয়া, রোশনাই করিয়া, জুড়ি হাঁকাইয়া রাত্রি শেষে পত্নীকে চরণরেণু স্পর্শ করাইয়া আসেন; পত্নী পুলকিত হয়েন; লোকে কেহ কষ্ট করিয়া অসাধুবাদ করে না; লোক সমাজে তিনি যেরূপ প্রতিষ্ঠিত ছিলেন, সেরূপ প্রতিষ্ঠিত থাকেন, কেহ তাঁহার সহিত কোন প্রকার ব্যবহারে সঙ্কুচিত হয় না; এবং তাঁহার কোন প্রকার দাবিদাওয়া থাকিলে স্বাচ্ছন্দ্যে তিনি দেশের চূড়া বলিয়া প্রতিভাত হইতে পারেন।'— অবশ্য এই বৈষম্য কমবেশী পৃথিবীর সর্বত্রই ছিল এবং আছে তবে পুরাতন বাঙালী সমাজে খুবই বেশী ছিল। সুতরাং কুলনারী-কুমারী, সধবা ও বিধবা যাহাই হউক না— প্রবৃত্তির বশে বা অনেক সময় অর্থের প্রলোভনে কিংবা পারিবারিক অত্যাচারে পরপুরুষের প্রতি আসক্ত হইলে তাহাকে কুলত্যাগ করিয়া যাইতে হইত। চলিত ভাষায় ইহাকে বলা হইত 'বাহির হইয়া যাওয়া'। ইহাদের শেষ গতি প্রায় সব ক্ষেত্রেই হইত বেশ্যালয়ে।" [ঐ, পৃ. ৬৭]

তিনি শিবনাথ শাস্ত্রী ও বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সময়ের দুটি ঘটনার উল্লেখ করেছেন,তাতেও প্রমাণ হয় বাঙালী চরিত্রের নগ্নরূপ। শ্বশুরেরা পুত্রবধূরদের সঙ্গে যৌনপাপে লিপ্ত ছিলেন। আর জামাতাদের শাশুড়ির সঙ্গে অপকর্মে লিপ্ত হবার ইঙ্গিত পূর্বেই দেওয়া হয়েছে। নীরদবাবু লিখেছেন, "সেকালে বাঙালীদের মধ্যে 'শাশুড়েএবং বৌও' বলিয়া দুটি গালি শোনা যাইত, উহার প্রথমটির অর্থ শাশুড়িরত ও দ্বিতীয়টির অর্থ পুত্রবধূরত।... এই অনাচার ছাড়া দেবর-ভাতৃবধূ এমনকি ভাসুর-ভাদ্রবৌয়ের মধ্যেও অনাচার দেখা যাইত। দেবর-ভাতৃবধূর ফ্লার্টেশ্যন সামাজিক আচার ব্যবহারেরই অন্তর্ভুক্ত ছিল। উহা কোনও কোনও সময়ে দৃষ্টিকটু বা শ্রুতিকটু হইলেও কেহ দোষ ধরিত না।... কিন্তু সমাজের মধ্যে এই ধরণের অনাচার বেশি হইত অল্প বয়স্কা বিধবার সম্পর্কে। তাহাদের পদস্খলন যখন হইত, তাহা যে নিকট-আত্মীয়ের দ্বারা হইত সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। কিন্তু এ বিষয়ে সমস্ত বাঙালী সমাজ জুড়িয়া একটা বিরাট ভন্ডামি ছিল। ব্যাপক ভাবে ভ্রূণ হত্যা চলিলেও এই সামাজিক পাপ সম্বন্ধে সম্ভব হইলে সকলেই চুপ করিয়া থাকিত। বিদ্যাসাগর মহাশয় বিধবাদের দুঃখ এবং এই অনাচার, দুই দেখিয়াই বিধবা বিবাহের আন্দোলন আরম্ভ করিয়াছিলেন।... বাঙালী সমাজে বেশ্যাসক্তির পরিব্যাপ্তি সম্বন্ধে সন্দেহের কোনও অবকাশ নাই। ব্রাহ্ম ধর্মের নৈতিক শিক্ষা প্রচার হইবার আগে বেশ্যালয়ে যাওয়া পুরুষের পক্ষে স্বাভাবিক বলিয়া ধরা হইত। অবশ্য সেখানে গেলে ধার্মিক বলিয়া খ্যাত হওয়া যাইত না কিন্তু নিন্দার বিষয়ও ছিল না। বরঞ্চ সাধারণ লোকে বিষয়ী সচ্চরিত্র ব্যক্তির অপেক্ষা দুশ্চরিত্র ব্যক্তিকেই বেশি ভালবাসিত কারণ একদিকে

তাহাদের কুটিলতা, অর্থগৃধ্নুতা, ষড়যন্ত্র পরায়ণতা ইত্যাদি দোষ কম হইত অন্যদিকে তাহারা উদার প্রকৃতির ক্ষমাশীল মানুষ হইত। তাই একটি পুরাতন পুস্তকে এইভাবে দুশ্চরিত্র ব্যক্তির প্রশস্তি গাওয়া হইয়াছিল— 'লোকে যারে বলে লুচ্চ, সে কেবল জানিবা কুচ্ছ, লুচ্চ বিনা মজা জানে নাই / মারে মন্ডা আদা ছেনা, সাদা থাকে বাবুয়ানা, সোনাদানা তুচ্ছ তার ঠাঁই। / মাতাপিতা দাদাভাই, কাহার তোয়াক্কা নাই, দুঃখী নাহি হয় কার দুখে / কেহ যদি কটু বলে, সে কথা গায়ে না তোলে, সর্বদা সরল কথা মুখে। / বুদ্ধির নাহিক ওর, নরমেতে করে জোর, গরম নরম তার কাছে / যার সঙ্গে কোন ঠাঁই, কোনকালে দেখা নাই, যেন কত আলাপন আছে / লুচ্চ হলে দাতা হয়, কাহারও না করে ভয়, কেবল প্রেমের বশ রয়, / যে জন পিরিতে রাখে, তার প্রেমে বন্দী যাকে, তার জন্য বহু দুঃখ পায়।'

ইহাতে অবশ্য খানিকটা শ্লেষ আছে। তবুও ইহাকে সাধারণভাবে বেশ্যাসক্ত ব্যক্তি সম্বন্ধে জনমতের প্রমাণ হিসাবে গ্রহণ করা যাইতে পারে। অপর পক্ষে শহরে বেশ্যাদের খ্যাতি, প্রতিষ্ঠা, প্রসার-প্রতিপত্তি ও অর্থসম্পদ সম্বন্ধে কোনও সন্দেহ করা চলেনা। নাম করিতে হইলে স্ত্রীলোককে হয় জমিদারের স্ত্রী অথবা বারাঙ্গনা হইতে হইত। রাণী ভবানী হইতে আরম্ভ করিয়া রাণী রাসমণি, মহারাণী স্বর্ণময়ী, রাণী জাহ্নবী চৌধুরাণী পর্যন্ত রাণীরা যতই নামজাদা হোন না কেন, অন্যদিক হইতে আর এক রকমের নামের জোরও কম ছিলনা।... ইহার তৎকালীন ব্যাখ্যা দিতেছি, 'সেই স্ত্রীলোক স্বনামা যাহারদিগের নাম করিলে অনায়াসে বাবুগণ জানিতে পারেন; মধ্যমা-মাতৃ নামে যাহারা খ্যাত, তাহাদিগেরও বাবুরা জানেন। অধমা তাহারা, ছুকরীদের নামে যাহাদের পরিচয়; কিন্তু কুলবধূ সকলকে কোন বাবু জানেন না, এ কারণ তাহারা অধমের অধম'।" [দ্রষ্টব্য : ঐ, পৃ. ৬৯-৭১]

সত্যি কথা বলতে কি, তখনকার দিনে সাধারণ কুলবধূদের অপেক্ষা পতিতা বা বারাঙ্গনাদের যে বিশেষ শিক্ষা দেওয়া হোত তার অনেকাংশ বিজ্ঞানসম্মত—"প্রত্যেক বেশ্যামাতাই জন্ম হইতে কন্যাকে শিক্ষা দিয়া থাকে। প্রথমে মিতাহার ইত্যাদির দ্বারা শরীরের তেজবল বাড়ায়। পাঁচ বৎসর বয়সের পর পিতার সহিতও বেশি মিশিতে না দিয়া বড় করে। জন্মদিনে পুণ্যদিনে উৎসব ও মঙ্গলবিধি করিয়া থাকে। পুরাপুরি কামশাস্ত্র পড়ায়; নৃত্যগীত, বাদ্য, চিত্রাঙ্কণ ইত্যাদি সকল কলা শেখায়; লিপিজ্ঞান ও বচন কৌশল আয়ত্ত করায়; ব্যাকরণ তর্কশাস্ত্র জ্যোতিষও কিছু কিছু শেখায়; নানা রকম ক্রীড়া কৌশল, দূতক্রীড়া ইত্যাদিতে দক্ষ করে— ইত্যাদি। এইরূপ আরও বহু জিনিস শিক্ষা দেওয়া হইত। পরে পর্বদিনে সাজাইয়া গুজাইয়া মেলা ও লোক সমাগমের স্থানে পাঠানো হইত, যাহাতে ধনী প্রণয়ী আনিতে পারে।" [দ্র. ঐ, পৃ. ৭২]

বারাঙ্গনারাও বুঝতো যে তাদের যৌনাচার প্রেম নয়, রোজগারের ধান্ধা মাত্র। তাদের মনস্তত্ত্বে যথেষ্ট জ্ঞান না থাকলে তারা এত সামাজিক হতে পারতো না মোটেই। একজন শিক্ষয়িত্রী-বারাঙ্গনার কথা—"অতএব বাছা, আমারদিগের প্রেম যাহা হইতে অধিক টাকা পাওয়া যায়, তাহাদিগেরই সহিত প্রেম হয়, কিন্তু তাহাও নিপট প্রেম নয়, সেই কপট প্রেম জানিবা। বেশ্যা সত্যকার প্রেমে পড়িলে কলিকাতার খানদানি সমাজে প্রেমপত্রকে ইংরেজি অক্ষরে সংক্ষিপ্তভাবে পি-এন্ বলা হইত। এই দুর্বলতার কথা ধরিবার নয়। আসল বেশ্যার প্রেম সম্বন্ধে এইরূপ শিক্ষা দেওয়া হইত— 'তুমি এই প্রকার প্রেম করিবা, কাহারও দমে ভুলিবা না। বাবুকে আপনার কাবুতে আনিবা। ইহার পন্থা এই ছয় 'ছ'। (পঞ্চ 'ম' কারের মত) শিখিলে হয়, যথা— ছলনা, ছেনালি, ছেলেমি, ছাপান, ছেমো, ছেঁচড়ামি। অন্যগুলির অর্থ পাঠক অল্প স্বল্প অনুমান করিতে পারিবেন, তাই শুধু 'ছেমো' সম্বন্ধীয় শিক্ষা উদ্ধৃত করিতেছি। রক্ষিতা অবস্থায় থাকার সময়ে বাবু সন্দেহ করিয়া রাগ করিলে তাহাকে জব্দ করিবার উপায়কে 'ছেমো' বলে। বাবু সন্দেহ করিলেই ক্রোধ করিয়া মৌনা হইয়া থাকিতে হইবে। অনেক সাধ্য সাধনার পরও এক আধটা কথা কহিয়া নীরব থাকিতে হইবে। এইরূপ হক্-নাহক্ ক্রোধ করিয়া মৌনা হইয়া থাকিলে তাহাকেই ছেমো বলে। যদ্দপি প্রবঞ্চনা করিয়া কিঞ্চিৎ কপট রোদন করিতে পার তবে বড়ই ভাল এবং তোমার মাথা খাই এই একটি মাত্র কথা মুখ হইতে অর্ধেক নির্গত করিয়া দুই চক্ষে এক এক ফোঁটা জল বাহির করিয়া নীরব থাকিলেই বাবুর ক্রোধ মার্গে ঢুকিবেক, উল্টিয়া তোমাকে সাধ্য সাধনা করিবেন, এবং তোমাকে যত সাধিবেন তুমি ততই আপনার ছেমো প্রকাশ করিবা।... ধনী বা সচ্ছল লোকের বাড়িতে বেশ্যাসক্তি এতই স্বাভাবিক বলিয়া মানিয়া লওয়া হইত যে খাজাঞ্চিখানাতে এই বাবদ খরচপত্রের জন্য 'স্ট্যাণ্ডিং অর্ডার' কর্তার কাছ হইতে থাকিত, অবশ্য অনুচ্চারিত ভাবে। সুতরাং খাজাঞ্চি খতিয়ানে লিখিতে পারিত, 'ছোটবাবুর হিসাবে লালপেড়ে শান্তিপুরে শাড়ীর বাবদে দশ বা পনের টাকা'।" [দ্রঃ ঐ, পৃ. ৭২-৭৩]

নীরদবাবু শুধু কবির মত কল্পনা করে লিখে যান নি। তিনি একজন বিশিষ্ট লেখক এবং সুভাষচন্দ্র বসুর সহোদর শরৎ বসু, যিনি বাংলা তথা ভারতের কংগ্রেসের নেতা এবং যাঁর বাড়িতে গান্ধীজী, জহরলাল, মোরারজি, কিরণশঙ্কর এক কথায় বড় বড় নেতাদের আসতে হোত, তাঁর প্রাইভেট সেক্রেটারিও ছিলেন কিছুদিন।

তখনকার সমাজের ছবি আঁকতে গিয়ে লিখেছেন—"তবে ভদ্র যুবকেরা ইয়ারমহলে নিজের পত্নীকে লইয়াও যেভাবে আলাপ করিত, তাহাতে শালীনতার কোন গন্ধই থাকিত না। শুধু স্ত্রীর স্তন-নিতম্বের বর্ণনাতেই আলাপ আবদ্ধ থাকিত না, আরও অনেক গোপনীয়

স্থান পর্যন্ত যাইত।"

হামেশা যে সব ঘটনা ঘটতো তার কিছু উদাহরণ সত্য ঘটনা হিসাবে তিনি দিয়েছেন অকপটে। যেমন নিকটাত্মীয়া বোনের গর্ভসঞ্চার, কাকা-ভাইঝির অবৈধ প্রণয় ইত্যাদি। শেষে এ কথাও লিখেছেন—" ... ইহাদের পরস্পরের কথামত কলিকাতার প্রত্যেকটি সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিই হয় জারজ, নয় পরস্ত্রীরত, নয় অন্যরকম অপরাধে অপরাধী। যে সমস্ত আলাপের পিছনে ছিল স্ত্রী জাতি সম্বন্ধে একটা অবিচ্ছিন্ন কামজ উত্তেজনা ও কলুষিত চিন্তা ও কল্পনা।" [পৃ. ৭৬ দ্রষ্টব্য]

বিশাল ভারতবর্ষের রাজধানী তখন কলকাতা। চলছিল ইংরেজ সরকারের শাসন। তাদের পৃষ্ঠপোষকতায় সমাজ যেভাবে এগিয়ে যাচ্ছিল, কলেজ ইউনিভার্সিটিতে পড়ার রুচি সৃষ্টি হয়ে যাঁরা সব হোস্টেলে বা মেসে থাকতেন তাঁদের প্রত্যক্ষদর্শীর মত মিঃ চৌধুরী লিখেছেন, "উহা বেশ্যালয়ের শেষরাত্রি— যখন অপরিমিত মদ্যপানের আবেশে ও অবিরত সম্ভোগের অবসাদে বিস্রস্তবসন যুবক যুবতী বমির উপর অজ্ঞান হইয়া পড়িয়া থাকিত, আর বন্ধুদের পরদিন সকালে মেস হইতে আসিয়া বন্ধুকে ধুইয়া মুছিয়া পরিষ্কার করিয়া ফিরাইয়া লইয়া যাইতে হইত।"

চরিত্রের অবনতি এতদূর হয়েছিল যে, ভয়াবহ বন্যার পর বন্যাবিধ্বস্ত এলাকায় সাহায্যের জন্য স্বেচ্ছাসেবকেরা সাহায্য ভিক্ষা করলে আশানুরূপ সাহায্য পাওয়া যেত না। তাই প্রকাশ্যে বেশ্যাদের নিয়ে তাদের রূপ ও গানের বিনিময়ে চাঁদা তোলার ব্যবস্থা হোত।

লেখক দেশি বিলেতি উভয় সভ্যতার সঙ্গেই পরিচিত। প্রায় সব দেশেই নারীর স্তন আচ্ছাদিত রাখা হয়। কিন্তু আমাদের দেশে যুবতীদের স্তন আচ্ছাদিত রাখার চেতনার অভাব ছিল যথেষ্ট। রবীন্দ্রনাথের লেখা দিয়ে তা প্রমাণ করেছেন নীরদবাবু। তিনিও লিখেছেন, "নারীর দেহ সম্বন্ধে পুরাতন কদর্যতা কোথায় গেল? আমিও কিশোরী মাতাকে বিনা সঙ্কোচে আমার সম্মুখে স্তন্যপান করাইতে দেখিয়াছি।" [পৃ. ১২৮]

প্রত্যেকটা বিষয়ে বাঙালীর বাড়াবাড়ির নমুনা দিতে গিয়ে পন্ডিত শশধর চূড়ামণির ধর্মপ্রচারের দৃষ্টান্ত দিয়েছেন তিনি। খৃষ্টান ধর্মের বিরুদ্ধে বক্তব্য রাখতে গিয়ে এবং হিন্দু ধর্মকে প্রতিষ্ঠিত করতে তিনি যে কৌশল নিয়েছিলেন তা নিঃসন্দেহে সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত ছিলনা, তা ছিল ভন্ডামি ও শঠতা। হিন্দু শ্রোতাদের বক্তা জিজ্ঞাসা করছেন, "খৃষ্টানের ভগবানের কি নাম আপনারা বলুন। শ্রোতারা চিৎকার করিত, GOD। তর্ক চূড়ামণি বলিতেন, 'উহা উল্টান'। শ্রোতারা বলিত DOG। শশধর বলিতেন, তবে! এইবার আমাদের ভগবানের নাম বলুন। পূর্বে শিক্ষাপ্রাপ্ত দু চারজন শ্রোতা বলিতেন,— 'নন্দনন্দন'। শশধর বলিতেন, আবার উল্টান্। কি হইল? চতুর্দিক কাঁপাইয়া ধ্বনি

উঠিত, 'নন্দনন্দন'। শশধর আবার বলিতেন, তবে! হিন্দুধর্মের শ্রেষ্ঠত্ব নিঃসংশয়ে প্রমাণ হইয়া যাইত।" [পৃ. ১৫৮ দ্রষ্টব্য]

লেখক নিজে বাঙালী হয়েও বাঙালী জাতির উল্লেখযোগ্য নেতা বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের বিষয়েও লিখতে কুন্ঠিত হন নি, অথচ তিনি বঙ্কিমের একজন ভক্তও। বঙ্কিমের পাঁচ বছরের মেয়েকে বিয়ে করার তিনি একেবারেই বিপক্ষে—"তিনি এগার বৎসর বয়সে পাঁচ বৎসরের যে বালিকাকে বিবাহ করিয়াছিলেন সে যখন মারা যায় তখন তাহার বয়স পনের, বঙ্কিমের একুশ। এই বয়সে দাম্পত্য-জীবনে সহবাস না হইবার কথা নয়। বাঙালী জীবনের যে ধারা ছিল তাহাতে উহা সম্পূর্ণ স্বাভাবিক হইত। আঠারো বৎসরের স্বামী ও তেরো বৎসরের স্ত্রীর সন্তান হওয়ার সংবাদ আমিও জানি। কিন্তু বঙ্কিমের প্রথম বিবাহিত জীবনে কি প্রেমের অনুভূতিও ছিল? আমি এই কথা বলিব, প্রথম পত্নীর প্রতি তীব্র ভালবাসা জন্মিয়া থাকিলে বঙ্কিমচন্দ্র ছয় মাসের মধ্যেই আর একবার বিবাহ করিতে পারিতেন না।"

হয়ত লেখক সূক্ষ্মভাবে প্রমাণ করতে চেয়েছেন যে, বিয়েও হোত বাচ্ছাও হোত সবই ঠিক, কিন্তু তখন দাম্পত্য জীবনে প্রেম ছিল না; ছিল শুধুই কাম।

বাঙালীদের অনেক সনাতন বা পুরাতন আলেখ্য অঙ্কনের পর তিনি বাঙালীর একাধিক গুণও লক্ষ্য করেছেন। হিন্দু বুদ্ধিজীবী সৃষ্টির উৎস বিবর্তন, পার্থিব উন্নতি, চরিত্রহীনতা, অনাচার ও স্বেচ্ছাচারিতার অনেক কথা আলোচনা করা হোল, প্রথম খন্ডেও আলোচনা করা হয়েছে। আমার লেখা 'চেপে রাখা ইতিহাসে' আরও নিবিড় তথ্য পরিবেশিত হয়েছে।

একটা প্রশ্ন এই প্রসঙ্গে আনা যায়, সেকালে বঙ্গদেশে মুসলমান জ্ঞানী, গুণী, ধনী, বুদ্ধিজীবীরা কি মুহূর্তেই উবে গেলেন? উত্তরে বলা যায় যে, নতুন বুদ্ধিজীবীরা সেই সব সম্মানীয় মুসলমানদের নাম ইচ্ছাকৃতভাবে এড়িয়ে গেছেন বা চাপা দিয়েছেন সাম্প্রদায়িকতার কারণেই হোক বা ইংরেজের ইঙ্গিতে। ছড়িয়ে ছিটিয়ে নানা বই পত্রে কিছু খ্যাতনামা লেখক কিছু কিছু নাম যেগুলো কালির আঁচড়ে লিখে গেছেন তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছেন, আগা কারবালাই মুহাম্মদ। যাঁকে ব্যবসাদারদের রাজকুমার বলা হোত। আর ছিলেন "নবাব হোসেন জঙ্গ বাহাদুর, নবাব জাফর জঙ্গ বাহাদুর, নবাব তলোয়ার জঙ্গ বাহাদুর, কাজী গুল মহম্মদ, মহবুব খান, মহম্মদ হোসেন, মহম্মদ আসকরী প্রভৃতি কলকাতার সমাজে সুপ্রতিষ্ঠিত খানদানী মুসলমান নাগরিকদের নামও পাওয়া যায়।" তাছাড়া ১৮২২ খৃষ্টাব্দে রাজা উপাধি পাওয়া রাধাকান্তদেবের দৌহিত্র আনন্দকৃষ্ণ বসু কলকাতার বিশিষ্ট নাগরিকদের একটি তালিকা প্রস্তুত করেছিলেন। তাতে প্রথম শ্রেণীতে

কলকাতার কোন মুসলমানের নাম রাখেননি তিনি। দ্বিতীয় শ্রেণীতে মুন্সী সদরুদ্দিনের মত দু-একজনের নাম রেখেছিলেন মাত্র। [তথ্য ও উদ্ধৃতি : কলকাতার জ্ঞানচর্চা— ইতিহাস (প্রবন্ধ) নিশীথরঞ্জন রায়, পৃ. ১১-১২]

ইংরেজ সরকার কলকাতার ফোর্ট উইলিয়ামে ইসলামী সংস্কৃতি ধ্বংসের যে চক্রান্ত করেছিল তাতে আরবী ফারসী উর্দু ভাষার কিছু পন্ডিতের প্রয়োজন হয়েছিল তাদের। "এদেশীয় জ্ঞানীগুণীদের অধ্যক্ষ ও শিক্ষকরূপে এই কলেজকে গৌরবান্বিত করেছেন যাঁরা তাঁদের মধ্যে নাম করা যায় মৌলবী ইলাহদাদ, মৌঃ লুতফর রহমান বর্ধমানী, আব্দুল রহিম সফীপুরী, মৌলানা বিলায়ত হোসেন প্রমুখদের।"

কলকাতার উর্দু গদ্যের জনক হিসেবে মীর আম্মান এবং উর্দু কবিতার জনক হিসেবে বর্ণিত হয়েছেন 'আব্দুল গফুর নাস্‌সাখ। এঁরা ফারসী রচনাতেও সিদ্ধহস্ত ছিলেন।' এছাড়া আরও উল্লেখযোগ্য মুসলিম পন্ডিতদের মধ্যে এ'তেশামউদ্দিন মির্জা, ফার্সি পুঁথি লেখক আব্দুর রহীম, জনাব বশিরুদ্দিন এবং আজিমুদ্দিন ছিলেন বিখ্যাত ফার্সি কবি। উবায়দী সোহরাবর্দীও ছিলেন বিখ্যাত লেখক। তাঁর ফার্সিতে লেখা 'তারিখ-ই-কলকাত্তা' একটি বিখ্যাত সংকলন। আব্দুর রহমান সঈদও ছিলেন উল্লেখযোগ্য। ফার্সি চর্চার কেন্দ্রস্থল ছিল কলকাতার ইরান সোসাইটি। তাছাড়া আব্দুল লতিফ, মোজাম্মেল হক, ওহাবুদ্দিন ও সৈয়দ জালালুদ্দিন বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ঐ ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের আরও যাঁরা স্মরণীয় থাকার উপযুক্ত তাঁরা হচ্ছেন রওশন আলি, শেইখ আহমাদ, মীর আলি আফসোস, মির্জা লুত্‌ফ আলি, ইকরাম আলি প্রমুখ।

[তথ্য ও উদ্ধৃতি : শহর কলকাতায় আরবী-ফার্সী-উর্দু-সংস্কৃত (প্রবন্ধ) : অধ্যাপক ডঃ ক্ষুদিরাম দাস, দ্রষ্টব্য : শনিবারের চিঠি— প্রবন্ধ সংকলন, মাঘ ১৪০৩, পৃ. ২৩৩-৪২]

আর এক বেদ আয়ুর্বেদ

একথাও বলা হয়েছে যে, চলমান সংস্কৃতির ইতিহাস ঢেকে দিয়ে এটাই ইংরেজ সরকার প্রচার করেছে বা করিয়েছে যে সনাতন হিন্দুদের সব ছিল। আজ তার কিছুই নেই। সব নষ্ট করেছে ঐ মুসলমান জাতি। আর ইংরেজ সরকার দয়া করে তা উদ্ধার করে তুলে দিয়েছে তাদের হাতে।

এইরকম একটি বস্তু হোল আয়ুর্বেদ। তবে বেদই যদি না থাকে তাহলে আয়ুর্বেদ থাকে কি করে? এরও জন্ম উনবিংশ শতাব্দীতে।

১৮০৭ খৃষ্টাব্দে ফ্রান্সিস্ বুকনান নামে একজন সাহেব মুসলমানদের চিকিৎসা বিজ্ঞান ঐতিহ্য চাপা দেবার জন্য বিলেতের হেড অফিসের আদেশে একটি বই লিখে ফেললেন The History , Antiquities, Topography and Statistics of Esatern India। ওতেই তিনি ভারতীয়দের জানিয়ে দিলেন যে, বহু প্রাচীন কাল থেকেই আয়ুর্বেদ চলে আসছে। অতএব তার দিকে আবার যেন ফিরে তাকায় ভারতীয় হিন্দুরা।

প্রচারিত হয়ে গেল উদ্ভট সব তথ্য। এসব মেডিকেল সায়েন্স নাকি পাওয়া গেছে চরক ও সুশ্রুত সংহিতা, বাগভট্ট সংহিতা ও অষ্টাঙ্গ হৃদয় প্রভৃতি গ্রন্থে।

প্লিনি সাহেব জানিয়ে দিলেন যে, ভারত থেকে প্রচুর পরিমাণে ভেষজ বিদেশে রপ্তানি হোত। তিনি আরও লিখে ফেললেন যে, রোমের বহু সোনা ভারতে চলে যাচ্ছে। কারণ তখন সোনার বিনিময়ে ভেষজ কিনতে হোত।

সরকারের ইঙ্গিতে ভারতের বাঙালী লেখকদের উদ্বুদ্ধ করা হোল যে, দেশীয় গাছপালা নিয়ে যে কবিরাজি চিকিৎসা ছিল তারই একটা লিষ্ট তৈরি করে সেটাকেই 'আয়ুর্বেদ' বলে চালাতে হবে। কালীপদ বিশ্বাস লিখে ফেললেন একটি গ্রন্থ, তিন খন্ডে। নাম দিলেন ভারতীয় বনৌষধি। আরও এগিয়ে এলেন বিজয়কালী ভট্টাচার্য, জীতেন্দ্র কুমার সরকার, শিবকালী ভট্টাচার্য ও তেজেন্দ্রকুমার সরকার। তাঁদের উপাধিই দেওয়া হয়েছিল আয়ুর্বেদ শাস্ত্রী। চন্দ্র দত্ত রচিত 'দ্রব্যগুণ' নামক একটি বইয়ে সংযোজিত হোল আরও গাছ গাছড়ার তথ্য। কিন্তু পিছন থেকে কলকাঠি নাড়ছিলেন ঐ সাহেবরাই। যেমন মিঃ ওয়াট্ বই লিখে ফেললেন, যেটা এনসাইক্লোপেডিয়ার মত। অথচ ওগুলো সব মুসলিম পন্ডিতদের আবিষ্কৃত, যেটা আমার লেখা 'পুস্তক সম্রাটে' আলোচনা করেছি।

কালীপদ বিশ্বাস বিজ্ঞান পড়তে গেলেন বিলেতের এডিনবরায়, পান্ডিত্য অর্জন করলেন এবং ডিগ্রিও পেলেন বেশ লম্বা চওড়া— এম. এ., ডি. এস-সি., এফ. এল. এ., এফ.

আর. এস. ই.। সেখান থেকে ঘুরিয়ে এনে তাঁকে করে দেওয়া হোল বোটানিকাল গার্ডেনের সুপারিনটেনডেন্ট। আরও উপরে তুলতে এবং এই যজ্ঞটি পূর্ণ করতে তাঁকে করে দেওয়া হোল কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্ভিদ বিজ্ঞানের অনারারী অধ্যাপক। এবার কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষ থেকে ছেপে 'ভারতীয় বনৌষধি' ১৯৩৬-এ প্রকাশ করা হোল। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হোল বৃটিশ ভারতের শ্রেষ্ঠতম বিশ্ববিদ্যালয়। তাতে যেসব বিখ্যাত বাঙালী জড়িয়ে ছিলেন তাঁদের মধ্যে ছিলেন স্যার আশুতোষ মুখার্জি এবং তাঁর পুত্র শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি। প্রচারের ঠেলায় মানুষ জেনে গেল ..দও ছিল, আয়ুর্বেদও ছিল। ১৯৪৫-এর ১০ই জুলাই ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জির ভূমিকা সম্বলিত দ্বিতীয় খন্ড প্রকাশিত হোল। বই শুরু হওয়ার আগে পূর্বভাষে যা জানানো হয়েছে তার সারমর্ম হচ্ছে : অথর্ব বেদ থেকে এই আয়ুর্বেদের জন্ম আর তার স্রষ্টা ধন্বন্তরি। তারপর মহর্ষি বিশ্বামিত্র, মহর্ষি সুশ্রুত, চরক প্রভৃতি কাল্পনিক পন্ডিতদের কথা লিখলেও লেখা শুরু হয়েছে 'কথিত আছে' বলে। আরও আছে অষ্টাঙ্গ হৃদয় সংহিতা, চক্রদত্ত সংগ্রহ, শাঙ্গ ধর সংগ্রহ, ভাবমিশ্রের ভাব প্রকাশ, মদন পালের রাজ নিঘন্টু, মাধব করের নিদান ইত্যাদি পুস্তক ও লেখকের নাম। কিন্তু যে ইতিহাস চাপা দেওয়া হয়েছে সেই মুসলমানদের ইতিহাস একেবারে হজম করতে না পেরে সামান্য মাত্র উল্লেখ করতে বাধ্য হয়েছেন যে, "মুসলমান রাজত্বকালেও রাজকীয় সাহায্যে মুসলমান হাকিমগণ, আরবী, পারসী ও উর্দ্দু ভাষায় এদেশীয় ভেষজ সম্বন্ধে কয়েকখানি অমূল্য পুস্তক লিখিয়া গিয়াছেন। ইহাদের মধ্যে তালিপ শেরিফ (Taleep Sheriff) এবং মখেজন-উল-আদিয়া (Makhazan-ul-Adwiya) বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।" [দ্রষ্টব্য : ঐ পূর্বভাষ, প্রথম পৃষ্ঠা]

১৮১০ খৃষ্টাব্দে ডাঃ জন ফ্লেমিং ভারতীয় গাছ গাছড়ার নামগুলোর সংস্কৃত নাম সৃষ্টি করে বা করিয়ে এশিয়াটিক রিসার্চ পত্রিকায় প্রকাশ করেন। ডাঃ উদয়চাঁদ দত্ত একটি বই লিখে ফেললেন তার নাম দিলেন 'হিন্দু মেটিরিয়া মেডিকা'। ঠাকুরবাড়ির আত্মীয় মেজর বি. ডি. বসু লিখে ফেললেন 'ইন্ডিয়ান মেডিসিনাল প্লান্টস'।

হাওড়ার বোটানিকাল গার্ডেনের সুপার হলেন সাহেব ডাঃ ডেভিড্ প্রেইন। তাঁর ডিগ্রি বিরাট লম্বা M.G.C.I.E., M.A., I. M. S., D. Sc., LL. D., F.R.S., F.R.S.E., F.L.S.। ইনি ডাঃ কালীপদ বিশ্বাসকে দিয়ে এই 'ভারতীয় বনৌষধি' লেখাতে সমস্ত দিগদর্শন করে দিলেন। আস্তে আস্তে সারা ভারতে প্রচারিত হয়ে গেল আয়ুর্বেদের বিরাট বেলুন। অবশ্য ডেভিড প্রেইন সরকারের কাছ থেকে যা পাবার তো পেয়েই ছিলেন, সেই সঙ্গে পেয়েছিলেন 'স্যার' উপাধি। এ ছ'খন্ডের বিরাট গ্রন্থটিতে ভারতীয় বৃক্ষ, লতাপাতার ছবিসহ গুণাগুণ বর্ণনা করা হয়েছে।

যেমন বাবলা। প্রথমে ইংরেজী নাম দেওয়া আছে। তারপরেই অগ্রাধিকার দেওয়া হয়েছে সংস্কৃত নামের। তারপর বাংলা, হিন্দি, আরবী, ফার্সি, সাঁওতালি প্রভৃতি মোট ২০ টি ভাষায় তার নাম দেওয়া আছে। তারপর দেওয়া আছে সংস্কৃত একটি শ্লোক। যেমন সংস্কৃততে বাবলাকে বর্বুর বলা হয়েছে। তাই পাঁচ লাইনের সংস্কৃত এক শ্লোক তৈরি করে ভুতুড়ে কান্ড ঘটানো হয়েছে। যেমন : 'বর্বুরো যুগলাক্ষশ্চ কন্ঠালুস্তীক্ষ্ণকন্টক: ... কোথা থেকে নেওয়া হয়েছে তাও উল্লেখ করা হয়েছে : 'রাজনিঘন্টু : শাল্মল্যাদিবর্গ:' [দ্রঃ ঐ, দ্বিতীয় খন্ড, পৃ. ৩০২] এবার যেকোন পাঠক যখন বইটি দেখবেন বা পড়বেন এবং স্বদেশী বিদেশী আধ হাত এক হাতবড় বড় ডিগ্রিধারী পন্ডিতদের নামাঙ্কিত কীর্তিতে অন্ততঃ এটা বুঝতে অসুবিধা হবেনা যে আর্য, বেদ, আয়ুর্বেদ সংস্কৃত সে সব বিরাট জিনিস! সে সব ভাঙিয়ে ইংরেজরা দয়াপরবশ হয়ে আমাদেরও পরিবেশন করেছেন ঐ অমৃতভান্ড।

গীতবাদ্য ঘরানা

গান বাজনার বিষয়ে কিছু বলতে গেলে প্রথমেই বলে নিতে হয় যে, ইসলাম ধর্মাবলম্বীদের মধ্যে এই বিষয়ে দুটি অংশ দেখা যায়। যাঁরা কোরআন হাদীস শরীয়তের বেশি অনুসারী তাঁদের মতে গান বাদ্য আদৌ শুভকর্ম নয়। অবশিষ্ট সাধারণ মুসলিমরা অনেকে এটাকে বর্জন করতে পারেন নি।

তানসেন

অবিভক্ত ভারতবর্ষে আধুনিক গীতবাদ্যের যে রমরমা বাজার ছিল তার জন্ম হয়েছে মুসলমানদের হাতে। অর্থাৎ প্রাচীন যুগ থেকেই প্রত্যেক দেশেই চিত্তবিনোদনের বহিঃপ্রকাশ হিসেবে গান, বাজনা, নাচ, নেশার বস্তু খাওয়া বা পান করার প্রচলন ছিল। একথা অস্বীকার করা যাবে না যে গান, বাজনা, সুরা, নারী, বিলাসিতা অপব্যয় এবং অমিতব্যয়িতা সবগুলোই যেন একে অপরের সঙ্গে জড়িয়ে আছে। ব্যতিক্রম সব ক্ষেত্রেই স্বীকার্য। আমি নিজে এসব বিষয়ে আদার ব্যাপারী। তবু স্মরণ রাখতে হচ্ছে যে, এটা ইতিহাস; শরীয়তের আদেশ নিষেধ প্রতিষ্ঠা করার স্থান এটা নয়।

এই নতুন শতাব্দীর সঙ্গীত জগতের দিকে দৃষ্টি দিলে এটাই মনে হবে যে সারা ভারত জুড়ে সঙ্গীত বিশেষজ্ঞমণ্ডলী সবাই যেন হিন্দু; তাতে আঙুলে গোণা কতিপয় মুসলমানও স্থান করে নিয়েছেন। ঐতিহাসিক সত্য কিন্তু এটা নয়। সত্য তথ্য হোল এই, এই বিভাগটি প্রায় পুরোপুরি মুসলমান খাঁন বা খাঁ-গোষ্ঠীর দ্বারাতেই নিয়ন্ত্রিত হয়ে আসছিল। সরকারি

হাফিজ আলি খাঁ

বেসরকারি ও আন্তর্জাতিক ক্রুর ষড়যন্ত্রে তাঁদের কাছ থেকেই এই বিদ্যা হাসিল বা রপ্ত করে তাঁরা হয়ে পড়লেন 'হিরো'। ষড়যন্ত্রের তাপে ক্ষয়িষ্ণু বরফ খণ্ডের মতো মুসলমানেরা হয়ে গেছেন প্রায় জিরো।

এনায়েত খাঁ

ভারতীয় সঙ্গীতের চারটি বিভাগ আছে। ধ্রুপদ, খেয়াল, টপ্পা ও ঠুমরি। ষড়যন্ত্রকারীরা আন্তর্জাতিক ইঙ্গিতের পরিপ্রেক্ষিতে নতুন কথা আমদানি করলেন যে, ধ্রুপদ বিভাগটি নাকি আর্য ঋষিদের সৃষ্টি। বাকী তিনটি অবশ্য মুসলমানদের সৃষ্টি, তবে ধ্রুপদকে ভিত্তি করে খাঁ সাহেবরা তাকে আরও পূর্ণতা দিয়েছেন।

গায়কদের ইতিহাস খুঁটিয়ে দেখলে দেখা যায় যে, প্রাচীন গায়কেরা প্রায় সকলেই ছিলেন মুসলমান। যেমন মহম্মদ গওস, তানসেন খাঁ, ধোঁধি খাঁ, সুরজ খাঁ, চাঁদ খাঁ, শোভন খাঁ, খুশাল খাঁ, আমীর খুসরু, গোলাম নবী, মাওলা দাদ, শোরী ইলিয়াস সাহেব প্রভৃতি।

বিলায়েত খাঁ

এঁদের কথা ছেড়ে দিয়ে এরপরের প্রজন্মে যাঁরা সঙ্গীত জগতে সুনাম ও গৌরব রাখতে সক্ষম হয়েছিলেন তাঁরা হলেন : আলা বন্দে খাঁ, আলাউদ্দিন খাঁ, হাফিজ আলি খাঁ, আব্দুল করিম খাঁ, নাসিরুদ্দিন খাঁ, ফৈয়াজ খাঁ প্রভৃতি।

সঙ্গীতে রাগ-রাগিনীর মূল্য অসীম। সেগুলো নানা নামে পরিচিত। যেমন বাহার, দরবারী, তোড়ী, দরবারী কানাড়া, হোসেনী কানাড়া, মিঞা সারঙ্গ, মিঞা মল্লার, জয়জয়ন্তী, আড়ানা প্রভৃতি। এগুলো সব মুসলমান শিল্পীদের সৃষ্টি।

ভারতের প্রখ্যাত পণ্ডিত, রবীন্দ্রনাথ কর্তৃক 'ভাষাচার্য' উপাধিপ্রাপ্ত, সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় লিখেছেন, "সঙ্গীতকার তানসেনের নাম ভারতবর্ষে সকলেই জানে। কিন্তু তানসেন কেবল যে একজন যুগাবতার, সঙ্গীত রচয়িতা ও গায়ক ছিলেন

বড়ে গোলাম আলি খাঁ

উস্তাদ আবদুল করিম খাঁ

ফৈয়াজ খাঁ

বেগম আখতার

তাহা নহে তিনি একজন উচ্চশ্রেণীর কবিও ছিলেন, ইহা তাঁহার রচিত ধ্রুপদ গানের 'বাণী' বা কথা হইতে স্পষ্ট প্রতীয়মান হয়। বোধহয় তানসেন ১৫২০ খৃষ্টাব্দের দিকে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। আকবরের দরবারে লিখিত ফার্সী ইতিহাস অনুসারে তাঁহার মৃত্যুকাল ৯৯৭ হিজরী অর্থাৎ ১৫৮৯ খৃষ্টাব্দ। আকবরের দরবারে ঐতিহাসিক আবুল ফজল 'আইন-ই-আকবরী' গ্রন্থে আকবরের বেতনভোগী ছত্রিশ জন দরবারী গায়ক ও বাদকদের নাম দিয়াছেন— তন্মধ্যে তানসেনের নাম সর্বপ্রথমে আছে, এবং তানসেন সম্বন্ধে ঐতিহাসিক আবুল ফজল মন্তব্য করিয়াছেন যে, তাঁহার ন্যায় গায়ক বিগত সহস্র বৎসরের মধ্যে ভারতবর্ষে হয় নাই।"

রবিশঙ্কর, আলাউদ্দীন ও আলি আকবর

"পরে তিনি গোয়ালিয়রের সুফী সাধক মহম্মদ ঘৌসের শিষ্য হন। এই সুফী সাধক একজন খুব বিখ্যাত গায়ক ছিলেন। তিনি বাবর হুমায়ুন ও আকবরের সমকালীন ছিলেন এবং লোকে তাঁহাকে বিশেষ শ্রদ্ধা করিত।"

"কথিত আছে যে মহম্মদ ঘৌস নিজের জিভ তানসেনের জিভে ঠেকান। তাহাতেই তানসেনের অসাধারণ সঙ্গীত শক্তির উন্মেষ হয়।"

'তানসেনের গোষ্ঠীর— তাঁহার ভাই সুব্হান খাঁ এবং বীরমণ্ডল খাঁ, প্রবীণ খাঁ,

কাজী নজরুল ইসলাম

সুর সম্রাট আব্বাসউদ্দিন

কবি গোলাম মুস্তাফা

পদ্মভূষণ উস্তাদ মুস্তাক হুসেন খাঁ

চাঁদ খাঁ প্রভৃতির নাম'-এর উল্লেখ সুনীতিবাবু তাঁর বই এর মধ্যে করেছেন। তাছাড়া আরও তিনি উল্লেখ করেছেন, "এই প্রসঙ্গে বাঙ্গালা অক্ষরে 'ধ্রুপদ ভজনাবলী' নামে কলিকাতা হইতে কয়েক বৎসর পূর্বে প্রকাশিত, অধুনা দুষ্প্রাপ্য ক্ষুদ্র একখানি পুস্তকের উল্লেখ করিতে হয়। রঙ্গপুরের উকিল রামলাল মৈত্র মহাশয় নিজ সঙ্গীত শিক্ষক শিবনারায়ণ মিশ্রের নিকট বহু ধ্রুপদ গান শিক্ষা করেন। অমৃতবাজার পত্রিকার প্রতিষ্ঠাতা স্বর্গীয় শিশির কুমার ঘোষ মহাশয়ের উৎসাহে এইরূপ ৩৭১ খানি ধ্রুপদ গানের বাণী তিনি প্রকাশ করিয়াছিলেন; ইহার মধ্যে ১৮০ টির অধিক গান তানসেনের ভণিতায় পাওয়া যাইতেছে।"

রবিশঙ্কর ও আলি আকবর

রবিশঙ্কর, কমলা দেবী এবং তাঁর বন্ধুবান্ধব

"খ্রীষ্টীয় ১৮৪৩ সালে কলিকাতায় মুদ্রিত ও প্রকাশিত (দ্বিতীয় সংস্করণ, লালগোলার রাজা বাহাদুরের ব্যয়ে ১৯১৪-১৬ খ্রীষ্টাব্দে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ হইতে প্রকাশিত) কৃষ্ণানন্দ ব্যাসদেবের বিরাট সঙ্গীত সংগ্রহ 'সঙ্গীত-রাগ-কল্পদ্রুম' গ্রন্থে তানসেনের ভণিতা দেওয়া বহু বহু পদ আছে। খ্রীষ্টীয় ১৮৫৫ সালে কৃষ্ণধন বন্দ্যোপাধ্যায় রচিত 'গীতসূত্রসার' পুস্তক হইতে আরম্ভ করিয়া বাঙ্গালায় হিন্দিতে মারাঠীতে ও অন্য ভাষায় ভারতীয় সঙ্গীত বিষয়ে যত পুস্তক বাহির হইয়াছে সেগুলিতেও তানসেনের পদ আছে। ... উত্তর ভারতের কলাবন্ত সঙ্গীতের যে কোনও বইয়ে তানসেনের গান দুই-দশটি থাকিবেই।"

রবিশঙ্করের শাশুড়ি মদিনা বেগম

"স্যর জ্যরজ্ আব্রাহাম গ্রিয়ারসন ১৮৮৯ সালে Modern Vernecular Literature of Hindustan নামে যে অতি উপযোগী পুস্তক প্রকাশ করেন তাহাতেও তিনি 'শিবসিংহসরোজ' হইতে তানসেনের জীবনীকথা উদ্ধার করিয়াছেন।".

[দ্রষ্টব্য : ভারত সংস্কৃতি : সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় , ১৯৬৪, পৃ. ১৪৩-১৫২]

বহু বিখ্যাত সঙ্গীত শিল্পীর মধ্যে যাঁরা ভারতে আলোড়ন সৃষ্টি করেছিলেন তাঁদের মধ্যে কালু খাঁ, কালে খাঁ, মহম্মদ আলি খাঁ, উজির খাঁ, জাফরুদ্দিন, বন্দে আলী খাঁ, উমরাও খাঁ, রজর আলী, মুরার আলী, আলাউদ্দিন খাঁ, ফিদা হুসেন খাঁ, বাহাদুর খাঁ, আফতাবুদ্দিন খাঁ, মইজুদ্দিন খাঁ, আল্লাদিয়া খাঁ, আহমাদ জান, হাফিজ আলি খাঁ, কেরামতুল্লাহ খাঁ, আব্দুল হালিম, জাফর খাঁ, বড়ে গুলাম আলি খাঁ, বেগম

রবিশঙ্কর ও আলাউদ্দিন কন্যা অন্নপূর্ণা (রওশন আরা)

আখতার, মুনাওয়ার আলি খাঁ, নিসার হুসেন খাঁ, মসীদ খাঁ, উস্তাদ ওয়াজীর খাঁ, উস্তাদ রজব আলি খাঁ, পদ্মভূষণ উস্তাদ মুস্তাক হুসেন খাঁ, এনায়েত খাঁ, বেলায়েত খাঁ, রশীদ খাঁ, মহম্মদ রফি খাঁ, কবি নজরুল ইসলাম, কবি গোলাম মোস্তাফা, আব্বাসউদ্দিন প্রভৃতি আরো অনেকে উল্লেখযোগ্য। [তথ্য : দেশ পত্রিকা, ৯ই আগস্ট, ১৯৯৭]

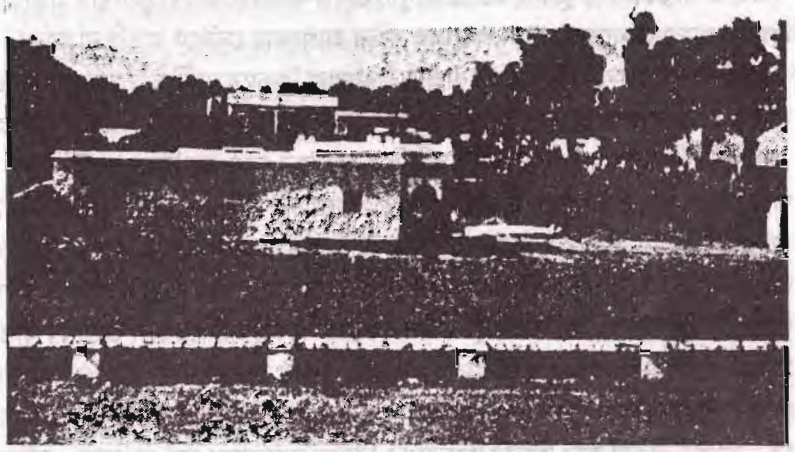

রবিশঙ্করের শ্বশুরবাড়ি

এখন বর্তমান শিল্পী যাঁরা রয়েছেন তাঁদের মধ্যে মুসলমান এক শতাংশও হবে না হয়তো। ইংরেজের ইঙ্গিতে জমিদার অর্থাৎ যাঁদের 'রাজা' 'মহারাজা' বলা হোত তাঁদের মাধ্যমে অভাবগ্রস্ত অর্থাৎ অর্থনৈতিক পঙ্গু মুসলিম শিল্পীদের নিকট থেকে পুরোপুরি সংগীত বা বাদ্যশিল্প শিখে নিয়ে প্রতিষ্ঠিত হয়েছেন বেশিরভাগ নতুন শিল্পীরা। আর আস্তাকুড়ে নিক্ষিপ্ত হয়েছেন পুরনো সব শিল্পী ও তাঁদের অবদান। এই সব নতুন শিল্পীদের সম্বন্ধে সুধীর চক্রবর্তী লিখেছেন , "শিল্পীদের আকাশছোঁয়া দক্ষিণা, বিলাসবহুল ফ্ল্যাট, গাড়ী আর জাঁকালো পোষাকের আড়ম্বর, তাঁদের নারী বিলাস ও যাপনের মিথ, তাঁদের আন্তর্জাতিক কনসার্ট ও অবিশ্বাস্য সংখ্যক ক্যাসেট বিক্রির রেকর্ড এখন বিনোদন পত্রিকার রোচক প্রসঙ্গ। সুরকার ও গীতকারদের অর্থকৌলিন্যও উল্লেখ্য।" [দ্রঃ ঐ, পৃ. ১০৬]

যাঁরা এই যুগে বাজার মাতিয়েছেন তাঁদের মধ্যে একনম্বরে আছেন আন্তর্জাতিক খ্যাতিপ্রাপ্ত রবিশঙ্কর। সুধীরবাবু যাঁদের নাম উল্লেখ করেছেন তাঁরা হলেন হেমন্ত, মান্না দে, শ্যামল, ভূপেন হাজারিকা, সন্ধ্যা, গীতা দত্ত, আরতি মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি। তাছাড়া অনুপম ঘটক, রবীন চট্টোপাধ্যায়, সলিল চৌধুরী, সুধীন দাশগুপ্ত, নচিকেতা ঘোষ, গৌরীপ্রসন্ন, পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্যামল গুপ্ত, প্রেমেন্দ্র মিত্র উল্লেখযোগ্য। তাছাড়া আরো যাঁরা প্রতিষ্ঠিত তাঁরা হলেন ধনঞ্জয়, মানবেন্দ্র, কিশোর কুমার, আলপনা, প্রতিমা, সুপ্রভা, উৎপলা সেন, সবিতা, শচীন দেববর্মন, অনিল বিশ্বাস, কুমার শানু, লতা মঙ্গেশকর, আশা ভোঁসলে, মুকেশ, মহেন্দ্র কাপুর, উদিত নারায়ণ, কবিতা কৃষ্ণমূর্তি প্রভৃতি। এছাড়া আরো অনেকে রয়েছেন, কলেবর বৃদ্ধির আশংকায় সেদিকে বাড়ছি না আর।

জমিদারবাবুরা বা তথাপ্রচারিত রাজা মহারাজারা কিভাবে মুসলিম উস্তাদদের কাছে সঙ্গীত বিদ্যা রপ্ত করেছেন, ইতিহাস দেখলে তা অনুভব করা যাবে। এই শতাব্দীর প্রখ্যাত শিল্পী রবিশংকর কেমনভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছেন সেও এক বিস্ময়কর ইতিহাস। তাঁর অধ্যাবসায়, প্রখর অনুসন্ধিৎসা নিঃসন্দেহে প্রশংসার দাবীদার। কিন্তু বিখ্যাত শিল্পী আলাউদ্দিন খাঁর কাছ হতে তাঁদের বংশগত অভিজ্ঞতা ও অভিজ্ঞানকে আহরণ করার জন্য সেবা করেছেন তাঁর। এটাও ছাত্র হিসাবে তিনি প্রশংসার পাওনাদার। তারপর যেটা করেছেন সেটা হোল, তিনি তাঁর মুসলমান হওয়ার সংকল্প জানিয়ে দেন তাঁদের। ধুতি সরিয়ে পরে নেন পাজামা। শুধু কি তাই? আরও একাত্ম হওয়ার জন্য রেখে ফেলেছেন দাড়ি। শিখদের মতো সুন্দর চাপদাড়ি হলে বোঝা যেত ওটা স্টাইল, কিন্তু তা মনে হয় না। খাওয়া দাওয়া আর আচার আচরণের বিষয়ে আলোচনা বাদ রাখলাম। দরিদ্র আলাউদ্দিনের কৃশদেহী কিশোরী কন্যার সঙ্গে প্রেমের অভিনয় করলেন তিনি। তারপর দিলেন শুভ (?) বিবাহের প্রস্তাব। উস্তাদ আলাউদ্দিন ভেবে দেখলেন, হলেই বা তাঁরা খানদানী মুসলিম, রবিশংকরের আর মুসলমান হতে বাকীই বা কি আছে? তিনি রাজী হবেন কি না এই ভেবে তাঁর পুত্র আলি আকবরের সঙ্গে নিবিড় বন্ধুত্ব করে ফেললেন রবিশংকর। প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়ে তাঁর নানা অঙ্গে চুম্বন করতেন তিনি। রবিশংকর তাঁদেরকে বোঝাতে সক্ষম হয়েছিলেন যে তাঁর কন্যার রওশনারা নামটি পরিবর্তন করে শুধু যদি অন্নপূর্ণা রাখা হয় তাহলে তাঁর হিন্দু আত্মীয় আত্মীয়ারা সকলেই তাঁকে বরণ করে নেবেন। উস্তাদ আলাউদ্দিন, তাঁর স্ত্রী মদিনা বেগম ও তাঁদের পুত্র আলি আকবর অনেক টানাপোড়েনের মধ্যে তাও মেনে নিলেন। বিয়ে হয়ে গেল। অন্নপূর্ণার সন্তানও ভূমিষ্ঠ হোল। কিন্তু অন্নপূর্ণা জানতে পারলেন তাঁর বাবা মা ও ভাইয়ের অঙ্কে ভুল হয়ে গেছে।

উচ্ছ্বাসপ্রবণ রবিশংকর তখন বিখ্যাত শিল্পী। কমলার সঙ্গেও তাঁর প্রেম চলতে লাগলো। কমলারও বিয়ে হোল। তিনিও সন্তানের মা হলেন। এদিকে অন্নপূর্ণা শুধু

কাঁদতেই লাগলেন। তিনিও ছিলেন বাদ্যশিল্পী। বাদ্যযন্ত্র নিয়ে শুধু কান্নার সুর তুলতেন। তাঁর ঐ সুরের ঝঙ্কারে ঝঙ্কৃত হতেন তাঁর মা-বাবা দুজনেই। আর প্রায়শ্চিত্ত করতেন অশ্রুভরা চোখ নিয়ে।

অন্নপূর্ণা গম্ভীর ও পাথর হয়ে গেলেন যেন। কমলা এবার যখন বিধবা হলেন তখন রবিশংকর স্পষ্ট করে তাঁকে স্ত্রী বানিয়ে নিলেন। অন্নপূর্ণার গর্ভজাত সন্তান শুভেন্দুও হয়েছিলেন বিখ্যাত শিল্পী, সমাদৃত হয়েছিলেন আমেরিকায়। যে কোন কারণেই হোক, ক্ষোভে দুঃখে বেদনায় আর ফিরে আসেন নি তিনি— মারাও গেলেন সেখানে।

এখন বিশ্বজুড়ে সুনামপ্রাপ্ত রবিশংকরকে দেখলে মানুষ চিন্তা করতে বাধ্য হবে, কোথায় গেল তাঁর দাড়ি, কোথায় গেলেন তাঁর মুসলমান শ্বশুর, শাশুড়ি ও শ্যালক, কেমনভাবে তিনি নতুন জীবনে সাঁতার কাটছেন আনন্দ ফূর্তি আর স্বাচ্ছন্দ্যের সাগরে।

ছবি ঃ রবীন্দ্র-নজরুল চরিত এবং 'দেশ' -এর সৌজন্যে

হরপ্রসাদের কর্মকান্ড

হরপ্রসাদ শাস্ত্রী এমন এক বিশাল ব্যক্তিত্ব যে, শুধু তাঁকে নিয়েই লেখা যায় একটি সুবিশাল গ্রন্থ। আমাদের উদ্দেশ্য কিন্তু জীবনী লেখা নয়। আমাদের দেশে যাঁকে বড় চোখে দেখা হয় বা দেখানো হয়, তাঁর শুধু আলোদিক বা ভালোদিকটাই সাধারণতঃ তুলে ধরা হয় মানুষের সামনে; আর তাঁর জীবনের কালো দিকটা বেমালুম চেপে যাওয়া হয়।

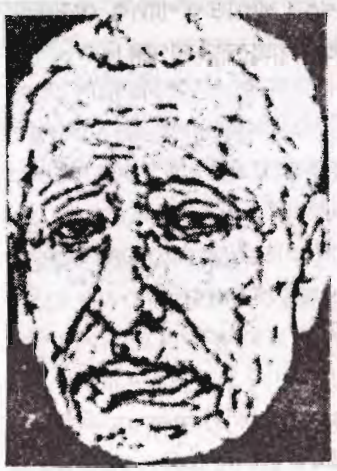

হরপ্রসাদ শাস্ত্রী

আমরা মনে করি দেশবরেণ্য কোন সাহিত্যিক বুদ্ধিজীবী, দার্শনিক, বিজ্ঞানী, ঐতিহাসিক বা রাজনীতিবিদের প্রশংসাপূর্ণ ইতিহাস লেখার সঙ্গে সঙ্গে তাঁর জীবনের অন্ধকার বা কালো দিকটিও উল্লেখ করা প্রয়োজন। প্রশ্ন উঠতেই পারে— কী লাভ আছে তাতে ? এতে না আছে দেশের কল্যাণ, না আছে সেই ব্যক্তির কোন কল্যাণ!

কিন্তু আমাদের মনে হয়, প্রত্যেক মানুষের দোষ গুণ দুটোই থাকবে। আমরা সাধারণ মানুষ হয়তো বা কেউ মদ্যপান, ব্যভিচার, স্বেচ্ছাচারিতা, চৌর্যবৃত্তি, শঠতা প্রভৃতি কুকর্মে জড়িয়ে পড়ি কোন কারণে। সেইসময় বিবেকের তাড়নায় জর্জরিত হয়ে হতাশ হয়ে ভেঙে পড়তে হয় আমাদের। তখন যদি ইতিহাসের ঐসব কথা মনে পড়ে, যে অমুক বিখ্যাত ব্যক্তির তো এই এই দোষ ছিল, তবুও তো তিনি হতে পেরেছিলেন এতবড় খ্যাতিমান ব্যক্তি! সুতরাং আমার ক্ষেত্রেও উপায় আছে। এই পাথেয় নিয়ে উন্নতির পথে চলা তখন আবার সম্ভব হয়ে ওঠে সহজে।

হরপ্রসাদ শাস্ত্রী যে এক বিরাট পণ্ডিত, মৌলিক জ্ঞান, বিদ্যা, অভিজ্ঞতায় যে ছিলেন সমৃদ্ধ, এ বিষয়ে সন্দেহ নেই কারও। বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ তাঁকে উদ্দেশ্য করে বলেছেন, "বাংলা সাহিত্যে এতদিন ধরিয়া আমি যাহা কিছু করিয়াছি, তাহা সমগ্রভাবে দেখিবার শক্তি আপনার মতো কয়জনের আছে? সেদিনকার সভায় উদার ভাষায় আমার সম্বন্ধে আপনি যে দাক্ষিণ্য প্রকাশ করিয়াছেন, তাহাতে আমি ধন্য হইয়াছি।" [দ্রষ্টব্য : হরপ্রসাদ রচনাসংগ্রহ, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃ. ১১]

প্রদীপের নিচে অন্ধকারের অবস্থিতি যেমন নির্ঘাত সত্য, তেমনি হরপ্রসাদের বৃটিশের কাছ হতে পাওয়া উপাধি, প্রশংসাপত্র প্রভৃতি তাঁর ইতিহাসের কালোদিক প্রমাণ না করে পারে না। সুতরাং তিনি শুধু হরপ্রসাদ ছিলেন না, তিনি হয়ে উঠেছিলেন স্যার মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, এম. এ., সি. আই. ই., এফ. এ. এস. বি. মহাশয়।

বংশগতভাবে তিনি বা তাঁরা ছিলেন বৃটিশের অনুগত। শৈশবে তাঁর নাম ছিল শরৎনাথ ভট্টাচার্য। পরে তা পরিবর্তিত হয়ে তিনি হয়েছিলেন হরপ্রসাদ শাস্ত্রী। তাঁর পিতা রামকমল বা কমললোচনবাবুও ছিলেন 'ন্যায়রত্ন' উপাধিধারী। হরপ্রসাদের দাদা নন্দকুমার পেয়েছিলেন 'ন্যায়চুঞ্চু' উপাধি। তাঁর মাতামহ রামমাণিক্যও ছিলেন 'বিদ্যালঙ্কার' উপাধিপ্রাপ্ত। তাঁর শ্বশুর ছিলেন কাটোয়ার দেয়াসিন গ্রামের কৃষ্ণচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়; তিনিও পেয়েছিলেন বৃটিশের দেওয়া 'রায়বাহাদুর' উপাধি। ফিরিস্তি বাড়িয়ে লাভ নেই আর।

ইংরেজ জাতি কাকে কী দিয়ে কেমনভাবে কাজে লাগানো যায়, তা আঁচ করতে পারতো। সেইভাবেই বাছাই করা হয়েছিল হরপ্রসাদকেও। প্রচণ্ড স্মৃতিশক্তিসম্পন্ন মেধাবী ছাত্র ছিলেন তিনি। ১৮৭১ খ্রীষ্টাব্দ হতেই সেই বাজারে আকর্ষণীয় অঙ্কের বৃত্তি পেতেন। সংস্কৃত কলেজের ছাত্রাবস্থায় তাঁর আট টাকা বৃত্তিকে করে দেওয়া হয় পঞ্চাশ টাকা। বি. এ. পাস করার পর আরও পঁচিশ টাকা বৃদ্ধি করা হয় পরীক্ষায় ভাল ফলাফলের জন্য। বৃটিশ সহযোগী স্যার রাজেন্দ্রলালের সুনজর পড়লো তাঁর উপর। ১৮৭৮-তে 'ট্রান্সেলেশন মাস্টারের' পদ পান তিনি। ১৮৮০-তে হন পৌরসভার কমিশনার। পরে উন্নীত হন ভাইস চেয়ারম্যান থেকে চেয়ারম্যান পদে। ১৮৮৪-তে হন অনারারী ম্যাজিস্ট্রেট।

রাজেন্দ্রলাল মিত্রের মৃত্যুর পর পূর্ব আলোচিত এশিয়াটিক সোসাইটির বিরাট দায়িত্ব চেপে যায় তাঁর উপর। তিনি ছিলেন সোসাইটির আজীবন ভাইস প্রেসিডেন্ট এবং শেষে নির্বাচিত হয়েছিলেন সোসাইটির ফেলো।

১৮৮৮-তে তিনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়েরও ফেলো নির্বাচিত হন। ১৮৯২-এ এশিয়াটিক সোসাইটিতে জয়েন্ট ফিলোলজিক্যাল সেক্রেটারি নির্বাচিত হন এবং 'বিবলিওথেকা ইন্ডিকা' গ্রন্থমালার সংস্কৃত বিভাগের তত্ত্বাবধায়ক হন তিনি।

বৃটিশকে খুশি করতে পেরেছিলেন বলেই বিলেতের অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষ থেকে তাঁকে ডাকা হয়েছিল। তাঁর যাবার ইচ্ছাও হয়েছিল খুব। কিন্তু ঐসময় হিন্দুদের সমুদ্রযাত্রা করা মহাপাপ বলে বিবেচিত হোত। তা সত্ত্বেও তিনি একটি লাইন বার করেছিলেন যে, সন্ন্যাসী হয়ে বিলেত গেলে সেটা দোষের নয়। সেজন্য তিনি বলেছিলেন, "সন্ন্যাসীর তো জাতের ভয় নাই। যাইলে সন্ন্যাস লইলেই হইল।" তবে তাঁর মরণের ভয়ও ছিল খুব। তাই বলেছিলেন যে, "রাজা রামমোহন রায় প্রভৃতি যাঁহারা অধিক বয়সে বিলাতে

গিয়াছিলেন তাঁহারা কেহই আর দেশে ফিরিতে পারেন নাই, সেইখানেই দেহ রাখিয়াছিলেন। বৃদ্ধবয়সে এই বিপদ আছে।" শেষপর্যন্ত তাঁর আর বিলেত যাওয়া হয়নি।

ইংরেজ সরকারের 'কলকাতা-কর্মকাণ্ডে' যাঁরা যুক্ত ছিলেন, সেই সমস্ত মনীষীদের তালিকাটি বেশ দীর্ঘ। যেমন আশুতোষ মুখোপাধ্যায়, রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, কাশীপ্রসাদ জয়সওয়াল, গঙ্গানাথ ঝা, গণপ্রসাদ শাস্ত্রী, বামাচরণ বিদ্যাবাগীশ, গৌরমোহন বিদ্যালঙ্কার, তারানাথ তর্কবাচস্পতি, মদনমোহন তর্কালঙ্কার, গৌরীশঙ্কর তর্কবাগীশ, দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ, শ্রীশচন্দ্র বিদ্যারত্ন, রাজেন্দ্রলাল মিত্র, হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, শিবনাথ শাস্ত্রী, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, গিরীশচন্দ্র বিদ্যারত্ন প্রমুখ। এঁদের মধ্যে পরস্পরে যোগাযোগ ছিল যথেষ্ট। হরপ্রসাদের সঙ্গে আরও যাঁদের কর্মকাণ্ডকেন্দ্রিক যোগাযোগ ছিল, তাঁরা হচ্ছেন স্যার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, অক্ষয়চন্দ্র সরকার, অর্ধেন্দুশেখর মুস্তাফী, অধরলাল সেন, দেবেন্দ্রবিজয় বসু, যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী, জগদীন্দ্রনাথ রায়, রমেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী, প্যারীচাঁদ মিত্র প্রমুখ।

বৃটিশের সঙ্গে সহযোগিতা করতে ও করাতে হরপ্রসাদ যা লিখে গেছেন ও বলে গেছেন, তা নিরপেক্ষ ও বিপক্ষ দলের পাঠক সহজে ক্ষমা করবেন বলে আশা করা যায় না।

ইংরেজের রাজত্বের প্রশংসা করে বলেছেন, "যুদ্ধের লেশমাত্রও নাই, জমিদারের অত্যাচার নাই, কুসংস্কারাপন্ন গুরুপুরোহিতের প্রাধান্য নাই, স্বাধীন চিন্তায় ব্যাঘাত দেয় এমন কিছুই নাই। স্বাধীন দেশের দেশশাসন, শান্তিরক্ষা, বিচারকার্য প্রভৃতিতে নিযুক্ত থাকায় কত কত মহা প্রতিভাশালী লোকের প্রতিভা বিকাশ হইতে পারে না। বাঙালী অদৃষ্টে এ সকল কার্যের জন্য ইংরেজ আছেন। বাঙালী ইচ্ছা করিলে নির্বিবাদে, নিরাপদে দেশের সমাজের ও সাহিত্যের উন্নতিতে সমস্ত মানসিক শক্তি ব্যয় করিতে পারে।" [হরপ্রসাদ রচনাসংগ্রহ, ২য় খণ্ড, পৃ. ৫১০]

"তাঁর (হরপ্রসাদের) অভিমত, ইংরেজের রাজত্বে বাঙালী নির্বিবাদে দেশ, সমাজ ও সাহিত্যের উন্নতিসাধন করতে পারে। পরিবর্তন-সময় এবং রেনেসাঁসের বিষয়ে অবগত হয়েও পরাধীনতার মর্মবেদনা তাঁকে স্পর্শ করেনি।" [হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর সাহিত্যকর্ম : অধ্যাপিকা শিপ্রা রক্ষিত দস্তিদার, ঢাকা, পৃ. ২৭৩, ছাপা ১৩৯৯]

ভারতের বিপ্লবীদের ইংরেজিতে বলা হোত মিউটিনিয়ার। আর ইংরেজিতে বিপ্লব বা বিদ্রোহ হোল mutiny। এই বিপ্লব বা বিদ্রোহ সম্পর্কে তিনি যা মন্তব্য করেছেন অনেকের মতে তা অনুচিত ও কুৎসিত : "হরপ্রসাদ 'মিউটিনি' ও 'মিউটিনীয়ার'— এই দুটি ইংরেজি শব্দ ব্যবহার করেছেন; এবং এঁদের সম্বন্ধে তাঁর নিজস্ব বক্তব্য জানা না গেলেও তিনি মিউটিনিকে 'উৎপাত' বলে বর্ণনা করেছেন।"

ইংরেজকে তুষ্ট করতে অর্থাৎ নিজের স্বার্থের পরিপুষ্টিতে অসত্য ও মিথ্যার আশ্রয় নিতে যেমন স্তাবকদের আটকায় না, হরপ্রসাদ যে সে দলের বাইরে তা প্রমাণ করা কঠিন। তাই 'ভারতবর্ষ' পত্রিকায় শ্রী রসিকলাল রায় মন্তব্য করেছেন— "শাস্ত্রী মহাশয় বলিয়াছেন, 'লর্ড ক্লাইবেও বাঙ্গালা জানিতেন, বাঙ্গালায় কথা কহিতেন'। এটি তাঁহার প্রত্নতত্ত্ব গবেষণার একটি নূতন আবিষ্কার। আমরা উত্তরবঙ্গের প্রত্নতাত্ত্বিক পণ্ডিতদিগের হস্তে একথার বিচারভার সমর্পণ করিতেছি। তিনি আরও লিখিয়াছেন, 'আজিও আপনারা দেখিলেন তিনি (বঙ্গেশ্বর লর্ড কারমাইকেল) বাঙ্গালা ভাষাতেই সাহিত্য সম্মেলনের কার্য্য আরম্ভ করিয়া দিলেন।' আমাদের কর্ণে যাহা ইংরেজি বলিয়া বোধ হইল, বঙ্গভাষানুরাগী, সাহিত্যসেবী শাস্ত্রী মহাশয়ের কর্ণে তাহাই বাঙ্গালার আকার ধারণ করিল,— ইহাতে বিস্মিত হইবার কিছুমাত্র কারণ নাই।" [দ্রষ্টব্য : রসিকলাল রায় : 'সাহিত্য সম্মেলনে', ভারতবর্ষ পত্রিকা, প্রথম বর্ষ, ষষ্ঠ সংখ্যা, ১৩২১, পৃ. ৯০১-২]

হিন্দু মহাসভার প্রতিষ্ঠাতা হিসেবে প্রচারিত নেতার নাম ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি। কিন্তু তারও পূর্বে মুসলিম বিরোধিতায় উৎকট সাম্প্রদায়িক একটি দল তৈরি হয়েছিল ১৯২৩ খৃষ্টাব্দে, হরপ্রসাদের নেতৃত্বে। সেই দলটির নাম 'অখিল ভারত হিন্দুসভা'।

ঐ হিন্দুসভার সভাপতির ভাষণে তিনি ইংরেজ সরকারের পক্ষে যা বলেছিলেন, তা নৈতিক জ্ঞানসম্পন্ন কোন বিপ্লবীর পক্ষে সহ্য করা সম্ভব নয়। তিনি বলেছিলেন, "রাজা বিদেশী, তাঁহারা অনেক সময় না বুঝিয়া আমাদেরই হিত হইবে মনে করিয়া আমাদেরই ধর্মবিশ্বাসের মূলে কুঠারাঘাত করিয়াছেন, কিন্তু তাঁহারা তো ভাল, প্রতিবাদ করিলে বিচার করেন। অন্ততঃ তাঁহাদের সাধু ইচ্ছার অভাব আছে বলিয়া মনে করিবার কোন কারণই নাই।" [দ্রষ্টব্য : ভারত হিন্দুসভায় প্রদত্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর ভাষণ, ১৯২৩]

ইংরেজ সরকারের তাবেদারি করতে যে পুঁথিযজ্ঞ শুরু হয়েছিল, তার প্রধান ভারতীয় নেতা ছিলেন হরপ্রসাদ স্বয়ং। বৃটিশ তাঁকে প্রাপ্য সম্মান দিতে চেষ্টা করতেন তাঁর এক বিশেষ গুণের জন্য। সেটা হোল, তিনি নানান উদ্ভট বিষয় কল্পনা করতেন, সেই কল্পনা থেকে গল্প তৈরি করে সেই গল্পকে চালাতে পারতেন ইতিহাস বলে।

"হরপ্রসাদ ইতিহাসকে গল্পের মত চিত্তাকর্ষক করিতে পারিতেন সত্য, কিন্তু তাঁহার কল্পনা, গল্পকেও ইতিহাসে পরিণত করিতে কুণ্ঠিত হইত না।" [দ্রষ্টব্য : 'স্মৃতিচারণে সুশীলকুমার দে 'স্মারকগ্রন্থ', পৃ. ২২২]

ইংরেজরা যেটা চেয়েছিল সেটা হচ্ছে কাল্পনিক এক পরমতম হিন্দু ধর্ম ও সংস্কৃতি তৈরি করে তাঁদের বুঝিয়ে দেওয়া যে ইসলাম ধর্মের দিকে আকর্ষিতনা হয়ে তাঁরা যেন তাঁদের সনাতন ধর্মে আস্থা স্থাপন করেন। ঐ পরিকল্পনা কাজে পরিণত করতে হরপ্রসাদের

মতো এক উচ্চশিক্ষিত ব্যক্তি জাতভেদের বিরুদ্ধে না বলে জাতিভেদের পক্ষে যে মন্তব্য করেছেন, তা অত্যন্ত সাঙ্ঘাতিক; এমনকি জীবাণুযুক্ত গরুর মলকে জীবাণুমুক্ত বলতেও আটকায়নি তাঁর— "সেইজন্য জাতিভেদকে গণতন্ত্রের উৎকৃষ্ট উদাহরণ বলতে তাঁর দ্বিধা হয়নি। আচারনিষ্ঠতার কারণে 'পটাশ পারম্যাঙ্গানেটে'র তুলনায় 'গোবর'কে ভাল জীবাণুনাশক বলেছেন।" [অধ্যাপিকা শিপ্রা র. দ. : হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর সাহিত্যকর্ম, পৃ. ৭৮]

হিন্দু জাতি, হিন্দু ধর্ম সম্পর্কে পূর্বেই একটা প্রশ্নবাচক আলোচনা রাখা হয়েছে। কিন্তু সিদ্ধান্তে আসা যায়নি। যে হিন্দু বা হিন্দুত্ব না বেদে আছে, না গীতায় আছে না রামায়ণ-মহাভারতে আছে, সেই 'হিন্দু' কার মাথা থেকে বার হোল, এ প্রশ্নের উত্তর বাকি ছিল। সেটা হচ্ছে এই : ইংরেজ জানতো ইসলামধর্ম বিশ্বজুড়ে বর্ধমান গতিতে চলমান। সেই গতিকে থামাতে প্রয়োজন ছিল মুসলমান বাদ দিয়ে সমস্ত 'নন্-মুসলমান'কে একত্রিত করে হিন্দু-মুসলমানের বিভেদের প্রাচীরটাকে মজবুত করা। এই বিশেষ কাজের বিশেষ দায়িত্ব নিয়েছিলেন পণ্ডিত হরপ্রসাদ। তিনি বলেছেন : "আমরা তো নন্-মুসলমান। পার্সীরাও নন্-মুসলমান। পাহাড়তলির ভুটিয়া ও হূনীয়রাও নন্-মুসলমান। সাঁওতাল, ভীল, কুকী, গারো, খাসিয়া, কোল, ওঁরাও, মুণ্ডা, নাগা, আকা— ইহারাও নন্-মুসলমান। আমাদের মহাসভা এ সকল জাতির সহিত একমত হইতে পারেন না। কারণ ইহাদের আচার ব্যবহার আমাদের আচার ব্যবহার হইতে সম্পূর্ণ ভিন্ন।" তারপর শেষ ফিনিশিং দিতে, হিন্দুসভার সদস্য কে হতে পারবে আর কে পারবে না, সে সম্বন্ধে লিখলেন, "মুসলমান শাসনকর্তারা যাঁহাদিগকে হিন্দু বলিয়া জানিতেন, তাঁহাদের সকলকেই এ সভায় আসিবার জন্য আমরা অনুরোধ করিতেছি। তাই ইহার নাম হিন্দুসভা'। [দ্রষ্টব্য ভারত হিন্দুসভায় প্রদত্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর ভাষণ, ১৯২৩]

হরপ্রসাদ ছিলেন গোঁড়া ব্রাহ্মণ। বিধবাবিবাহের তিনি ছিলেন ঘোর বিরোধী। তাঁর কথায় ও কর্মে গোঁড়ামির অনেক উদাহরণ মেলে। যেমন তিনি লিখেছেন, "যদি ব্রাহ্মণ ভিন্ন অন্য কোন বর্ণ ধর্মশাস্ত্র পড়াইতে আরম্ভ করিল, এমনকি যাগযজ্ঞেরও বিধিবিধান দিতে আরম্ভ করিল, আর ব্রাহ্মণ নস্যাৎ হইয়া গেল, তাহলে ব্রাহ্মণ্য ধর্ম বা হিন্দু ধর্ম কোথায় রহিল?" [দ্রঃ পূর্বোক্ত]

আমরা একাধিকবার বলতে চেয়েছি যে, বৌদ্ধ, জৈন প্রভৃতি ধর্মগুলোকে পৃথক ধর্ম বলা যায় না। হিন্দু, বৌদ্ধ, জৈন, বৈষ্ণব সবই একাকার। যত বড় পণ্ডিতই হোন না কেন, একটা মিথ্যা বিষয় সৃষ্টি করতে গেলে তাতে ফাঁকফোকড় কিছু থেকেই যায়। হরপ্রসাদের

দল বৌদ্ধ ধর্মের কাল্পনিক ইতিহাস যেভাবেই প্রতিষ্ঠিত করুন না কেন, যে সত্যটিকে চাপা দেবার উপায় নেই, সেটা হচ্ছে এই :

"বুদ্ধদেব নিজে হিন্দু ছিলেন এবং বৌদ্ধধর্ম স্বতন্ত্র ধর্ম হিসাবে মর্যাদা পেয়েছিল বুদ্ধের মৃত্যুর প্রায় চারশত বছর পরে।" [দ্রষ্টব্য : হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর সাহিত্যকর্ম, পৃ. ২১০]

আবার স্বামী বিবেকানন্দ বলেছেন, "ভারতে বৌদ্ধ ধর্ম কোন আলাদা ধর্ম, তার আলাদা ধরণের মন্দির, আলাদা ধরণের পুরোহিত ছিল এমন কথা তোমরা ভেবো না। বৌদ্ধ ধর্ম সব সময়ই হিন্দু ধর্মের ভিতরেই।" [দ্রষ্টব্য : বিবেকানন্দ রচনা সমগ্র, পৃ. ৮৪১, ১৯৮৮]

স্যার, মহামহোপাধ্যায়, রায়বাহাদুর প্রভৃতি উপাধিগুলো কাদেরকেএবং কেন দেওয়া হোত, এ আলোচনা পূর্বে হলেও আরও বলা যায় যে, বৃটিশের অনুগ্রহপ্রার্থীদের চরম ও পরমভাবে তাদের অনুগত ও স্তাবক প্রমাণ করতে না পারলে পাওয়া যেত না ঐসব মূল্যবান (?) উপাধিগুলো। যেমন চারণকবি মুরারদানবাবু। মুসলমান বাদশাহদের এবং সিপাহী বিপ্লবীদের বিরুদ্ধে একটি কবিতা লিখেছিলেন। ইংরেজ খুবই খুশি হয়ে কবিতাটি একলক্ষ কপি ছাপিয়ে ভারতীয় সৈন্যদের মধ্যে বিতরণ করেছিল। আর মুরারদানবাবুকে তার পরিবর্তে দেওয়া হয়েছিল 'মহামহোপাধ্যায়' উপাধি।

ইংরেজের সঙ্গে জার্মানদের যুদ্ধে বৃটিশের মঙ্গল কামনায় কলকাতার কালীঘাটে যজ্ঞের আয়োজন করে পূজো দিয়েছিলেন গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়। ইংরেজরা খুশি হয়ে তাঁকেও দান করেছিল 'স্যার' উপাধি। হরপ্রসাদও সম্ভাব্য সবরকম উপাধি নিতে সক্ষম হয়েছিলেন। কিন্তু তিনি উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন যে তাঁর উন্নতিসাধন ও উপাধি প্রাপ্তির পিছনে সত্য নেই, শুধু মিথ্যা দিয়েই তার গঠন। তিনি এটাও উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন যে, সারা জীবনের বেশিরভাগ সময় শাসকদের পদসেবায় তৈলমর্দন করা হয় বটে, কিন্তু ঐ কর্মটি সুকর্ম নয়, কুকর্ম। এটাও বুঝেছিলেন যে, বৃটিশরা স্বার্থপর ও ধান্দাবাজ।

হরপ্রসাদের ভাষায়— "বাঙালীর বল নাই, বিক্রম নাই, বিদ্যাও নাই, বুদ্ধিও নাই। সুতরাং বাঙালীর একমাত্র ভরসা তৈল— বাংলায় যে কেহ কিছু করিয়াছেন সকলেই তৈলের জোরে। ... বাস্তবিকই তৈল সর্বশক্তিমান, যাহা বলের অসাধ্য, যাহা বিদ্যার অসাধ্য, যাহা কৌশলের অসাধ্য, তাহা কেবল একমাত্র তৈল দ্বারা সিদ্ধ হইতে পারে। ... কিন্তু তৈল না থাকিলে তাহার বুদ্ধি থাকুক, হাজার বিদ্যা থাকুক, হাজার ধন থাকুক কেহই টের পায় না।" [দ্রষ্টব্য : হরপ্রসাদ রচনা সংগ্রহ, ১ম খণ্ড, পৃ. ৪৯০-৯২]

ভারতবর্ষে মুসলমানদের আগমন ক্রমান্বয়ে রাজনৈতিক ক্ষেত্রে উন্নতির চরম শিখরে পৌঁছানোর যে ইতিহাস তা গভীরভাবে অনুসন্ধান করলে দেখা যাবে কিছু সাধক, তাপস, সন্ত, ঋষিতুল্য মানুষ, বোজর্গ, পীর, ওলি, কুতুব, আবদাল, সুফি প্রভৃতি নামে একটি দল ভারতে প্রভাব ফেলতে পেরেছিলেন। যেমন হযরত খাজা মইনুদ্দিন, হযরত নিযামুদ্দিন আউলিয়া, হযরত কুতুবুদ্দিন কাকী, হযরত হামিদ বাঙ্গালী প্রভৃতি অনেকে। এঁরা মোটেই সাম্প্রদায়িক ছিলেন না। তাঁদের জীবিতকালে হিন্দু-মুসলমান সমানভাবে যে শ্রদ্ধা জানাতেন, তাঁদের পরলোকপ্রাপ্তির পরে আজও তাঁদের সমাধির পাশে হিন্দু-মুসলমান সর্বজাতির মানুষের শ্রদ্ধা প্রদর্শনের প্রথা চালু রয়েছে সমানভাবে।

মানুষ অনুকরণপ্রিয়। বৃটিশের আগমনের পর হিন্দুজাতির সৃষ্টি এবং তার ইতিহাস লিখতে গিয়ে মুসলমানদের মতো মুনি-ঋষি-সাধু-সন্ত যাঁদের ঠিক করেছেন, অনেকের মতে তাঁরা ছিলেন সাধারণ মানুষের মতোই স্বাভাবিক চরিত্রের মানুষ। লোভ, লালসা, হিংসা, পরশ্রীকাতরতা, বিদ্বেষ থেকে নিজেদের বাঁচাতে পারেননি তাঁরা। ঋষি বঙ্কিম, ঋষি অরবিন্দ, মহাঋষি দেবেন্দ্রনাথ প্রভৃতির আলোচনা চেপে রাখা ইতিহাস এবং এই পুস্তকে হয়েছে। বাকি হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, গান্ধীজী প্রভৃতি ব্যক্তিকে ঋষি বানাতে গিয়ে নিরাশ হতে হয় আমাদের।

হরপ্রসাদ খুবই বড় লেখক ছিলেন। অনেকের মতে বঙ্কিমচন্দ্রের চেয়ে বেশি না হলেও সমকক্ষ তো ছিলেনই।

হরপ্রসাদের প্রথম মৌলিক রচনা 'বাল্মীকির জয়' বইটি যখন প্রকাশ পায়, সারা দেশের বুদ্ধিজীবী শ্রেণী তাঁর লেখায় মুগ্ধ হয়ে প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়ে ওঠেন। ঋষি বঙ্কিম ফেটে পড়লেন হিংসায়। তাঁর 'বঙ্গদর্শন' পত্রিকায় হরপ্রসাদকেএকেবারে হিরো থেকে জিরো বানাতে কলম ধরলেন তিনি। বঙ্কিম হরপ্রসাদের লেখার বিরুদ্ধে লিখলেন, 'ইহা পদ্যে লিখিত নহে, সুতরাং সমালোচক সম্প্রদায় ইহাকে কাব্য বলিবেন না। ইহা নাটক নহে আমি নিশ্চিত জানি, কেননা ইহা কথোপকথনে বিন্যস্ত নহে। ইহাকে নবেলও বলিতে পারিলাম না, কেননা ইহাতে নায়ক নাই, নায়িকা নাই, ভালবাসা নাই, কোর্টশিপ নাই, বিবাহ নাই, লুকোচুরি-মারামারি-খুনোখুনি কিছুই নাই। ইহাতে বশিষ্ঠ-বিশ্বামিত্রের কথা আছে— কিন্তু পুরাণ নহে— দিগ্বিজয়ের কথা আছে, কিন্তু ইতিহাস নহে। একটা সৃষ্টির বিবরণ আছে কিন্তু বিজ্ঞান নহে, ... হরপ্রসাদ শাস্ত্রী নিশ্চিত একটা কিম্ভূতকিমাকার পদার্থের সৃষ্টি করিয়াছেন।" [বঙ্গদর্শন, ১২৮৯, ৮ম খণ্ড, পৃ. ২৭৫]

হরপ্রসাদের ভিতরে হিংসা থাকলেও এত উৎকটভাবে নোংরামি করতে পছন্দ করেন নি তিনি। তিনি তাঁর নিজের লেখার সঙ্গে তুলনা করে ঐ সময়কার চলতি উপন্যাসগুলোকে

গণিকাতন্ত্র বা বেশ্যাতন্ত্র বলতে দ্বিধা করেননি। 'বেনের মেয়ে' উপন্যাসটি লেখার পর তাঁর ঐ বইয়ের স্বপক্ষে এবং অন্যান্য উপন্যাসের বিপক্ষে হরপ্রসাদ লিখলেন, "বাঙালী এখন কেবল একেলে 'গণিকাতন্ত্রে'র উপন্যাস পড়িতেছেন। একবার সেকেলে সহজিয়াতন্ত্রের একখানি বই পড়িয়া মুখটা বদলাইয়া লউন না কেন?" [হরপ্রসাদ রচনা সংগ্রহ, প্রথম খণ্ড, পৃ. ১৯৮]

বঙ্কিমচন্দ্র যখন ভিতরে ভিতরে রেগে উঠলেন, তখন তাঁর এতটা ক্ষমতা প্রয়োগ করার অবকাশ ছিল যে তিনি ইচ্ছা করলে বৃটিশের দরবার থেকে হয়ত বিতাড়িত করতে পারতেন হরপ্রসাদকে। তবে যে কোন ভাবেই হোক, এমন একটা প্রচণ্ড চাপ হরপ্রসাদের উপর এলো যে, তাঁর উপন্যাস লেখা দীর্ঘদিনের জন্য বন্ধ রাখতে বাধ্য হলেন তিনি।

"১২৯০ (১২৮৯) সালে যখন সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয় বঙ্গদর্শনের সম্পাদক, তখন 'কাঞ্চনমালা' বঙ্গদর্শনে প্রকাশ হইয়াছিল। তাহার পর নানা কারণে আমি অনেকদিন ধরিয়া বাংলা লিখি নাই; সুতরাং 'কাঞ্চনমালা' প্রকাশের জন্য যত্ন করি নাই। কেন কি বৃত্তান্ত— সে অনেক কথা— বলিয়া কাজ নাই।" [ঐ, ১ম খণ্ড, পৃ. ৮০]

ডঃ সুকুমার সেন এই বিষয়ে মন্তব্য করেছেন, "... বঙ্কিমচন্দ্রের অনুশাসন মনে রেখেই বোধহয় হরপ্রসাদ আর কোন গল্প লেখেননি।" [ঐ, পৃ. ১৮]

১২৮৯ সালে বঙ্গদর্শন পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে 'কাঞ্চনমালা' যখন প্রকাশিত হচ্ছিল, তখন, "ঔপন্যাসিক বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ও বিচলিত হইয়াছিলেন। তাঁহার প্রতিভার প্রতিদ্বন্দ্বীই বা হরপ্রসাদ হইয়া পড়েন, এই চিন্তা তাঁহার আসিয়াছিল। ... তাহা শুনিয়া রাজকুমারবাবু হরপ্রসাদকে উপন্যাস লিখিতে মানা করিয়া বলিয়াছিলেন যে, 'তুমি এখন নাই লিখিলে you will survive him long, লেখার সময় তো ঢের পাবে, বন্ধুবিচ্ছেদ নাই বা করিলে'।" [দ্রঃ গণপতি সরকার : হরপ্রসাদ জীবনী, কলকাতা, ১৩৪৩, পৃ. ২৯]

এইসব রকমসকম দেখে নিজেকে গুটিয়ে নিলেন হরপ্রসাদ। শেষে ক্ষমা যেভাবেই হোক চেয়ে, বঙ্কিমকে তুষ্ট করতে পেরেছিলেন তিনি।

বঙ্কিম চোখবুজে যে লেখার দুর্নাম করেছিলেন, আবার সেই লেখা এবং তার লেখকের জন্য অনায়াসে লিখে ফেলতে পারলেন, "চন্দ্রের কলঙ্ক যেমন কিরণে ডুবিয়া যায়, এও তাই। ইহার গুণসকল বলিয়া উঠি এমন সময়ও নাই। কাব্যের প্রধান উৎকর্ষ— কল্পনায়। ইহার কল্পনা অতিশয় মহিমাময়ী।" [বঙ্গদর্শন, ৮ম খণ্ড, পৃ. ২৮৩ দ্রষ্টব্য]

তাহলে দেখা যাচ্ছে, যা অকাব্য ছিল, তা 'কাব্য' হয়ে গেল, হরপ্রসাদের লেখায় চাঁদের 'কিরণে'র ছড়াছড়িও দেখতে পেলেন, আর হরপ্রসাদের কল্পনাকে 'মহিমাময়ী' বলতেও আটকালো না তাঁর। আর লেখাটি এত প্রশংসার উপযুক্ত ছিল যে তা লিখতে

তাঁর 'সময়ও নাই'। যেটাকে তিনি বলেছিলেন 'কিম্ভূতকিমাকার পদার্থ', সেটাকে আবার হজম করার পর্যাপ্ত ক্ষমতাও ঋষি বঙ্কিমের ছিল। এসব ঋষিদেরই মহিমা।

হরপ্রসাদ বারে বারে বুঝতে পারছিলেন তাঁকে বা তাঁদেরকে বৃটিশ প্রভুরা যে আঁতাতে নিযুক্ত করেছিল, তা যেন অসহ্য। তাই লিখে ফেললেন নিজের ভাষায়— "কিসে লোকের কাছে অধিক পরিমাণে বাহবা লওয়া যায় (লোকের কাছে বলিতে কালা বাঙালীর কাছে নয়, শুদ্ধ লালমুখের কাছে বুঝায়), কিসে সাহেবদিগের কাছে সম্মান বাড়ে, কিসে নামের পাশে ৭/৮টা ইংরাজী অক্ষর জুড়িতে পারা যায়, আমাদের জীবনে শুধু একমাত্র উদ্দেশ্য হইয়া দাঁড়াইয়াছে।" [হরপ্রসাদ গ্রন্থাবলী, কলকাতা, পৃ. ৩১৮]

মনের দুঃখে সত্য কথা মাঝে মাঝে বলে ফেলতে লাগলেন হরপ্রসাদ। 'ইংরেজি আমাদের রাজভাষা'— এটা স্বীকার করেও বলে ফেললেন, "তাই বলিয়া ছয় কোটি ছষট্টি লক্ষ লোক ইংরাজি পড়িয়া মরিবে কেন? ... ইংরাজীতে অঙ্ক কষিতে হইবে, ইতিহাস পড়িতে হইবে, বিজ্ঞান শিখিতে হইবে, ইহার অর্থ কি? বাঙ্গালা দিয়া ইংরাজি শিখ না কেন?"

সংস্কৃত ভাষায় ইংরাজ জাতির প্রভাবের কথা স্বীকার করে বলেই ফেললেন, "আমাদের সংস্কৃত শিখিতে হইলেও ইংরাজি দিয়া শিখিতে হয়।" [ঐ, পৃ. ৩২১ দ্রষ্টব্য] মিথ্যা ইতিহাস সৃষ্টি করার ইংরেজ-চক্রান্তে তিনি সংযুক্ত হলেও মাঝে মাঝে বিক্ষুব্ধ হয়ে প্রকাশ করে ফেলতেন অনেক সত্য কথা— "শুধু ইংরেজি পড়িয়া আর সাহেবদের বই পড়িয়া ভারতবর্ষের ইতিহাস জমিবে না, জমাইতে পারিবে না।" [দ্রঃ হরপ্রসাদ রচনাবলী, প্রথম খণ্ড, পৃ. ৪৬৪]

হরপ্রসাদের মতে "সাহেবদের রচিত ইতিহাস প্রকৃত ইতিহাস নয় ; সাহেবরা এদেশীয় পণ্ডিতদের সহায়তায় কয়েকটি সংস্কৃত গ্রন্থ পড়ে ভারতবর্ষের ইতিহাস বিষয়ে যে চূড়ান্ত কথা বলতে চেয়েছেন, তা ভ্রান্ত ও একদেশদর্শী। তাঁদের মতে মুসলমান অধিকারের পূর্বে ভারতবর্ষের কোন ইতিহাস ছিল না। একমাত্র বেদেই ভারতের গৌরব। ... ইয়োরোপীয়দের হাতে ভারতের ইতিহাস রচনার সূত্রপাত হয়েছে— এ কথা স্বীকার করে এবং ম্যাক্সমুলার, পারজিটার, ম্যাকডোনেল ও কীথের জ্ঞানগর্ভ রচনার ঋণ শিরোধার্য করে নিয়েও হরপ্রসাদ ভারতবর্ষের ইতিহাস নতুন করে সাজানো আবশ্যক মনে করেছেন।" [দস্তিদার, ঐ, পৃ. ২১৭] হরপ্রসাদ নিজের ভাষায় লিখেছেন, "আমাদের ইতিহাস ছিল না, ইয়োরোপীয়ানরা আমাদের ইতিহাস শিখাইয়াছেন সে কথা সত্য। তাঁহারা আমাদিগকে যে পথে চালাইতেছেন আমরা এখনো সেই পথে চলিতেছি; কিন্তু তাঁহাদের কথা শুনিলে আর চলিবে না। তাঁহারা আমাদের দেশের সব খবর রাখেন না, সব বই পড়েন না,

সকলের সঙ্গে মিশেন না; দুই দশখানি বই পড়িয়াছেন, তাহা হইতেই একটা ইতিহাস খাড়া করিয়া দেন।" [দ্রষ্টব্য : হরপ্রসাদ রচনাবলী, প্রথম, পৃ. ৪৫৭]

হরপ্রসাদ বাবুদের গ্রুপে উড়িষ্যার পণ্ডিতও ছিলেন। ঐ পণ্ডিতদের তিনি ভাল চোখে দেখতেন না। মনে মনে হয়তো একটা হিংসা বাসা বেধে ছিল তাঁর ভিতরে। তাই তিনি মন্তব্য করলেন, "বঙ্গবাসী এইবার তোমার বড়ই লজ্জার কথা। বিদেশীয়দিগের উৎসাহে, বিদেশীয়দিগের উপকারার্থে, বিদেশীয়দিগের যত্নে বিদেশীয় পণ্ডিত কর্তৃক তোমাদের সাহিত্য আরম্ভ হইল। ... উড়ে ও সাহেবে বাংলায় সাহিত্য আরম্ভ করিল। আরও লজ্জায় কথা এই যে, দুই একজন বাঙালি এইসময় পুস্তক লিখিয়াছেন, তাঁহাদের পুস্তক কদর্য ও জঘন্য বলিয়া গণ্য হইয়াছিল। কৃষ্ণচন্দ্র রায় চরিত্র ও প্রতাপাদিত্য চরিত্র বাঙালীর লেখা। দুইখানিই অপাঠ্য।" [ঐ রচনাসংগ্রহ, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃ. ৫০২]

ইংরেজের কর্মকাণ্ডে যাঁরা জড়িয়ে পড়েছিলেন, ইংরেজের ইঙ্গিতের বাইরে তাঁদের এক পা-ও চলবার ক্ষমতা ছিল ন। যখনই চলতে গেছেন, তখনই ধাক্কা খেয়েছেন তাঁরা। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরও মনে মনে জানতেন যে, বৃটিশের তৈরি করা কলেজ এবং ইউনিভার্সিটিগুলোতে মৌলিক শিক্ষা ছিল না। সেগুলো ছিল মূর্খদের আধাশিক্ষিত করে কাজে লাগানোর উপযুক্ত করার কারখানা মাত্র।

বাবু, রাজা, মহারাজা, রায়বাহাদুরদের বিদ্যের বহরের কথা কিছু আলোচনা হয়েছে। হরপ্রসাদের গ্রুপের পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর পূর্ণচন্দ্রকে বললেন, "তাই বলি পূর্ণচন্দ্র, আমাদের যেসব ছেলে আছে, তাহাদের কাছ থেকে আমরা মাহিনা নিই, পাঙ্খা ফি নিই, একজামিনেশন ফি নিই, নিয়া কলের দোর খুলি— দেখাইয়া দিই, এইখানে মাস্টার আছে, এইখানে পণ্ডিত আছে, এইখানে বই আছে, এইখানে বেঞ্চি আছে, এইখানে চেয়ার আছে, এইখানে কাগজ-কলম-দোয়াত-পেনসিল-সিলেট-বই আছে। বলিয়া তাহাদের কলের ভিতর ফেলিয়া দিয়া চাবি ঘুরাইয়া দিই। কিছুকাল পরে কলে তৈয়ারী হইয়া তাহারা কেহ সেকেন্ড ক্লাস দিয়া, কেহ এনট্রেন্স হইয়া, কেহ এল. এ. হইয়া, কেহ বি. এ. হইয়া, কেশ এম. এ. হইয়া বেরোয়। কিন্তু সবাই লেখে। has ; একপাকের তৈরি কিনা।" [ঐ রচনাবলী, দ্বিতীয়, বিদ্যাসাগর প্রসঙ্গ, পৃ. ১৪]

রাজনারায়ণ বসুও লিখেছেন, "এম. এ. উপাধিপ্রাপ্তি অর্থাৎ স্বর্গারোহন অতি অল্প লোকেরই ভাগ্যে ঘটে। এক হিসাবে বর্তমান ইংরেজি শিক্ষার প্রণালী মানুষ মারিবার কল বলিলেও অত্যুক্তি হয় না।" [রাজনারায়ণ বসু : সেকাল আর একাল, পৃ. ৪১-৪২]

বেদের পক্ষে হরপ্রসাদের যতো অবদানই থাকুক, তিনি কিন্তু নিজে জানতেন বেদের অন্তর্নিহিত রহস্য। তাই বিবেকানন্দের মতো বেদের বিরুদ্ধেও মন্তব্য করেছিলেন তিনি।

বেদের জন্য তিনি লিখেছেন, ওগুলো কবিদের কবিতা বা গান। আর সেই কবিগুলোকে ক্রমে ক্রমে দেবতায় পরিণত করা হয়েছে। বেদ সম্পর্কে যে শব্দগুলো বিশেষণ হিসেবে ব্যবহার করেছেন, তা মারাত্মক বলা যায়। তিনি লিখেছেন, "কিন্তু উহা (বেদ) দুর্বোধ্য, দুষ্পাঠ্য, দুষ্প্রবেশ্য, দুরধিগম্য। ... ভিন্ন ভিন্ন কালের ভিন্ন অবস্থায় ভিন্ন ভিন্ন কারণে, ভিন্ন ভিন্ন মহাকবি-প্রণীত কতকগুলি কবিতা গান আদি সংগ্রহমাত্র।" [দ্রঃ ঐ গ্রন্থাবলী, পৃ. ২৮৬]

মুসলমান আমলে সারা দেশের লোক স্বতঃস্ফূর্তভাবে যে বাংলা ভাষা ব্যবহার করতো, তাতে স্বাভাবিকভাবেই আরবি, ফারসি, উর্দু শব্দ যুক্ত হয়েছিল। ঐ সহজ কথোপকথনের ভাষাকে মুসলমানি ভাষা মনে করে আরবি, ফারসি, উর্দু শব্দগুলোকে সরিয়ে দিয়ে সেই জায়গায় মনগড়া বৃটিশ কল্পনাপ্রসূত যেসব সংস্কৃত শব্দ আমদানি করা হয়েছিল, তার শ্রেষ্ঠতম নায়ক ছিলেন হরপ্রসাদ শাস্ত্রী।

তবুও সত্য স্বীকার করে মুসলমানদের সম্বন্ধে তিনি বলেছিলেন— "চলতি মুসলমানি শব্দ তোমরা তাড়াইবে কেন? তাড়াইবার তোমাদের কী অধিকার আছে? যে সকল শব্দ তিন, চার, পাঁচ শত বৎসর হইতে চলিয়া আসিতেছে, তাহাদের তো ভাষায় থাকিবার কায়েমী স্বত্ব জন্মিয়া গিয়াছে। ... বাংলায় যখন অর্ধেক মুসলমান, তখন তাহারা যে হিন্দুরা যাহা বলিবে, তাহাই করিবে— এরূপ আশা করা যায় না।" [ঐ রচনাসংগ্রহ, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃ. ৩৭০]

ঢাকা ইউনিভার্সিটিতে হরপ্রসাদ অধ্যাপনা করতেন। সেখানে তখন মুসলমান ছাত্রই ছিল বেশি। ছাত্ররা তাঁর বাসায় যাতায়াত করতো। মুসলমান ছাত্রদেরও তিনি খাওয়াতেন এবং পড়াশোনার আলোচনা করতেন। কিন্তু তাদের ছোঁয়া খাবার তিনি খেতেন না কখনও। শ্রী কালীপদ দাস তাঁর স্মৃতিচারণে বলেছেন, "তিনি ইউনিভার্সিটিতে কখনো জল খেতেন না। পিপাসা পেলে আমাদের দিয়ে ডাব কিনিয়ে এনে গ্লাস ছাড়া ঐ ডাব থেকেই জল খেতেন।" [দ্রষ্টব্য : স্মারক গ্রন্থ, পৃ. ১৪৪]

বুদ্ধদেব বৌদ্ধধর্ম সম্বন্ধে অনেক কিছু লেখা হয়েছে পূর্বেই। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে, ঐ সাজানো গোছানো বৌদ্ধ কেচ্ছাটিকে যদি মেনেই নেওয়া হয়, তাহলে অশোকের সময়ে বৌদ্ধধর্ম প্রচারে রাজশক্তি যোগ হয়ে ভারতবর্ষের বেশিরভাগ লোকই যে বৌদ্ধ হয়ে গিয়েছিলেন সেই বিশাল সংখ্যার বৌদ্ধরা তাহলে গেলেন কোথায়? আজ কেন তাঁরা আঙুলে গোনা মুষ্টিমেয় দলে পরিণত? এই প্রশ্ন বা সমস্যা বিরাট হলেও মহাপণ্ডিত হরপ্রসাদ এর সমাধান করে দিয়েছিলেন নিমেষেই। তিনি লিখলেন, "মুসলমান অধিকাররূপ শিশিতে বা বোতলে হিন্দু বা বৌদ্ধ দুই জাতিকে বন্ধ রাখিয়া এই সাতশত

বছরের পর দেখা যাইতেছে, দুই-ই এক হইয়া গিয়াছে, ইতর-বিশেষ করা যায় না।" [রচনা সংগ্রহ, তৃতীয় খণ্ড, পৃ. ৫৭৭]

বারবার আমরা উল্লেখ করেছি বা করছি যে, মৌলিক পাণ্ডিত্যের অধিকারী হরপ্রসাদ বৃটিশ চক্রান্তের সহযোগী হলেও তাঁর বিবেক জাগ্রত ছিল। সত্য উপলব্ধি করতে অনধ হয়ে যান নি তিনি।

মুসলমানেরা যে বাংলা ভাষা ও বাংলাদেশকে ভালবাসতেন, সে উপলব্ধি তাঁর ছিল। তাই লিখতে পারলেন, "বাংলা হিন্দু-মুসলমানের দেশ। মুসলমানের সংখ্যা হিন্দুর প্রায় অর্ধেক। কিন্তু দুঃখের বিষয়, হিন্দুরা মুসলমানদিগের বড় একটা খবর রাখেন না। এই সকল মুসলমানেরা কিন্তু বাঙালী, বাংলার উপর হিন্দুদের যত টান, মুসলমানদিগের তদপেক্ষা কোনমতেই কম নহে।" [রচনাসংগ্রহ, দ্বিতীয়, পৃ. ৫৬৭]

হরপ্রসাদ বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদে সভাপতির দীর্ঘ অভিভাষণ দিতে গিয়ে বলেন, "..... যাহারা আসিয়াছে, তাহারা অধিকাংশ— এমনকি শতকরা ৯৯ জন হিন্দু, একজন মুসলমান। মুসলমানেরা যাহাতে সাহিত্য পরিষদের মেম্বর হন, সেটি বড়ই বাঞ্ছনীয়। কারণ, গত ৭০০ (সাতশত) বৎসর ধরিয়া মুসলমান ছাড়িয়া বাংলার কোন কাজই হইতেছে না।" [দ্রঃ রচনা সংগ্রহ, দ্বিতীয়, পৃ. ৩০৯]

হিন্দুজাতির মধ্যে একদলের চরিত্র খুবই নিচে নেমে গিয়েছিল, আর একদল স্বাভাবিকভাবেই উন্নত চরিত্রের ছিলেন— এই দুটিকে বিভাজন করে হিন্দু ও বৌদ্ধ এই দুটি ধর্মকে সৃষ্টি করা হয়েছে বলে অনেক আধুনিক গবেষকের মত।

মুসলমান শাসকদের আগমনে এবং তাঁদের সঙ্গে ভারতবাসীর মেলামেশার কারণে তাঁদের চরিত্রের অপেক্ষাকৃত উন্নতি হয়েছিল, একথা স্মরণ রেখেই হরপ্রসাদ শাস্ত্রী বলেছেন, "তিন-চারিশত বৎসর ধরিয়া বৌদ্ধেরা ইন্দ্রিয়াসক্ত, কুকর্মান্বিত ও ভূতপ্রেতের উপাসক হইয়া যে নিজেও অধঃপাতে গিয়াছিল এবং দেশটাকে শুদ্ধ অধঃপাতে দিয়াছিল। মুসলমান আক্রমণ তাহারই প্রায়শ্চিত্ত। বিধাতা যেন তাহাদের পাপের ভার সহ্য করিতে না পারিয়া তাহাদিগকে সমূলে উচ্ছেদ করিবার জন্য মুসলমানদের এ দেশে পাঠাইয়াছিলেন।" [রচনা সংগ্রহ, তৃতীয় খণ্ড, পৃ. ৩৮১-৮২]

বৃটিশের প্ররোচনায় গোটা ভারতবর্ষের অমুসলমানদের শেখানো হয়েছে যে, ভারতের নাকি সবই ছিল। এখন সে সব ধ্বংস হয়ে গেছে মুসলমানদের কারণে। হরপ্রসাদ তাতে জড়িয়ে থাকলেও তিনি নিজে তা বিশ্বাস করতেন না বলেই লিখতে পেরেছেন— "মুসলমানেরা যে ভারতবর্ষের কখনো কোন উপকার করিয়াছে অথবা উহাদের দ্বারা ভারতবর্ষের কোন উপকার সাধিত হইয়াছে ইহা কেহই স্বীকার করিতে সম্মত নহেন।

সর্বদাই শুনিতে পাওয়া যায় যে, মুসলমানেরা আমাদের সমস্ত পুস্তকাদি ধ্বংস করিয়া গিয়াছেন। অনেক শিক্ষিত লোক তথাপি মুক্তকণ্ঠে বলিয়া থাকেন যে, ভারতবর্ষের প্রাচীন ইতিহাস ছিল। মুসলমানেরা উহা দগ্ধ করিয়া ফেলিয়াছেন। একথা বাস্তবিক সত্য নহে।" [দ্রষ্টব্য হরপ্রসাদ শাস্ত্রী : মুসলমানগণের সংস্কৃত চর্চ্চা, 'বিভা', মাঘ ও ফাল্গুন, ১২৯৫]

ইংরেজ সরকার টের পেতে লাগলো যে, হরপ্রসাদ শাস্ত্রী কিছু কিছু ক্ষেত্রে সামান্য সামান্য বিরোধী বক্তব্য রাখতে শুরু করেছেন। সুতরাং সিদ্ধান্তও নেওয়া হোল তাঁর উন্নতির মই কেড়ে নেওয়ার। ঢাকা ইউনিভার্সিটির কর্তৃপক্ষের কাছে অধ্যাপক হরপ্রসাদ শাস্ত্রী তাঁর সহকর্মী অধ্যাপক ভাণ্ডারকরের বেতনের সঙ্গে তুলনা করে জানিয়েছিলেন তাঁর ছোট্ট দাবি। কিন্তু বৃটিশ কর্তৃপক্ষ নানা আইনের প্যাঁচ দেখিয়ে প্রত্যাখ্যান করেছিলেন সেই প্রস্তাব। তিনি বিস্ময়ে হতবাক হয়ে গেলেন এইজন্য যে, সারাজীবন বৃটিশের গোলামি এবং তাদের সেবায় নিজেকে নিঃশেষ করে দিয়েও শেষ পর্যন্ত তাদের মন জয় করা সম্ভব হোল না। দুঃখে, ক্ষোভে ও লজ্জায় অধ্যাপনার চাকরিতে পদত্যাগ করে চলে এলেন শিশুর মত হাউ হাউ করে কাঁদতে কাঁদতে। [তথ্য : ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে সংরক্ষিত হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর ব্যক্তিগত নথি ; স্মারকগ্রন্থে শ্রী কালীপদ দাসের স্মৃতিচারণ, পৃ. ১৪৪]

হরপ্রসাদ কিন্তু সেই সস্তার বাজারে লক্ষ লক্ষ টাকা কামিয়ে নিয়েছিলেন। এটা অবশ্য ইংরেজ সরকারের তাবেদারি করার সুফল। ইংরেজ সরকারের উপরে যখন তাঁর সুধারণা শেষ হয়ে গেল, তখন ইংরেজের বিরুদ্ধে ঘোরপ্যাঁচ বাদ দিয়ে সোজাসুজিভাবে বলেছেন অনেক ক্ষেত্রেই। ইংরেজের স্তাবকতা আর মিথ্যার আশ্রয় নিয়ে অনেকের মতো হরপ্রসাদ নিজে এবং একটি বিশেষ গোষ্ঠী উপকৃত হয়েছেন বটে কিন্তু মুসলমান জাতি এবং অন্যান্য অনুন্নত সম্প্রদায়ের মানুষেরা হয়েছেন রিক্ত, বঞ্চিত ও ক্ষতিগ্রস্ত।

কালীপদ সেন স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর একটি উক্তি তুলে ধরেছেন : "ভারতবর্ষের ইতিহাস' বইটির শেষদিকে একটি পরিচ্ছেদ ছিল 'ভারতে ইংরেজ শাসনের সুফল'। হরপ্রসাদ বলেন, 'ইংরেজের স্তাবকতা অনেক করা গেছে এবং প্রসাদও কিছু মিলেছে। কিন্তু এই ৭৬ বৎসর বয়সে মিথ্যা কথা আর লিখতে পারব না। পারলে সুফল কেটে কুফল বসাতাম। কিন্তু তাহলে আমার বইখানি আর চলবে না। জানো, এই বইখানি এ পর্যন্ত আমাকে পঞ্চাশ হাজার টাকা এনে দিয়েছে।" [দ্রঃ স্মারক গ্রন্থ, ঐ, পৃ. ১৫৯]

১৯২৮ খৃষ্টাব্দে কলকাতার রাস্তায় পড়ে গিয়ে আহত হন গুরুতরভাবে। ফলে বগলে ক্রাচ এবং চাকা লাগানো চেয়ার ছাড়া স্বাভাবিকভাবে চলাফেরা করতে পারতেন না তিনি। বৃদ্ধ হরপ্রসাদকে বাদ দিয়ে অনেক নবীন যুবককে সহযোগী হিসাবে বেছে

নিচ্ছিল বৃটিশ। তাতে তিনি খুব হীনম্মন্যতায় ভুগতেন, নিজেকে মনে করতেন একটা বৃদ্ধ কাকের মতো। তাই একটি ভাষণে অনেক নবীন বৃটিশ-সহযোগীদের সামনে ক'রে তিনি বলেন— "You have heard the songs of many young cuckoos ; this time perhaps you will have to hear the shivering cowing of an old crow, from the effects of storm and rain."

সাধারণতঃ যাঁরা ঈশ্বর, আল্লাহ্ বা গড্-এর অস্তিত্ব স্বীকার করেন, তাঁরা পরকালকেও বিশ্বাস করেন। আরও বিশ্বাস করেন যে, ইহকাল সীমিত খানিকটা সময় মাত্র। কিন্তু পরকাল বিরাট, বিশাল এবং চিরস্থায়ী। যাঁরা শুধু ইহকালের উন্নতিকে কেন্দ্র করেই ধর্ম পালন করেন, তাঁরা প্রকৃতপক্ষে ধার্মিক নন আদৌ। পার্থিব ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিও মৃত্যুর পূর্বে শেষ সান্ত্বনা গ্রহণ করেন এই ভেবে যে, ইহকালে লাভবান না হলেও পরকালে চিরস্থায়ী সুখশান্তি পাবেন। সেই আশায় তিনি করতে থাকেন একটি ধর্মীয় প্রতীক্ষা।

আমরা হরপ্রসাদের ইতিহাস আলোচনায় দেখলাম তিনি ছিলেন একেবারে গোঁড়া হিন্দু অর্থাৎ ব্রাহ্মণ্যবাদী ব্রাহ্মণ। কিন্তু শেষ বয়সে যখন তিনি হিসেব কষে দেখলেন, ঢাকা ইউনিভার্সিটিতে বৃটিশের পক্ষ থেকে পেলেন অসম্মান ও বঞ্চনা, তারপর পেলেন স্ত্রী বিয়োগের আত্মিক যন্ত্রণা, আশুতোষ মুখার্জির সঙ্গে মনোমালিন্য হওয়ায় পুত্র বিনয়তোষকে কলকাতা ইউনিভার্সিটিতে একটা কাজে ঢুকিয়ে দিতে না পারার ব্যর্থতা ইত্যাদি কারণে তিনি যেন ধরেই নিলেন ধর্মটর্ম ওসব কিছুই নয়। একটি উদ্ধৃতি দিয়ে শেষ করতে চাইছি প্রসঙ্গটি : "অথচ শেষ বয়সে তিনি প্রায় সবই (ধর্মকর্ম) ছেড়ে দিয়েছিলেন।" [অধ্যাপিকা দস্তিদার : ঐ, পৃ. ৭৮]

"শেষ বয়সে একান্তে নিত্যপূজা, জপতপ, এমনকি সন্ধ্যা আহ্নিকও তিনি করতেন না। তীর্থভ্রমণ, সাধুসঙ্গ, দেবস্থানে মানত, মাদুলি ধারণ— এসব কিছুই তিনি করতেন না। তাঁর প্রিয় ছাত্র প্রেসিডেন্সি কলেজের সংস্কৃতের অধ্যাপক নীলমণি চক্রবর্তী মহাশয় সম্বন্ধে তিনি প্রায়ই আক্ষেপ করে বলতেন, 'ওর কিছু হবে না। ও চার ঘণ্টা পুজোয় নষ্ট করে'। [দ্রঃ পূর্বোক্ত স্মারকগ্রন্থ, পৃ. ১৩২]

রামমোহনের জটিল ইতিকথা

রাজা রামমোহন রায়ের আলোচনা প্রথম খন্ডে শুরু করা হলেও সম্পূর্ণ করা যায়নি সেটা। 'রাজা' 'মহারাজা' প্রভৃতি বলে কোটি কোটি মানুষের কাছে যা প্রচার করা হয়েছে তা ভাঁওতা মাত্র। রাজা বলতে King বা Emperor নন এঁরা হচ্ছেন বেশির ভাগই খাজনা আদায়কারী। সরকারের কৌশলে চাষীদের হাত থেকে কায়দা করে জমিজমা কেড়ে নিয়ে করা হয় চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত— সেটা ছিল কর্নওয়ালিসের সময়। ঐ সব জমির কর আদায়ের দায়িত্ব যাঁরা পেয়েছিলেন তাঁরাই হয়ে গেলেন জমিদার বা জমির আসল মালিক। এঁদের বেশির ভাগেরই চরিত্র ছিল নোংরা। Fifth Report-এ যে সমস্ত বিশেষণে এই জমিদারদের ভূষিত করা হয়েছে। তার মধ্যে কয়েকটি হোল এই ঃ জমিদাররা হলেন নির্বোধ কিংবা স্বল্পবুদ্ধিসম্পন্ন, অলস, লম্পট, অমিতব্যয়ী, অভাবী, অত্যাচারী, অজ্ঞ, লোভাতুর, ডাকাত-পেষক, প্রতিবন্ধক ও ব্যধিগ্রস্ত। [দ্র ঃ Land Problem of India : R. K. Mukherjee, p. 16]

রামমোহন রায় ছবি: 'পশ্চিমবঙ্গ

হেস্টিংসের আমলে অর্থাৎ ১৭৭২তেও জমিদারির সংখ্যা ছিল দুশোরও কম। ১৮৭২ সালে জমিদারির সংখ্যা বাড়িয়ে করা হোল দেড় লক্ষেরও বেশি। এই দেড়লক্ষ জমিদারির জমিদাররাই যদি শুধু গরীব চাষীদের সরাসরি শোষণ করত তাহলেও খানিকটা বাঁচার রাস্তা ছিল। জমিদার ছাড়া শোষণ করার জন্য আরও যে সমস্ত রক্তশোষকদের নিয়োগ করা হয়েছিল তারা হোল ইহ্‌তিমামদার, ঠিকাদার, ইজারাদার, লাখেরাজদার, জায়গীরদার, ঘাটোয়াল আয়মাদার, মকরারীদার, তালুকদার, পত্তনিদার, মহলদার, জোতদার, গাঁতিদার, হাওলাদার প্রভৃতি। এই 'দার'-এর দলই ছিল ধ্বংসের 'দ্বার'। এরা ছাড়াও যাদের ঘুষ বা ভেট দিয়ে খুশি রাখতে হোত তারা হোল "জমিদারের দেওয়ান, নায়েব, এস্টেট ম্যানেজার, গোমস্তা, পাইক, তহশীলদার, দফাদার, পাটোয়ারি, মন্ডল, জমিদারের

ভৃত্য প্রভৃতিদের সংখ্যা ছিল ৫৮,৭৪৯। এরা কৃষক শোষণের অংশীদার।" [বাংলার সামাজিক ইতিহাসের ধারা : ডঃ বিনয় ঘোষ, পৃ. ১৮]

এইসব জমিদার গোষ্ঠীর নেতৃত্বে ছিলেন রামমোহন রায়। আর তাঁর সহকারী ছিলেন রাজপুত্র না হয়েও 'প্রিন্স' দ্বারকানাথ ঠাকুর। রামমোহন কিন্তু ছিলেন ইংরেজি শিক্ষিত এবং নানা ভাষাজান্তা সুচতুর জমিদার নেতা। এক কথায় তিনিই ছিলেন অধিকাংশ জমিদারদের পরামর্শদাতা, পথপ্রদর্শক ও রক্ষাকর্তা।

ইংরেজ সরকারের অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়েছিলেন প্রধানত তাঁরাই যাঁরা প্রত্যক্ষভাবে নিপীড়িত হচ্ছিলেন অর্থাৎ সেই কৃষক সমাজ ও অনুন্নত গরীবেরা। উল্লেখ্য যে, মুসলমান সমাজ পরিণত হয়েছিল কৃষক সমাজে। আর অত্যাচারিত নিপীড়িতের দল বিপ্লবী হয়ে রুখে দাঁড়িয়েছিলেন। সেগুলোর মধ্যে মুসলমানদের ওহাবী, ফারাজী, নীল ও সিপাহী বিপ্লব, সাঁওতাল বিপ্লব, রেশম শিল্পী বিপ্লব, তাঁত শিল্পী বিপ্লব, লবণ শিল্পী বিপ্লব ইত্যাদি উল্লেখ্য।

এই সময় রামমোহন রায় ছিলেন তরুণ। তিনি একটির পর একটি ভূ-সম্পত্তি কিনে চলেছেন, ইংরেজ সিভিলিয়ানদের সঙ্গে সুদের কারবার করছেন আর কেনাবেচা করছেন কোম্পানির কাগজ। তিনি বড় বড় তালুক কিনেছেন চন্দ্রকোণার রামেশ্বরপুরে, জাহানাবাদ পরগনার গোবিন্দপুর ও বিরলুকে, লাঙ্গুলপাড়ায় নতুন তালুক, ভুরসুট পরগণার কৃষ্ণনগর ও শ্রীরামপুর, কলকাতার চৌরঙ্গীতে কিনলেন দোতলা বিরাট বাড়ি, মাণিকতলায় বাগানসহ বিরাট বাড়ি, তাছাড়া চারিদিকে জমিজায়গা কিনতে লাগলেন। যেখানে যেখানে ভূ-সম্পত্তি কিনেছেন সেগুলোর নাম কাবিলপুর, কেদারপুর, ধাওলা, দীখচক, চকজয়রাম, গৌরাঙ্গপুর, চিঙ্গড়াদীং, লাউসর, খড়িগেরা,জুগীকুন্ড, শোলা, রঞ্জিতবাটী, আস্তাবাসুচক, মড়াখালি, রায়বার, আটঘরা, সুদামচক, অযোধ্যা, কলাহার প্রভৃতি বহু স্থানে ভূ-সম্পত্তির মালিক হয়েছেন। [তথ্য : The Permanent Settlement in Bengal (1740-1819) : Sirajul Islam]

আগেই বলা হোল, তিনি ছিলেন শিক্ষিত। সুতরাং তাঁর চরিত্র ভাল হওয়াই বাঞ্ছনীয়। "অথচ রামমোহনের বড় ভাই জগমোহন সরকারী খাজনা বাকী রাখার অপরাধে ১৮০১ খৃষ্টাব্দ থেকে জেলে দীর্ঘকাল আটক হয়ে আছেন; ১৮০৪ খৃষ্টাব্দে রামমোহন যখন মুর্শিদাবাদে তখন সরকারকে কিছু টাকা দিয়ে জেল থেকে মুক্তিলাভের জন্য জগমোহন ছোটভাই রামমোহনের কাছে চিঠি লেখেন। অনেক চিঠিপত্র লেখালেখির পরে সুদসমেত দেনা শোধ করবেন এই মর্মে ১৮০৫ সনের ১৩ই ফেব্রুয়ারী তারিখে জগমোহন তমসুক লিখে দেবার পরে রামমোহন বড়ভাইকে একহাজার টাকা ঋণ দেন সুদে। সেই টাকা সরকারি কোষাগারে জমা দিয়ে জগমোহন ১৮০৫ খৃষ্টাব্দের ১লা মার্চ জেল থেকে মুক্তি

লাভ করেন। বাকী খাজনার দায়ে রামমোহনের পিতা রামকান্ত রায়ও কারারুদ্ধ হয়েছিলেন (১৮০০ খৃ:)। 'বাবাকে ঋণমুক্ত করে কারামুক্ত করবার মত সঙ্গতি রামমোহনের নিশ্চয় তখন ছিল। কিন্তু রামমোহন এ বিষয়ে নিষ্ক্রিয় ছিলেন।" [রাজা রামমোহন : শ্রী ঋষি দাস, পৃ. ৩৬]

রামমোহনের চরিত্রের মূল্যায়নে ডঃ কুমুদ ভট্টাচার্য লিখেছেন : "অর্থাৎ ব্যক্তিগত ও শ্রেণীগত স্বার্থে রাজা রামমোহন ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর সঙ্গে মৈত্রী ভাবাপন্ন মনোভাব পোষণ করতেন।"

'রাজা' 'মহারাজা' 'বাবু' অর্থাৎ বৃটিশের স্তাবক ও দালালদের বাড়িতে ইংরেজদের নিমন্ত্রণ করে এনে মদ মাংস ও বেশ্যা বাঈজীদের আনিয়ে যে কীর্তি করা হোত, ঢাকা পড়ে গেলেও ইতিহাসের রক্ষাগারে মজুত রয়েছে তা। 'রাজা রামমোহনের বাড়ীতে, প্রিন্স দ্বারকানাথের বাগানবাড়ীতে, রাজা রাধাকান্ত দেবের গৃহে, মহারাজা সুখময় রায়ের বাড়ীতে, রাজা গোপীমোহন দেবের বাড়ীতে, বেনিয়ান বারানসী ঘোষের বাড়ীতে নাচ গান বাঈজী ও আতসবাজী পোড়ানোর বল্গাহীন, কুৎসিত আমোদ প্রমোদের পারস্পরিক প্রতিযোগিতা চলতো।' [বাংলার সামাজিক ইতিহাসের ধারা : ডঃ বিনয় ঘোষ, পৃ. ২৮]

"নর্তকীদের আনার জন্য পাল্কি পাঠিয়ে দেওয়া হোত। সঙ্গে যেত পাইক ও বরকন্দাজ। ... রাজাসাহেব এগিয়ে আসতেন খুশি উজ্জ্বল দুটো কামাতুর চোখ নিয়ে। মোসাহেবের দল অপরিসীম কৌতুহল নিয়ে পাল্কির রুদ্ধ দুয়ারের দিকে তাকাতেন। তারপর দরজা দুটো খুলে যেত। নর্তকী নামত, পরনে মসলিনের পেটিকোট ও ওড়না ও সমস্ত দেহ অলঙ্কারে মোড়া, ঠোঁটে উজ্জ্বল হাসি ঠিকরে পড়ত। রাজাসাহেব এগিয়ে আসতেন, বলতেন, 'এস বিবিজান'।" [ঐ, পৃ. ৯৩]

আমরা যাঁরা রামমোহনের প্রতি ভক্তি রাখি, মনে প্রশ্ন আসবে, তাহলে কি অন্য রাজা মহারাজাদের মত তাঁর যৌনদোষও ছিল? ইতিহাস কিন্তু পরিবেশন করে সে তথ্য— "বহুমূল্য ইওরোপীয় আসবাবপত্রে মানিকতলার বাড়িটি সুসজ্জিত করে রাজা রামমোহন কলকাতার জীবনযাত্রা শুরু করেছেন। কিন্তু হঠাৎ রাজাদের মত তাঁর বিলাস বৈভব পূর্ণ রাজসিক জীবনযাত্রা, উৎসব-ভোজে, বাঈজী-নাচে ও রক্ষিতা-পোষণে অজস্র অর্থ ব্যয় করার তৎকালীন সামন্ততান্ত্রিক ঐতিহ্য তিনিও বহন করে চলেছিলেন। এখানে উল্লেখযোগ্য যে, সমসাময়িককালে রাজা রামমোহন রায়ের এক যবনী রক্ষিতা ছিল। উমানন্দন ঠাকুরের এক প্রশ্নের উত্তরে রাজা রামমোহন রায় বলেছিলেন যে, ওরূপ যবনী রক্ষিতা শৈবমতে বিবাহিতা স্ত্রীর সামিল।" [দ্রষ্টব্য 'কলকাতার চালচিত্র : ডঃ অতুল সুর, পৃষ্ঠা ৪৪]

শ্রীমতী ফানি পার্কাস রামমোহনের বাড়িতে আয়োজিত ভোজসভায় আমন্ত্রিত হয়ে গিয়েছিলেন। তিনি যে বর্ননা দিয়েছেন তাতে প্রমাণ হয় যে, সারা ভারতবর্ষে তখন সবচেয়ে বড় বাঈজীর নাম ছিল নিকি। তাকেও বহু টাকা দিয়ে ভাড়া করে রামমোহন নিয়ে আসতেন নিজের, নিজেদের ও সাহেবদের মনোরঞ্জনের জন্য। [ডঃ কুমুদ ভট্টাচার্য : রাজা রামমোহন : বঙ্গদেশের অর্থনীতি ও সংস্কৃতি, পৃ. ৬৩]

রামমোহন রায় উৎকোচ বা ঘুষ খাওয়ার অভিযোগেও অভিযুক্ত। "কিশোরীচাঁদ মিত্রের মত সেকালের বিশ্বাসযোগ্য বিশিষ্ট ব্যক্তিরা প্রচলিত জনরবের প্রতি অঙ্গুলি সঙ্কেতে বলেছেন যে, সেকালে অন্যান্য বাঙালি দেওয়ানের মত রাজা রামমোহনও সরকারি কর্মে লিপ্ত থাকাকালীন উৎকোচ গ্রহণ করে আর্থিক সমৃদ্ধি ঘটিয়েছেন।" [ডঃ কুমুদ ভট্টাচার্য, পৃ. ৬৬]

ডঃ অরবিন্দ পোদ্দার বলেন, "এসব পদে অধিষ্ঠিত থাকার কালে সে সময়কার বল্গাহীন স্বর্ণমৃগয়ার দিনে বেশ কিছু উপরি পাওনার ব্যবস্থাও সমগ্র আর্থনীতিক কাঠামোতে জড়িয়ে ছিল। অনান্যদের মত তিনিও (রামমোহন) যদি এর সুযোগ গ্রহণ করে থাকেন তো বিস্ময়ের কারণ নেই।" [দ্রঃ রামমোহন উত্তর পক্ষ, পৃ. ১৩]

"তিনিই প্রথম দুই জীবন দুই কথার প্রবর্তক বাঙালী বুদ্ধিজীবী।" উদাহরণে বলা যায়, বহুবিবাহের বিরুদ্ধে মত প্রকাশ করে পুস্তিকা প্রকাশ করেছেন রামমোহন। আবার তিনিই বিধবা বিবাহ শাস্ত্রসিদ্ধ বলে মনে করতেন না। [তথ্য : নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় রচিত মহাত্মা রাজা রামমোহন রায়ের জীবন চরিত, পৃ. ৩৮৪]

সতীদাহ প্রথার জন্য তিনি বলেছেন, "এই নিষ্ঠুর প্রথার বিরুদ্ধে রামমোহনের পূর্ব থেকেই এদেশে যে আন্দোলন চলছিল তাতে অংশ গ্রহণ করে এবং প্রধান ভূমিকা নিয়ে রামমোহন অসম সাহসিকতার পরিচয় দিয়েছেন। সতীদাহ অবসানের জন্য তিনি সংবাদপত্রে লিখেছেন, দুই খন্ডে 'সহমরণ বিষয়ক প্রবর্ত্তক ও নিবর্ত্তকের সম্বাদ' নামক পুস্তিকা প্রকাশ করেছেন। গভর্নর জেনারেল লর্ড বেন্টিঙ্কের কাছে সতীদাহ প্রথার বিলুপ্তির দাবী জানিয়ে গণ দরখাস্ত পেশ করেছেন। কিন্তু আইনের দ্বারা সতীদাহ নিষিদ্ধকরণ সম্পর্কে লর্ড বেন্টিঙ্ক যখন রামমোহনের অভিমত জানতে চেয়েছেন, তখন রামমোহন আইনের দ্বারা এই নিষ্ঠুর প্রথা বন্ধ করার প্রস্তাবের বিরোধিতা করেছেন।" [দ্রঃ On Rammohan Roy: R.C.Majumder, p. 43]

বেদ বৈদান্তিক আধ্যাত্মিকতা এসব নিয়ে তিনি অনেক ভেবেছেন এবং লিখেছেনও অনেক কিছু। আবার তিনিই বলেছেন আধ্যাত্মিক জ্ঞান শিক্ষাকারী বা সমাজ কারও কোন ব্যবহারিক কাজে আসবে না। বৈদান্তিক তত্ত্ব তাদেরকে সমাজের উপযুক্ত সদস্য করে গড়ে তুলতেও সাহায্য করবে না। [তথ্য : ডঃ ভট্টাচার্য, পৃ. ৭৯]

রামমোহন ফরাসী বিপ্লবকে অভ্যর্থনা জানিয়ে গণতান্ত্রিক চিন্তার পরিচয় দিয়েছেন। স্পেনে রাজতন্ত্রের বিরুদ্ধে বিপ্লবীদের জয়ের সংবাদে উল্লসিত হয়ে ভোজসভা দিয়েছেন। ইতালির গণ-বিপ্লবের পরাজয়ে হতাশায় ভেঙে পড়ে শয্যাগ্রহণ করেছেন, "কিন্তু রাজা কখনও ভারতে ব্রিটিশ শাসন ও শোষণের বিরোধিতা করেন নি; কিংবা ভারতের জাতীয় স্বাধীনতাব দাবী উত্থাপন করেন নি। বাস্তবিক পক্ষে দেশের স্বাধীনতার প্রতি রামমোহনের অনুরাগ ভারতস্থিত বৃটিশ শাসনের কাছে আত্মসমর্পণের নামান্তর মাত্র। ... রামমোহন মনে করতেন ভারতবর্ষের আরও কিছুকাল ব্রিটিশ শাসনাধীনে থাকা দরকার যাতে ভারতবর্ষ ব্রিটিশ সরকারের কাছ থেকে আরও কিছু লাভ করতে পারে। ইংরেজ সরকারের প্রতি অবিচল আনুগত্য ও অসীম আস্থা প্রকাশ করে রাজা ও তার অনুরাগীরা মনে করেছেন যে, তাঁদের স্বার্থ এদেশে বৃটিশ শাসনের ন্যায় চিরস্থায়ী হবে।" [Arabinda Podder : Renaissance in Bengal, 1800-1860, p. 61-62]

যে সব তথ্য জানলে মানুষ শিউরে উঠবে সেরকম অনেক তত্ত্ব ও তথ্য লুকিয়ে রাখা হয় কিসের স্বার্থে তা অনুমান ও হিসেবের বিষয়। যেমন হয়ত রামমোহন বৃটিশ প্রভুদের আশ্বাস দিয়েছিলেন যে, সমস্ত ভারতবাসী বিশেষতঃ হিন্দু ভারতবাসীকে খৃষ্টান করে দেবার ব্যবস্থা করবেন তিনি, অদূর ভবিষ্যতে না হলেও সুদূর ভবিষ্যতে তো বটেই। এর প্রমাণে বলা যায়, যখন তাঁর সামনে এ প্রশ্ন আসে : "এদেশে যদি বৃটিশ শাসন চিরস্থায়ী না হয়, যদি ভারতের জনসাধারণ দাসত্ব শৃঙ্খল ভেঙে ফেলে তাহলে ইংরেজ প্রভুদের স্বার্থ কিভাবে সংরক্ষিত হবে? এই প্রশ্নের উত্তরে রাজা বলেছেন, ঘটনাক্রমে ভারতবর্ষ বৃটিশ অধীনতা থেকে মুক্ত হলেও তা হবে দুটি খৃষ্ট ধর্মাবলম্বী দেশের (অর্থাৎ বৃটেন ও ভারত) মধ্যে এবং তাতে বিশেষ সুবিধাজনক বাণিজ্যিক লেনদেনের সম্পর্ক অক্ষুন্ন থাকবে।" [ডঃ ভট্টাচার্য, ঐ, পৃ. ৮১]

লবণ বা নুন এমন একটি বস্তু যা ধনী গরীব সকলেরই প্রয়োজন। ভারতীয়রা চাহিদার সবটুকু লবণ নিজেরাই তৈরি করে নিতে পারতেন। বৃটিশ দরদী রামমোহন ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানিকে ইংলন্ড থেকে লবণ আমদানি করার পরামর্শ দেন। আর চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত করার বুদ্ধিটুকুও ইংরেজ সরকারের মাথায় তিনিই ঢুকিয়েছিলেন।

নবাব আলিবর্দী খাঁর আমলে একশো মণ লবণের মূল্য ছিল চল্লিশ থেকে ষাট টাকা। ১৭৭২ খৃষ্টাব্দে ওয়ারেন হেস্টিংস লবণের ব্যবসা নিজেদের হাতে নিয়ে আসেন। ১৭৭৩ খৃষ্টাব্দে একশো মণ লবণের দাম হয় একশো সত্তর টাকা। ১৭৭৮-তে হল একশো মণে ৩১২টাকা, ১৮০৩-এ সেটা দাঁড়ালো ৩৪২ টাকায়। বঙ্গদেশে লবণ তৈরির বৃহত্তর কেন্দ্র ছিল মেদিনীপুরের তমলুক ও হিজলী অঞ্চল। সরকারি আইনের পাকে পড়ে ৬০

হাজার গরীব লবণ শ্রমিক বেকার হয়ে গেলেন। তাঁরা প্রত্যেক বছর ২৮ লক্ষ মণ লবণ উৎপাদন করতেন। বহু বেকার লবণ শিল্পী অনাহারে পরিবার পরিজনসহ তিলে তিলে মারা গেছেন। সাহেবদের কমন্স কমিটি রামমোহনকে প্রশ্ন করেছিলেন যে, বিলেতি লবণ সস্তা দরে বাংলাদেশে আমদানি করা হলে লবণ শিল্পী মালঙ্গীরা ক্ষতিগ্রস্ত হবেন কিনা। উত্তরে রাজা যা বলেছিলেন তা বড়ই মারাত্মক— "মালঙ্গীদের এখনও অধিক সংখ্যায় সরকার কর্তৃক (যদি সরকারকে ভবিষ্যতে একচেটিয়া লবণ ব্যবসার অনুমতি দেওয়া হয়) লবণের কারখানায় অথবা সরকার কর্তৃক স্বীকৃত কিছু ব্যক্তিদের দ্বারা পরিচালিত লবণ শিল্পে নিযুক্ত করা যেতে পারে এবং অবশিষ্টদের কৃষি এবং বাগানের মালি, গৃহভৃত্য ও দিনমজুরের কাজে নিয়োগ করা যেতে পারে।" স্বাধীন ব্যবসার লবণ শিল্পীরা কিভাবে মালি হয়ে গৃহভৃত্য হয়ে সাহেব ও সাহেবদের দালালদের গোলাম ও শ্রমিকে পরিণত হবে তারজন্য কি চমৎকার পরামর্শ! তখন শ্রমিকদের কিভাবে মজুরী দেওয়া হোত তা রামমোহনের লেখা থেকেও পাওয়া যায়। সেটা এইরকম : শহরের দক্ষ কামার ও ছুতোরদের মাসিক বেতন ১২ টাকা, আর সাধাবণ কাজের লোক মাসিক ৬ টাকা, ভাল রাজমিস্ত্রী ৫ টাকা থেকে ৭ টাকা আর সাধারণ শ্রমিক সাড়ে তিন টাকা থেকে ৪ টাকা, মালি ও কৃষকেরা মাসে ৪ টাকা, পাল্কি বেহারারাও মাসে ৪টাকা। কিন্তু পাড়াগ্রামে মজুরী ছিল আরও কম। [দ্রঃ ঐ, পৃ. ১৬৯]

লবণ আমদানি করার পূর্বেও রামমোহনকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল যে, বিলেতি লবণ হিন্দুরা তাদের খাবারে ব্যবহার করবে কি না, কারণ খাদ্যের সঙ্গে ধর্মের সম্পর্ক আছে। রামমোহন উত্তরে যা বলেছিলেন তা সংক্ষেপে এই : "অল্পসংখ্যক পেশাদার ব্রাহ্মণ ছাড়া ভারতীয়রা তা খুব আনন্দের সঙ্গেই কিনবেন।" এবং যুক্তি দিয়ে সরকারকে তিনি বুঝিয়ে দিয়েছিলেন যে, ইউরোপের তৈরি করা সোডা ওয়াটার ভারতীয়রা ব্যবহার করছে। ইওরোপীয়দের তৈরি করা মদেরও "একটা উল্লেখযোগ্য অংশ তাঁরা ব্যবহার করে থাকেন।" [দ্রঃ ঐ, পৃ. ১৬৭]

রামমোহন যে শিক্ষিত বৃটিশ সহযোগী দলটি তৈরি করেছিলেন তার মধ্যে প্রথম সারির প্রথম নম্বর ব্যক্তি হচ্ছেন ঠাকুরবাড়ির প্রিন্স দ্বারকানাথ ঠাকুর। এঁরা ইংরেজদের এত অন্ধ অনুগত ভক্ত যে, রামমোহনের অন্যতম অনুরাগী প্রসন্নকুমার ঠাকুর বলেছেন, "ভগবান যদি আমাকে জিজ্ঞাসা করেন, তুমি স্বাধীনতা চাও,না ইংরেজের অধীন হয়ে থাকতে চাও, আমি মুক্ত কণ্ঠে ইংরেজের অধীনতাই বর বলে গ্রহণ করবো। [বাংলাদেশের ইতিহাস, তৃতীয় খন্ড : রমেশচন্দ্র মজুমদার, পৃ. ৪৯৯]

স্বদেশ প্রেমের বন্যা বইয়ে দিয়েছিলেন বলে তখনকার নেতাদের নামে জয়ঢাক বাজানো হয়, আর আমরা সাধারণ মানুষ তা তৃপ্তির সঙ্গে শুনি ও তা বিশ্বাস করি। কিন্তু "এটা

দুর্ভাগ্যজনক ঘটনা এবং আমরা লজ্জা ও দুঃখের সঙ্গে লিখছি যে, শিক্ষিত দেশীয় ব্যক্তিদের দ্বারা দেশের কল্যাণ জমিদারদের স্বার্থের সঙ্গে একীভূত হয়ে গিয়েছিল। ভূস্বামী শ্রেণীর অধিকার ও স্বার্থরক্ষার পক্ষে ওকালতি করার অপর নাম হল স্বদেশ প্রেম।" [দ্রঃ The Pesantry of Bengal, R.C.Dutt, p. 2]

মুসলমান রাজা বাদশাহ ও নবাব আমলে লেখাপড়া শেখার যে সব মক্তব মাদ্রাসা বা পাঠাগার ছিল তাতে রাষ্ট্রভাষা হিসাবে ফার্সী, ধর্মভাষা হিসাবে কোরআন শেখার উপযোগী আরবী, মাতৃভাষা, অঙ্ক প্রভৃতি শেখানোর ব্যবস্থা ছিল। সেগুলো কিন্তু মুসলমান, হরিজন সকলের জন্যই ছিল অবারিত। "গ্রাম্য পাঠশালায় বা মক্তবে যেসব ছাত্র লেখাপড়া শিখতে আসতো তারা সাধারণতঃ স্বল্পবিত্ত জমিদার ব্যবসায়ী এবং অবস্থাপন্ন চাষী ঘরের ছেলে ছিল। অবশ্য নিম্ন স্তরের নমঃশূদ্র ধোপা বাগদী ইত্যাদি শ্রেণীর ছেলেদেরও এসব বিদ্যালয়ে লেখাপড়া শেখার সুযোগ ছিল এবং সেজন্য বিশেষ কোন বাধা ছিল না।"

"টোলে এবং মাদ্রাসায় ঐসব ভাষার মাধ্যমে সাহিত্য, ন্যায়, দর্শন, স্মৃতি, মীমাংসা, জ্যোতিষ, ব্যাকরণ ইত্যাদি শাস্ত্রে উচ্চশিক্ষা দান করা হোত। তবে টোল-চতুষ্পাঠীর শিক্ষা গ্রহণের অধিকারী ছিল একমাত্র ব্রাহ্মণ সন্তানেরা। সংস্কৃত শাস্ত্রচর্চা একান্তভাবেই ব্রাহ্মণদের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। এখানে অব্রাহ্মণদের কোন প্রবেশাধিকার ছিল না।" [দ্রঃ ঐ, ডঃ ভট্টাচার্য, পৃ. ৯১]

অপ্রকাশিত সত্য এটাই, বৃটিশ আসার পর আর্যতত্ত্ব, বেদতত্ত্ব, প্রাচীনতত্ত্ব, পুঁথি দোঁহা প্রভৃতির বেশির ভাগই সংস্থাপিত হয়েছে ইংরেজের অঙ্গুলিহেলনে। টোল চতুষ্পাঠী প্রভৃতি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ব্যাপকভাবে বরাবর ছিল এ তথ্য অসত্য। কারণ মুসলিম যুগে প্রত্যেক বিদ্যালয়ে প্রবেশ যখন অবারিত ছিল তখন নিশ্চয় ঐসব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজন ছিল না। তাছাড়া এখনকার মত তখন মানুষ লেখাপড়ার এত গুরুত্ব জানতেন না বা বুঝতেন না। কিন্তু ইংরেজ আমলে শুধু নদীয়াতেই টোলের সংখ্যা ছিল পঁচিশ। তাছাড়া মিথিলা, বিক্রমপুর, বারানসী প্রভৃতিতেও তা সৃষ্টি হয়েছিল। বিদেশীরা টোলগুলোকে হিন্দুদের অক্সফোর্ডরূপে অভিহিত করেছেন।

রামমোহন ও তার সৃষ্ট ইংরেজ-অনুগত ও অনুসারীরা ইংরাজি ভাষাকেই শিক্ষার মাধ্যম হিসাবে ব্যবহার করতে পরামর্শ দিয়েছিলেন। তাছাড়া গোটা দেশকে খৃষ্টান দেশ করতে হলে ইংরাজি ভাষার তো সত্যিই দরকার ছিল! [ক] "রাজা রামমোহন ছিলেন ভারতের বৃটিশ শাসনের একনিষ্ঠ সমর্থক।" [খ] "ইংরেজ সরকারের প্রতি তিনি অবিচলিত আনুগত্য ও অসীম আস্থা প্রকাশ করে বলেছেন, এদেশে বৃটিশ শাসনের ন্যায় তাঁদের আনুগত্যও চিরস্থায়ী হবে।" [গ] তিনি আরও বলেছেন, "তাঁদের পরম সৌভাগ্য

যে, তাঁরা পরমেশ্বরের করুণায় সমগ্র ইংরেজ জাতির রক্ষাবেক্ষণে রয়েছেন এবং ইংলন্ডের রাজা, তাঁর লর্ডগণ ও কমন্স-সভা তাঁদের জন্য আইন প্রণয়নের কর্তা।" [B.B.Majumder, K.D.Nag এবং D.Burman-এর লেখা থেকে উদ্ধৃত]

রামমোহন দেশের তখনকার শিক্ষিত মানুষদেরকে ইংরেজ সরকারের অনুগত করতে সরকারের সহায়ক হয়ে তিনটি পত্রিকা পরিচালনা করতেন। একটি 'ব্রাহ্মনিকাল ম্যাগাজিন' দ্বিতীয়টি 'ব্রাহ্মণ সেবধি' আর একটি 'সম্বাদ কৌমুদী'। ফার্সী জানা পাঠকদের জন্য ফার্সী ভাষার কাগজটি ছিল 'মিরআতুল আখবার' যার অর্থ সম্বাদ দর্পণ।

১৮২২-এ রামমোহন নিজে একটি ইংরেজি স্কুলের প্রতিষ্ঠা করেন। স্কুলের 'এ্যাংলো হিন্দুস্কুল' নামেই তাঁর মানসিকতার ইঙ্গিত মেলে। তাছাড়া রামমোহন রেভাঃ আলেকজান্ডার ডাফ্‌কে দিয়ে জেনারেল এসেম্বলী ইনস্টিটিউশন নামে স্কুল তৈরি করিয়েছেন। ঐসব স্কুলে বিত্তবান জমিদার ও মধ্যবিত্ত শ্রেণী ও উচ্চহিন্দু ছাড়া অনুন্নত হরিজনদের শিক্ষালাভের কোন অবকাশই ছিলনা; আর মুসলমান তো সেখানে কল্পনার বাইরে। "ফলে রায়ত কৃষকের সন্তানেরা পাশ্চাত্য শিক্ষার আলো থেকে বঞ্চিত হলেন, তাঁরা রয়ে গেলেন চির অন্ধকারে।" পরে তিনটি দল তৈরি হয়। সাহেবদের একদল চান মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষা, আর একটি দল চান ধর্মীয় ভাষায় শিক্ষা, অপর দলের ইচ্ছা সব ভাষার মাথা খেয়ে শুধু ইংরাজিতেই শিক্ষাদান। ইংরাজি ভাষার দলে ছিলেন উইলিয়াম বেন্টিঙ্ক, মিঃ মেকলে প্রভৃতি খৃষ্টান মিশনারীদের একটি অংশ আর ভারতীয়দের মধ্যে ছিলেন রাজা রামমোহন, প্রিন্স দ্বারকানাথ, রাজা রাধাকান্তদেব, ভবানীচরণ প্রমুখ।

ভারতের মানুষকে সত্যের আলো দেখানো, অনুন্নতকে উন্নত করা, অপাংক্তেয়কে বুকে টেনে নেবার আন্তরিকতার অভাব রামমোহনদের ছিল মনে করে ডঃ বিনয় ঘোষ লিখেছেন, "কিন্তু সর্বসাধারণের প্রাথমিক শিক্ষার কথা কেউ ভাবতে পারেন নি। ধর্ম প্রচারই বা কত দূর দূরান্তগামী ছিল? রামমোহন এমনকি মহর্ষিও তাঁদের পাল্কিবেহারাকে 'ব্রাহ্ম সমাজে' নেবার বা ব্রাহ্ম করার কথা ভাবতেন কি? তাদের ছেলেদের লেখাপড়া শেখানোর কথা ভাববার প্রশ্নই ওঠেনা।" [দ্রঃ বাংলার নবজাগৃতি : ডঃ বিনয় ঘোষ, পৃ. ৫৬৪]

রামমোহনের বৃটিশ আনুগত্য সীমা পার হয়ে উপছে গিয়েছিল। বৃটিশের অত্যাচারে ১৮০০ থেকে ১৮৫০-এর মধ্যে পরপর সাতটি দুর্ভিক্ষ হয়। আর তাতে ভারতীয় মারা গিয়েছিল ১৫ লাখ। ১৮৫০ থেকে ১৯০০ খৃষ্টাব্দের মধ্যে দুর্ভিক্ষ হয় মোট ২৪ টি। তাতে মানুষ মারা গিয়েছিল ২ কোটি। এইসব কথা জেনে নিষ্ঠুর মানুষের মনও নমনীয় হয়ে ওঠে। এমনকি রামমোহনের সাহেব বন্ধু ডঃ মন্টোগোমেরি মনে করতেন যে,

বৃটিশ শাসনের চেয়ে মুসলমান শাসন অনেক ভাল ছিল। তিনি হাত হিসাব করেছিলেন যে, মুসলমান শাসকেরা তাঁদের মত ভারত থেকে কিছু নিয়ে চলে যাননি, সব রেখে গেছেন ভারতে, সেইসঙ্গে তাঁদের দেহও মিশিয়ে দিয়েছিলেন এ দেশের মাটিতেই। তাই তিনি বলেছিলেন, "আমাদের সরকার তো নামেমাত্র খৃষ্টান, কার্যত এ সরকার মুসলমান সরকারের চেয়ে নিকৃষ্ট, ...আমরা লক্ষ লক্ষ টাকা ভারত থেকে শোষণ করি, বিনিময়ে আমরা কী দিই তাদের? দুর্ভিক্ষ আর মহামারী, মহামারী আর দুর্ভিক্ষ। হাজার হাজার গলিত পচিত শব ভেসে যায় নদীতে, দূষিত বাষ্পে বাতাস বিষাক্ত, জলপান করলে বমি পায়, ৪০ হাজার বর্গমাইল অঞ্চলের লোকজন উজাড়।" [কৃষ্ণ কৃপালিনীঃ দ্বারকানাথ ঠাকুর; বিস্মৃত পথিকৃৎ, পৃ. ৫০]

শোষকদের নিজেদের ব্যক্তিগত সুখ সুবিধার স্বার্থে বৃটিশের এত অন্ধভক্তের পরিচয় দিয়েছেন রামমোহন ও তার অনুসারীরা যা জানলে চমকে উঠতে হবে সব চরিত্রবান মানুষকে। মোগল সম্রাটের আমলে ১৭৬৪-'৬৫ সালে অবিভক্ত বঙ্গদেশে ট্যাক্স বা করের পরিমাণ ছিল ১ কোটি ২৩ লাখ টাকা। কিন্তু ১৭৬৬ খৃষ্টাব্দে ইংরেজ সরকার কর আদায় করে ২ কোটি ২০ লাখ টাকা। আর ১৭৯৩-এ রামমোহনদের পরামর্শে যখন চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের প্রচলন হোল তখন কর আদায়ের পরিমাণ দাড়ালো ৪ কোটি ২ লাখ টাকা। [দ্রঃ ভারতের কৃষক বিদ্রোহ ও গণতান্ত্রিক সংগ্রাম (প্রথম খন্ড) পৃ. ১২ এবং ১৬]

রামমোহন ও প্রিন্স প্রমুখের পরামর্শ ছাড়া বৃটিশের কোন নতুন পদক্ষেপ নেওয়া ঐ সময় সহজে সম্ভব ছিলনা। চাষ করা চাষী, যাঁরা ছিলেন জমির মালিক তাঁরাই সরকারের আইনে হয়ে গেলেন ভূমিহীন এবং নতুন জমিদারদের ভৃত্যপ্রায়।

১৭৯৯ খৃষ্টাব্দে যে আইন তৈরি করে প্রয়োগ করা হোল তার নমুনা : [ক] জমিদার সরকারি অনুমতি ছাড়াই প্রজাকে বন্দি করতে পারবে। [খ] জমিদার খাজনা আদায় করতে সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করতে পারবে কিন্তু প্রজা আদালতে মামলা করতে পারবেনা। [গ] বাকী খাজনা আদায়ের জন্য তাকে তার বাসভিটে থেকে জমিদার উৎখাত করতে পারবে। [ঘ] জমিদার প্রজাকে কাছারীতে ডেকে আনতে বাধ্য করতে পারবে। [ঙ] জমিদারের দৈহিক নির্যাতনের কারণে প্রজা কোন ফৌজদারি মামলা করতে পারবেনা।

ঐ সময়ে মুসলমান বুদ্ধিজীবী ও নেতাদের অস্তিত্ব না থাকলেও বাবু সমাজ, রাজা, মহারাজা, রায়বাহাদুর, জমিদার, স্বামীজী, বাবাজী, গুরুজী, ঋষি, মহাঋষি কেউ এই অত্যাচারের বিরুদ্ধে এগিয়ে এলেন না কেন সে প্রশ্ন থেকেই যায়।

আর একটি অসৎ ব্যবসার বাজার তখন খুবই রমরমা। সেটা হোল দাস ব্যবসা। ওটিকে মোটামুটি আড়াল করে রেখে দিয়েছেন অনেক কলমনবীশ ও ঐতিহাসিকেরা।

কলকাতায় দাসদাসী কেনার বড় হাটে প্রকাশ্য স্থানে শেকলে বাঁধা দাসদাসীদের ব্যবসার পণ্য হিসাবে আনা হোত। অনেক বাবু রাজা মহারাজারা গোলাম বাঁদী কিনে সাহেবদের উপহার দিতেন। অনেক ক্রীতদাসকে পালিয়ে যাওয়ার ভয়ে রাত্রে বন্দি করে রাখা হোত। "অনেক ক্রীতদাসকে খাঁচায় রাত্রিযাপন করতে হোত। সামান্যতম ত্রুটি বিচ্যুতিতে চাবুক দিয়ে তাদের প্রহার করা হোত। তাদের কোন রকমের স্বাধীনতা ছিল না। দাস মালিকদের মৃত্যু হলে তার উত্তরাধিকারী সম্পত্তির সঙ্গে গোলামদেরও মালিক হতেন।" [পৃ. ১৭৫, ঐ, ভট্টাচার্য]

তখনকার ক্রীতদাস-দাসীদের বাজার মূল্য ছিল এই রকম। কিশোর ও যুবকের দাম ছিল ২৪ থেকে ১৬০ টাকা। কিশোরী ও যুবতীদের দাম ছিল ১৬ টাকা থেকে ২৪ টাকা মাত্র। আর বালকদের দর ছিল ৪ টাকা থেকে ১৫ টাকা। হাটে গরু মোষ কিনে যেমন নথিভুক্ত করার নিয়ম চালু আছে ঠিক তেমনিভাবে কোর্ট হাউসে জন প্রতি চার টাকা চার আনা ডিউটি দিয়ে গোলামদের রেজিস্ট্রি করার ব্যবস্থা করা হয়েছিল। তখনকার খবরের কাগজে পালিয়ে যাওয়া দাসদাসীদের বিজ্ঞাপন দেওয়া হোত। যেমন একটি উদাহারণে বলা যায়, "গত ২রা জুলাই ১৯৭২ থেকে দিনদারা নামে ১৫ বছরের একটি দাস ছেলে বাড়ী থেকে পালিয়ে গেছে। তার পিঠে ও হাতে অনেকগুলি আগুনে পোড়ার দাগ আছে। পায়ে আছে একটি লোহার বেড়ি। যদি বেড়িটা সে খুলেও ফেলে দেয় তাহলেও তার পায়ে একটা গোলাকার কালো দাগ থাকবে। ... যদি কোন ব্যক্তি তাকে ধরতে পারেন এবং ১ নম্বর লারকিন্স লেনে মালিকের কাছে পৌঁছে দেন, তাহলে তিনি পঞ্চাশ টাকা পুরস্কার পাবেন।"

কিশোরী ও মহিলাদের প্রতি যে অত্যাচার করা হোত তা অত্যন্ত নোংরা কুৎসিত ও ভয়াবহ। সুপ্রীম কোর্টের প্রধান বিচারপতি "দাস বাণিজ্য সম্পর্কে একটি মামলার রায় দিতে গিয়ে ১৭৮৫ সালে স্যার জোন্স বলেছিলেন, আমাদের এখানকার গোলামদের দুরবস্থার কথা আমি কিছু কিছু জানি, এবং তা এতো মর্মান্তিক যে বলতে সংকোচ হয়। গোলামদের উপর প্রতিদিন এমন নিষ্ঠুর অত্যাচার করা হয় বিশেষ করে বালক ও স্ত্রীলোকদের উপর, যে মর্যাদার দিক থেকে আমি তার কোন দৃষ্টান্ত উল্লেখ করতে রাজি নই। ... এই বিরাট জনবহুল কলকাতা শহরে এমন একজনও পুরুষ বা স্ত্রীলোক নেই যার অন্ততঃ একটি গোলাম ছেলে বা মেয়ে নেই। তিনি খুব সামান্য মূল্যেই গোলামটি কিনেছেন এবং খোঁজ করলে দেখা যাবে হয়তো অন্নাভাবের কষ্ট থেকে মুক্তি পাবার জন্য এই যাবজ্জীবন দুঃখের বোঝা গোলামটি অনিচ্ছায় বরণ করে নিয়েছে অনেকেই জানেন নিশ্চয় যে, নদীর উপর দিয়ে নৌকা বোঝাই গোলাম

আসা হয় কলকাতার বাজারে বিক্রি করার জন্য। আপনারা এও জানেন যে, এইসব গোলাম ছেলে মেয়েদের অধিকাংশই তাদের বাপ-মার কাছ থেকে চুরি করে আনা হয় অথবা দুর্ভিক্ষের সময় তাদের গোলামির জন্য সামান্য মূল্যে বেচে দেওয়া হয়।" [ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের লেখা 'সংবাদপত্রে সেকালের কথা' দ্রষ্টব্য পৃ. ৫৪৫]

মুসলমান আমল থেকে ইংরেজ আমল পর্যন্ত কিছু নিষ্কর জমি ছিল, যার কোন খাজনা লাগতো না। ইংরেজ সরকার যখন কর নির্ধারণ করেন তখন রামমোহন নিজের এবং সমস্ত জমিদার বা শোষকদের স্বার্থে দলবেঁধে স্বপক্ষ ও বিপক্ষ অর্থাৎ 'আত্মীয়সভা' ও 'ধর্মসভা' সকলে একত্রিত হয়ে ভারতে এবং বিলেতে দরখাস্ত ও প্রতিবাদ করে সরকারকে কাঁপিয়ে দিয়েছেন। কিন্তু এই ক্রীতদাস ও ক্রীতদাসীদের পক্ষে আমাদের নেতাদের টুঁ শব্দও পাওয়া যায় নি। তার অন্যতম কারণ এটাও হতে পারে যে, ক্রীতদাস দাসীরা কোন দিন রাজা মহারাজা বাবু শ্রেণীদের টাকার অঙ্ক বৃদ্ধি করতে পারবে না আর কৃতজ্ঞতা জানিয়ে ইতিহাস সৃষ্টি করতেও পারবে না। আর একটি কথা হল, এই লক্ষ লক্ষ সুবিধাভোগী অনুরাগী ও অনুসারীদের অসুবিধায় পড়তে হতো ঐ ব্যবস্থার প্রতিবাদ বা উচ্ছেদ হলে। একথা সত্য যে, প্রাচীন কাল থেকে পৃথিবীতে এই দাস প্রথা প্রচলিত। যীশু, মুসা [আ] হযরত মুহম্মাদ [স] প্রভৃতি প্রত্যেক নবী এবং আম্বিয়াগণ দাসদের সম্পর্কে অনেক আদেশ উপদেশ দিয়ে গেছেন দ্ব্যর্থহীন ভাষায়। ইতিহাসের পাতা থেকে উদাহরণ দেওয়া যায় যে, মুসলিম আমলে রাজা বাদশা বা সুলতানেরা প্রথাগতভাবে দাস কিনতেন। কিন্তু হযরত মুহম্মাদের [স] শিক্ষার ছোঁয়ায় তাদের সাথে ভাল ব্যবহার করতেন তাঁরা। স্নেহ আদর ও যত্ন দিয়ে লেখাপড়া শেখাতেন। এটা এই জন্যই সম্ভব হোত যে, দাসদাসীদের পশু মনে না করে মানুষ মনে করতেন তাঁরা। তাই দাসকে বড় করে যোগ্য করে নিজের মেয়ের সঙ্গে বিবাহ দিয়ে সিংহাসনে বসিয়ে দেওয়া ইসলাম ধর্মাবলম্বীদের পক্ষে সম্ভব হয়েছে। ভারতের দাস বংশ তার স্বর্ণোজ্জ্বল দৃষ্টান্ত।

হুগলী জেলার খানাকুল থানার রাধানগর গ্রামে জন্মেছিলেন তিনি। তাঁর আগের তিন পুরুষ মুসলমান নবাবদের কৃপাধন্য কর্মচারি ছিলেন। তাঁর প্রপিতামহ কৃষ্ণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ও নবাবদের আমলে দক্ষ কর্মচারি হিসাবে 'রায়-রায়ান' উপাধিপ্রাপ্ত ব্যক্তি। পিতামহ বজ্রবিনোদ ছিলেন দিল্লীর সম্রাট শাহ আলমের অধীনে নবাব কর্মচারি। রামমোহনের পিতা রামকান্ত রায়ও মুর্শিদাবাদের নবাবের কর্মচারি ছিলেন। রামমোহনের পিতার কিছুদিন অভাব অনটন চললেও ইংরেজ সরকারের সুনজরে পড়ে গিয়ে ১৭৯১ খৃষ্টাব্দে কোম্পানির কাছ থেকে ভুরসুট পরগণার ইজারা পেয়েছিলেন ন' বছরের জন্য। কিন্তু রামমোহনের উন্নতি হয়েছিল নাকি অবনতি, তার মূল্যায়ণ করবেন সত্যানুসন্ধিৎসু পাঠকবর্গ।

অসাধারণ দ্বারকানাথ

রবীন্দ্রনাথের পিতামহ বা ঠাকুর্দা হলেন দ্বারকানাথ ঠাকুর। এঁদের পূর্বপুরুষ এত দরিদ্র ছিলেন যে, দারিদ্রের কারণে ভাগ্যান্বেষণে একসময় বাড়ি ছেড়ে চলে যেতে হয়েছিল অন্যত্র। এই ঠাকুরবাড়ি সম্বন্ধে বিশেষ আলোচনার প্রয়োজন আছে। তাই রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং ঠাকুরবাড়ির অন্যান্যদেরও আলোচনা আনা হচ্ছে এর পরেই। এই ঠাকুরবাড়ির মাধ্যমে ভারতবর্ষের হয়েছে মহাকল্যাণ অথবা মহাসর্বনাশ।

দ্বারকানাথ ঠাকুর

দ্বারকানাথ ঠাকুর সম্বন্ধে এ কথাটা মনে রাখা ভাল যে, রামমোহন রায়ের সঙ্গে তাঁর ইংরেজ তোষণ, জমিদারি পরিচর্যা, মদ মাংস বিলাসিতা স্ফূর্তি, স্বধর্ম ত্যাগ করে অন্য ধর্ম অবলম্বন ইত্যাদি বিষয়ে মিল ছিল। তবে একটা বিষয়ে মৌলিক পার্থক্য হোল, রামমোহনের অনুসারী ছিলেন দ্বারকানাথ, দ্বারকানাথের অনুসারী ছিলেন না রামমোহন।

হিন্দু সাহিত্য সংস্কৃতি আর্যতত্ত্ব প্রভৃতি বিষয়ে বৃটিশের সঙ্গে সহযোগিতা করতেন প্রিন্স। প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে রামমোহনের কাজ ও চিন্তাধারার সঙ্গে সহমত পোষণ করতেন তিনি। রামমোহন এবং প্রিন্স দুজনেই তাঁদের প্রাণপ্রিয় স্থান লন্ডনেই মারা যান। দুজনেরই লন্ডনে সমাধি আছে।

প্রিন্স দ্বারকানাথ বিলেত যাবার পূর্বাহ্নে অনেক ভূস্বামী ও জমিদারদের দেওয়া মানপত্রের উত্তরে বলেছিলেন যে, "সমস্ত পৃথিবীর কাছে তা প্রমাণ করেছে যে, অন্তরানুভূতি ও স্বার্থের দিক দিয়ে ইংলন্ড এবং ভারতবর্ষের ভূস্বামীরা অতি নিকট সম্পর্কে সম্পর্কিত।" [কিশোরীচাঁদ মিত্র : 'দ্বারকানাথ ঠাকুর'-এর দ্বিজেন্দ্রলাল কর্তৃক অনুবাদ, পৃ. ১২১]

১৮৪২ খৃষ্টাব্দের ২৯শে জুলাই লন্ডনের লর্ড মেয়র ম্যানসন হাউসে এক ভোজসভায় দ্বারকানাথকে আপ্যায়ন করেন এবং কিছু কথা বলতে অনুমতি পেয়ে দ্বারকানাথ সকলের সম্মুখে বক্তব্য রাখলেন—"এই ইংলন্ডই পাঠিয়েছিল ক্লাইভ ও কর্ণওয়ালিসকে বাহুবলে ও বুদ্ধিবলে ভারতের উপকার সাধন করার জন্য। এই ইংলন্ডই সেই সুদূরবর্তী দেশে এমন একজন মহান লোককে পাঠিয়েছিল যিনি পৃথিবীতে শান্তি সংস্থাপন করতে

পেরেছিলেন, যিনি সর্বপ্রথম সেই প্রাচ্যভূমিতে যথাযথ ও চিরস্থায়ী শৃঙ্খলার অবতারণা করতে পেরেছিলেন। এ হোল সেই দেশ, সমবেত সজ্জনেরা যার প্রতিনিধি স্থানীয়, যে দেশ মানবিক মর্যাদার সম্মানে দুবৃত্ত মুসলমানদের যথেচ্ছাচার থেকে তথা রুশীয়দের সন্ত্রাসজনক নিষ্ঠুরতা থেকে তাঁর দেশকে রক্ষা করেছে (উচ্চ হর্ষধ্বনি)। এবং ইংলন্ড এই সব কিছুই করেছে কোন প্রপ্তির আশা না করেই, বিনিময়ে কিছু লাভ করবে বলে নয়। পরন্তু নিছক উপচিকীর্ষার মনোভাব নিয়ে। তাঁর দেশবাসীর পক্ষে ইংলন্ডের প্রতি অকৃতজ্ঞ হওয়া অসম্ভব।..." [কৃষ্ণ কৃপালিনীঃ দ্বারকানাথ ঠাকুর : বিস্মৃত পথিকৃৎ, পৃ. ১৯৮]

প্রিন্স ঠাকুর আরও বলেছেন, "ভারতের সুখসমৃদ্ধি বজায় রাখার সর্বোৎকৃষ্ট উপায় হোল, আপনাদের মহান ও যশোমন্ডিত দেশের সঙ্গে যুক্ত থাকা ...। বিধাতার বিধানে যে লক্ষ লক্ষ লোকের কল্যাণ ও উন্নতি সাধনের দায় আপনাদের উপর বর্তেছে, সে দায়িত্ব পালনে আপনাদের সহৃদয় ব্যাকুলতা সমগ্র পৃথিবীর মুগ্ধ প্রশংসা অর্জনের দাবী রাখে।" [দ্রঃ ঐ, পৃ. ২১৭]

নীলকর সাহেবরা অত্যন্ত জোর ও প্রচন্ড জুলুম করে চাষীদের ধান চাষ বন্ধ করিয়ে নীল চাষ করাতো। এবং নীল চাষ করতে রাজী না হলে তাদের চাবুক মারা, গরু আটকে রাখা, মহিলাদের উপর অত্যাচার, তাদের ঘর ভেঙে এবং আগুন লাগিয়ে দেওয়া প্রভৃতি করে মিথ্যা মোকদ্দমা করে এমন পরিস্থিতির সৃষ্টি করতো যে অশ্রুপ্লুত নয়নে মনের বিরুদ্ধে দাদন অর্থাৎ চাষের জন্য অগ্রিম ঋণ নিয়ে টিপসই দিতে বাধ্য হোত। ডঃ কুমুদ ভট্টাচার্য লিখেছেন, "নীলযুগের ইতিহাসের পাতা খুললে দেখা যায়, উৎকট মুনাফা লালসায় উন্মত্ত নীলকর দানবদের নির্মম উল্লাস আর শোনা যায় অসহায় নীলচাষীদের মৃত্যুকাতর আর্তনাদ। কোথাও নীলকরদের সদর্থক চরিত্রের পরিচয় পাওয়া যায়না। সেকালের সংবাদপত্রগুলি তার সাক্ষী।"

নীলকর বেইমান সাহেবরা লালসা সামলাতে না পেরে যেমন একটির পর একটি নীল কারখানা বাড়িয়ে তুলেছিল সেখানে ঠাকুরবাড়ির প্রিন্স দ্বারকানাথও অনেকগুলো নীলের কারখানা স্থাপন করেছিলেন। সারা দেশ যখন নীলকর ব্যবসায়ীদের অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে তাদের নিন্দা করতে লাগলো, তখন ১৮২৮ খৃষ্টাব্দের ২৬শে ফেব্রুয়ারি 'সম্বাদ কৌমুদী' পত্রিকায় তিনি লিখলেন, "এদেশে যাঁর ভূসম্পত্তি আছে এবং যিনি নিজে তাঁর জমিদারি দেখাশোনা করেন তাঁরই কাছে একথা সুবিদিত যে, নীল চাষের জন্য কি বিরাট পরিমাণ পতিত জমিতে আবাদ হয়েছে এবং নীল চাষের মালিকরা যে দেশ জুড়ে টাকা ছড়াচ্ছেন তাতে দেশের নিম্ন শ্রেণীরা কেমন স্বচ্ছন্দে দিনপাত করছে। আগেকার

দিনে যেসব চাষী জমিদারের জবরদস্তিতে বিনামূল্যে বা অল্পপরিমাণ ধানের বিনিময়ে কাজ করতে বাধ্য হোত তারা এখন নীলকরদের আওতায় খানিকটা স্বাধীনতা ও স্বাচ্ছল্য ভোগ করছে। তারা প্রত্যেকেই নীলকরদের কাছ থেকে মাসিক চারটাকা বেতন পাচ্ছে এবং অনেক মধ্যবিত্ত যারা নিজেকে ও পরিবারকে প্রতিপালন করতে পারতো না তারা নীলকরদের দ্বারা উঁচু বেতনে সরকার প্রভৃতি পদে নিযুক্ত হচ্ছে। এখন তারা জমিদারের বা বেনিয়ার খামখেয়ালি ও মর্জি দ্বারা নির্যাতিত হয়না।" [দ্রঃ সৌমেন্দ্রনাথ ঠাকুর : ভারতের শিল্প বিপ্লব ও রামমোহন, পৃ. ১৯]

১৮২৪ খৃষ্টাব্দে লুন্ঠনকারী বৃটিশদের যেখানে ২৭১টি নীল কারখানা ছিল সেখানে প্রিন্সের তো দেশীয় কালো সাহেবদেরও ছিল ১৪০টি নীল কারখানা। [তথ্য : প্রমোদ সেনগুপ্ত : নীলবিদ্রোহ ও বাঙালী সমাজ, পৃ. ৬]

১৮২৯ খৃষ্টাব্দের ১৭ই মার্চ বেঙ্গল হরকরা পত্রিকায় ঠাকুরবাড়ির প্রিন্স লিখলেন একটি বক্তব্য। উইলিয়াম বেন্টিঙ্ক ১৮২৯-এ লন্ডনে কোর্ট অব ডিরেক্টরসকে একটি রিপোর্ট পাঠাতে বলেন প্রিন্সকে। তখন প্রিন্স ঐ বছরের ৩০শে মে যে রিপোর্টটি পাঠালেন তাতে লেখা ছিল, "আমি এই স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছি যে, নীলকরেরা যে উপকার চারিদিকে বিস্তার করেছে তার তুলনায় তাদের ক্বদাচিৎ দুর্ব্যবহার ধর্তব্যের মধ্যেই নয়। কৃষি ব্যাপারে জেলাগুলির যা উন্নতি সাধিত হয়েছে তার বেশিরভাগই সেখানকার নীলকরদের দ্বারা সাধিত হয়েছে। সাধারণভাবে একথা সত্য বলে বলা যেতে পারে যে, প্রত্যেক নীল কারখানা উন্নতির কেন্দ্র। যে লোক নীলের কারখানায় কাজ করে তাদেরও আশেপাশের লোকদের উন্নতি সাধন করে নীলের কারখানা।" [দ্রঃ সৌমেন্দ্রনাথ ঠাকুরের ঐ বই, পৃ. ৬৮-৬৯]

১৮২৯-এর ১৫ই ডিসেম্বরে টাউন হলের সভায় দ্বারকানাথ বললেন, "আমি দেখেছি, নীলের চাষ ও ইওরোপীয়দের বসবাস দেশের ও দেশের সমস্ত শ্রেণীর লোকের প্রভূত উপকার সাধন করেছে। জমিদারেরা ধনী হয়েছেন ও উন্নতি করেছেন চাষীদের অবস্থাও অনেক উন্নত হয়েছে। যেসব জায়গায় নীলের চাষ নেই ও নীলের কারখানা নেই সেইসব জায়গার অধিবাসীদের চেয়ে তাদের অবস্থা অনেক ভাল হয়েছে। নীলের চাষ যেখানে হচ্ছে তার কাছাকাছি জায়গায় জমির দাম বেড়ে গেছে ও চাষবাসেরও খুব দ্রুত উন্নতি হয়েছে।" [দ্রঃ ঐ, পৃ. ৭৮]

ইয়ং বেঙ্গলের আলোকপ্রাপ্ত শিক্ষিত তরুণদের পক্ষে এইসব লেখা ও কথা বরদাস্ত করা কঠিন হয়ে পড়ছিল, তাই তাঁরা 'ইন্ডিয়া গেজেট' পত্রিকায় ১৮৩০-এর ১২ই ফেব্রুয়ারি এইসব জনদরদী নেতার মুখোশ খুলে দিয়ে লিখেছিলেন, "ইওরোপীয়গণ ভারতে আসিয়াই

এদেশের লোকের দুঃখে ব্যথিত হইয়া তৎক্ষণাৎ তাহার প্রতিকার করিতে বদ্ধপরিকর হইলেন। নানাজাতীয় মদ্য-রাম-জিন-ব্রান্ডি ও আধুনিক সভ্যতার অনুরূপ অন্যান্য উপকরণ আমদানি করিয়া কিরূপ অল্পসময়ের মধ্যে তাঁহারা এই বর্বর জাতিকে সভ্য করিয়া তুলিয়াছেন তাহা ভাবিলে বিস্মিত হইতে হয়।" [বাংলাদেশের ইতিহাস, তৃতীয় খন্ড, রমেশচন্দ্র মজুমদার, পৃ. ১৩৭]

প্রিন্স যা-ই বলুন না কেন, প্রিন্সের কথা আর একটু যাচাই করতে সরকার রামমোহনের মন্তব্য জানতে চাইলে রামমোহন বললেন, "...আমি দেখেছি যে, নীলকুঠির আশেপাশের বাসিন্দারা নীলকুঠি থেকে দূরের জায়গার লোকেদের চেয়ে ভাল কাপড় পরে ও ভাল অবস্থায় বাস করে। নীলকরেরা আংশিক ভাবে ক্ষতি করে থাকতে পারে কিন্তু সবদিক বিচার করে বলা যেতে পারে যে, সরকারি ও বেসরকারি সবশ্রেণীর ইওরোপীয়দের চেয়ে এই নীলকরেরা এদেশে সাধারণ লোকের অনেক বেশী উপকার করেছে।" [তথ্য : The English Works of Raja Rammohan Roy, Edited by K.D.Nag and D.Burman Part (IV), p.83].

বৃটিশের কাছে সর্বপ্রকার যোগাযোগ রক্ষা, সাহায্য ভিক্ষা প্রকাশ্য অপ্রকাশ্য সংবাদ পরিবেশন প্রভৃতি নানা প্রকার গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্বপালনে গঠন করা হয়েছিল Land Holders Society । তার প্রাণপুরুষ ছিলেন দ্বারকানাথ ঠাকুর। প্রিন্স এবং ঠাকুরবাড়ীর বিলাসিতা এমন পর্যায়ে পৌঁছেছিল যে, সাধারণ মানুষ মুখে মুখে গানের মত বলতেন:

বেলগাছিয়ার বাগানে হয় ছুরি কাঁটার ঝনঝনি,
খানা খাওয়ার কি মজা আমরা তাহার কি জানি,
জানেন ঠাকুর কোম্পানি।

প্রিন্সের পুত্র মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর লিখেছেন, "যখন এখানে গভর্নর জেনারেল লর্ড অকল্যান্ড ছিলেন তখন আমাদের বেলগাছিয়ার বাগানে অসামান্য সমারোহে গভর্নর জেনারেলের ভগিনী মিস্ ইডেন প্রভৃতি অতি প্রধান প্রধান বিবি ও সাহেবদিগের এক ভোজ হয়। রূপে, গুণে, পদে, সৌন্দর্যে, নৃত্যে,মদ্যে,আলোকে বাগান একবারে ইন্দ্রপুরী হইয়া গিয়াছিল।" [দ্রঃ দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের লেখা আত্মজীবনী, পৃ. ৩৯]

প্রিন্সের বাগানবাড়ির বর্ণনা দ্বিজেন্দ্রলাল নাথের লেখা Memoir of Dwarakanath Tagore গ্রন্থে আছে যার অনুবাদ করেছেন কিশোরীচাঁদ মিত্র। সেখান থেকে উদ্ধৃত করেছেন ডঃ ভট্টাচার্য—"এবাড়ীর সুপ্রশস্ত বৈঠকখানা এমন রীতিতে সজ্জিত হয়েছিল যা সে যুগে দুর্লভ। ভিলার শিল্পশালার দেওয়ালগুলো ছিল আধুনিক শিল্পের শ্রেষ্ঠ নিদর্শনে অলঙ্কৃত। এর কারণ স্বরূপ বলা যায়, এর মালিক ছিলেন চিত্র এবং ভাস্কর্য বিচারে যথার্থ

অভিজ্ঞ। বৈঠকখানার পিছনে ঝকমক করতো মার্বেল পাথরের বাঁধানো ফোয়ারা। তার উপরে ছিল কিউপিডের একটি মূর্তি। মতিঝিলের মাঝখানে ছিল একটি দ্বীপ, দ্বীপের উপরে একটি গ্রীষ্মাবাস। একটি ঝোলানো লোহার সেতু ও একটি হাল্কা কাঠের সেতুর সাহয্যে গ্রীষ্মাবাসটি মূল বাগানের সঙ্গে সংযুক্ত ছিল। এ গ্রীষ্মাবাস ছিল আমোদ প্রমোদের কেন্দ্র। পূর্বপ্রান্তে অবস্থিত হলেও বেলগাছিয়া ভিলাকে বলা চলতো কলকাতার ওয়েস্টএন্ড বা কেনসিংটন। এখানে দ্বারকানাথ অতিথিদের আপ্যায়ন করতেন। বলতে কি, বেলগাছিয়া ভিলার উৎসবগুলোর তো বিলাসবহুল ও জমকালো উৎসব সে যুগে কমই হোত । অভ্যাগতদের জন্য যে রান্না হোত তার প্রণালী ছিল অতুলনীয়। আভিজাত্যে ও শ্রেণী মর্যাদায় অতিথিরাও হতেন অনন্য। খাদ্য তালিকায় থাকতো ফরাসী ও প্রাচ্য দেশীয় খাদ্যের অফুরন্ত বৈচিত্র। তাদের মধ্যে অবশ্য সবচাইতে কদর ছিল কাবাব, পোলাও হোসেনির। মদ আমদানি করা হোত সোজা য়ুরোপ থেকে। আর দ্রাক্ষা মদিরার মধ্যে সেগুলো ছিল সেরা জাতের। ... কাউন্সিলের সদস্যরা এবং সুপ্রীম কোর্টের জজরাও দ্বারকানাথের আতিথ্য গ্রহণ করতেন। আর আসতেন বিভাগীয় জেনারেলগণ আর পরগণার জমিদাররা। এধরনের ভোজসভায় পুরনো সিভিলিয়ানরা ভোগক্লান্ত সামরিক কর্মচারীরা তরুণ সহকারী ম্যাজিষ্ট্রেটদের সঙ্গে অন্তরঙ্গ হবার চেষ্টা করতেন।... বেলগাছিয়া ভিলাই ছিল সে যুগের একমাত্র ব্যক্তিগত বাগানবাড়ি বা একমাত্র স্থান যেখানে বিভিন্ন শ্রেণীর য়ুরোপীয় ও দেশীয় ভদ্রলোকেরা মিলিত হতেন, মেলামেশা করতেন স্বচ্ছন্দ অন্তরঙ্গতায়।... সে যুগে সমাজের নেতৃস্থানীয়া মহামাননীয়া মিস্ ইডেনের উদ্দেশ্যে দ্বারকানাথ এখানে একটি নৈশভোজ ও নৃত্যোৎসবের আয়োজন করেন।... এ উৎসব উপলক্ষে কক্ষগুলো করা হয়েছিল আলোকোদ্ভাসিত। দর্পণের প্রতিবিম্বে উজ্জ্বল। মির্জাপুর কার্পেট ছড়িয়ে দেওয়া হয়েছিল কক্ষে কক্ষে। বুটিদার রক্তিমাভ কাপড় এবং সবুজ সিল্কের সমারোহে কক্ষগুলোর উৎসব সজ্জিত রূপ ছিল অনিন্দ্য। টেবিলগুলোর উপরের আচ্ছাদন ছিল শ্বেতপাথরের। তাতে শোভা পাচ্ছিল বর্ণ বৈচিত্রময় পুষ্পস্তবক। দুষ্পাপ্য বহু অর্কিড বিচিত্রভাবে শোভিত ছোট ছোট ঝোপ ও লতাপাতা দিয়ে সাজানো হয়েছিল সিঁড়ি বারান্দা বৈঠকখানা এবং কেন্দ্রস্থিত প্রশস্ত হলঘর। গ্রীষ্মাবাস এবং ঝুলন্ত সেতুটিকে সজ্জিত করা হয়েছিল লতাপাতা পুষ্প দেওদার পাতা ও বহুবর্ণ বিচিত্র পতাকা দিয়ে। প্রাঙ্গন এবং জল সরবরাহের কেন্দ্রটিকে আলোকোজ্জ্বল করা হয়েছিল হাজার হাজার অলঙ্কৃত বাতি দিয়ে। সেকালের জনৈক লেখক উৎসবস্থানটির বর্ণনা করেছেন ইন্দ্রপুরীর উৎসব বলে। হলঘরটি ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত হচ্ছিল মধুর সংগীতে। বহু রাত্রি পর্যন্ত উৎসবে নৃত্য চলেছিল সমানভাবে। সেদিনের রাত্রির মত এত চমৎকার বাজী পোড়ানো ভিলায় আর দেখা যায়নি।" [পৃ. ৬৪-৬৫]

"এদেশে ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর আগমনের সময় থেকেই ঠাকুরবাড়ির সৌভাগ্যের সূত্রপাত। শুরু থেকেই তা যুক্ত হয়েছিল ভারতে বৃটিশ শক্তির আবির্ভাব ও প্রতিষ্ঠা লাভের সঙ্গে।" [কৃষ্ণ কৃপালিনী, ঐ, পৃ. ১৭]

"রামমোহনের মত দ্বারকানাথও তেজারতি কারবার করেছেন, জমিদারি কিনেছেন, জমিদারির আয় থেকেই তাঁর তেজারতি ব্যবসার পত্তন।" তাছাড়া 'প্রথম ভারতীয় চায়ের আবির্ভাব ১৮৩৯ সালে।' আর পৃথিবীতে প্রথম চা কোম্পানী ওই সালেই প্রতিষ্ঠিত। সেই আসাম টি কোম্পানিও ছিল প্রিন্স দ্বারকানাথের। [ঐ, পৃ. ৮৮]

"আবার তেজারতি কারবার থেকে লব্ধ টাকা কেবল যে তেজারতি কারবারে নিয়োগ করতেন এমন নয়, খাজনার কিস্তি খেলাপের জন্য যখনই কোন জমিদারি সুবিধামত দরে নিলামে উঠতো তিনি অমনি তা কিনে নিতেন।" [দ্রঃ ঐ, পৃ. ৫০]

নীতি ও বুদ্ধি বিচারের দিক দিয়ে রামমোহন ছিলেন তাঁর গুরু। গরীবের রক্ত শোষণ করা অর্থে প্রিন্সের এই প্রাচুর্যের পূর্বে তিনি ছিলেন মাত্র দেড়শো টাকা বেতনের সাহেব ট্রেভর প্লাউডেনের চাকর মাত্র। [তথ্য : ভট্টাচার্য, ঐ, পৃ. ৮২]

কিছু আধুনিকবাদীদের কাছে যেটা অমার্জনীয় অপরাধ, দেশ ও দেশবাসীর কাছে বেইমানি— তা হোল, বাবু জমিদার রাজা মহারাজা সমাজের নবউত্থিত নেতা ও প্রতিনিধি রাজা রামমোহন রায় এবং প্রিন্স দ্বারকানাথ ঠাকুর আপ্রাণ চেষ্টা করেছিলেন যাতে ইংরেজ জাতি স্থায়ীভাবে এখানে বসবাস করেন। ১৮৩২ খৃষ্টাব্দের ১৪ই জুলাই লন্ডনের পত্রিকায় তাঁরা ভারতে বাস করলে সুবিধা অসুবিধার কথা প্রকাশ করেন। তাতে রামমোহন পাঁচটি যুক্তি দেখিয়ে একটু আধটু অসুবিধার কথা জানালেও নটি যুক্তি দিয়ে ভারতে ইংরেজ থাকার সুবিধাগুলো বর্ণনা করেন। সুবিধা ও অসুবিধার দুটি উদাহরণ উল্লেখ করা হচ্ছে ঃ ইওরোপীয়দের জ্ঞান বিজ্ঞান, মূলধন দেশের কৃষিকার্যে নিয়োজিত হলে, যেমন নীলচাষে হয়েছে তাতে ভারতীয়দের উপকার হবে। একটু আধটু অসুবিধার কথায় এদেশের আবহাওয়া অনেকের জন্য বিরূপ হতে পারে।

"ইংলন্ডে ভারতীয় অর্থ পাচারে প্রধান ভূমিকা নিয়েছিল এজেন্সী হাউসগুলি। এই হাউসগুলির মধ্যে ম্যাকিন্টস এন্ড কোং-এর নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। অন্যান্য হাউসের মত এই হাউসের মূলধনও গড়ে উঠেছিল কোম্পানীর কর্মচারী ও দেশের ধনিকদের টাকায়। এই হাউসে ভারতীয় অংশীদারদের ১০৯৬৩০০০ টাকা এবং ইওরোপীয় অংশীদারদের ৯৫২৪৭০০ টাকা ছিল। এই কোম্পানীর সঙ্গেও রাজা রামমোহন জড়িত ছিলেন।" [দ্রঃ কুমুদ ভট্টাচার্য : রামমোহন-ডিরোজিও : মূল্যায়ন (২য় সংস্করণ), পৃ. ৫৭]

একটা কথা মনে রাখলে সুবিধা হবে যে, ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পনি বা বিলেতের সাহেবদের যে কোন ভাবেই ভারতে মূলধন যোগ হয়েছে সেই মূলধন তাঁরা তাঁদের স্বদেশ থেকে আনেননি। তাঁরা তা সংগ্রহ করেছেন এদেশের অনুন্নত নির্যাতিত নিষ্পেষিত। বিশেষতঃ চাষী ও শ্রমিক শ্রেণীর কাছ থেকে।

বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথের সম্মানে সত্য তথ্য বা সঠিক ইতিহাস যত লুকিয়েই রাখি না কেন কবির পিতার পিতা দ্বারকানাথ ঠাকুরদের রুজি রোজগার যে সমাজবিরোধী অবৈধ ও অসৎ উপায়ে করা হয়েছিল তা কিন্তু ইতিহাসের পাতায় সংরক্ষিত। দ্বারকানাথ স্বয়ং দু-একটি নয়, কতকগুলো বেশ্যাখানা পরিচালনা করতেন। ওটা ছিল অর্থ আমদানির অন্যতম উৎস। রঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়ও লিখেছেন, "রবীন্দ্রনাথের ঠাকুরদা, দ্বারকানাথ ঠাকুরের তেতাল্লিশটা বেশ্যালয় ছিল কলকাতাতেই।" এত উপার্জন করেও দ্বারকানাথ ঠাকুরের আশা মেটেনি। মদের ব্যবসা শুরু করলেন। প্রচুর অর্থ কামিয়েছিলেন তাতে। আবার নতুন ব্যবসা শুরু করলেন আফিমের। আফিমে নেশাগ্রস্ত হয়ে দেশের লোকের সর্বনাশ হলেও তাতে কিছু এসে যেতনা তাঁর। আর ছিল ঘোড়ার রেস খেলা। তাতেও ভালো উপার্জনই হয়েছিল তাঁর। আর একটি রোজগারের বড় উৎস ছিল বিপদগ্রস্ত লোকদের হিতাকাঙ্খি সেজে মামলা মোকদ্দমার তদ্বির করা। চব্বিশ পরগণার সল্ট এজেন্টও ছিলেন তিনি। তাতেও ভালো আয় হয় তাঁর। তারপর হয়েছিলেন সেরেস্তাদার এবং পদোন্নতির ফলে হন দেওয়ান। এসবই ছিল তাঁর সংসারে আর্থিক মধুবর্ষণ। উদ্ধৃতি দিয়ে শেষ করছি : "অতএব মদের ব্যবসায় নামলেন রবীন্দ্রনাথের ঠাকুর্দা। কিছুদিনের মধ্যে আফিং-এর বাণিজ্যেও হাত পাকালেন এবং বাজিমাত করতেন কুরুচির রেসে। ঘোড়দৌড়ে একটা রুপোর কাপ দিলেন একবার দ্বারকানাথ। শীতকালের বাজার। কলকাতার ঘোড়দৌড় জমে উঠেছে। দ্বারকানাথের টাকা উড়ছে সেখানে।... মামলাবাজ বাবুদের সুপরামর্শ দিয়ে ভালই কামাতেন দ্বারকানাথ। এছাড়া ছিলেন ২৪ পরগণার সল্ট এজেন্ট এবং সেরেস্তাদার।" [দ্রষ্টব্য আনন্দবাজার পত্রিকা, ২৮শে কার্তিক ১৪০৬]